بسم الله الرحمن الرحيم

“আল কুরআনের আলোকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. -এর নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশ”

(Formation and Evolution of Leadership of Prophet Muhammad sw. in the light of the Quran)

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

গবেষক

মাহমুদুল হাসান

রেজি: নং- ২০৩/২০১৭-২০১৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

সহযোগী অধ্যাপক,

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ-এর অধীনে এম.ফিল গবেষক মাহমুদুল হাসান (রেজিঃ নং- ২০৩/২০১৭-২০১৮, শিক্ষাবর্ষ ২০১৭/২০১৮) কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **"আল কুরআনের আলোকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. -এর নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশ" (Formation and Evolution of Leadership of Prophet Muhammad sw. in the light of the Quran)** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে।

এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। এটি তথ্যবহুল ও একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপিটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে অনুমোদন করছি।

(ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম)
সহযোগী অধ্যাপক,
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

তারিখ :

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"আল কুরআনের আলোকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. -এর নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশ" (Formation and Evolution of Leadership of Prophet Muhammad sw. in the light of the Quran)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম।

গবেষক

(মাহমুদুল হাসান)
রেজি: নং- ২০৩/২০১৭-২০১৮
শিক্ষাবর্ষ- ২০১৭/২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থস্বত্ব

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"আল কুরআনের আলোকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. -এর নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশ" (Formation and Evolution of Leadership of Prophet Muhammad sw. in the light of the Quran)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি।

গবেষক

(মাহমুদুল হাসান)
রেজি: নং- ২০৩/২০১৭-২০১৮
শিক্ষাবর্ষ- ২০১৭/২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

জীবনের সকল পর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্যে উৎসর্গ করছি, যারা আমায় মানুষ হওয়ার পথ দেখিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা পরম করুণাময় মহান আল্লাহর জন্য, যিনি জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। আর দুরুদ ও সালাম যুগ-যুগান্তরের স্মরণীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, মানবতার মুক্তির দূত, সমাজ পরিবর্তনের সফল দিশারি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি। ভালোবাসা ও দুরুদ প্রকাশ করছি সাহাবীগনের প্রতি, যারা ক্লান্তিহীন ত্যাগ-তিতীক্ষা ও নিরলস প্রচেষ্টায় ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত করেছেন।

আমি শুরুতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমার সম্মানিত পিতা-মাতার প্রতি। তারাই আমাকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আজকের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছেন। আমার জীবনের প্রতিটি সফলতার পিছনে তাদের সহযোগিতা ও ভালোবাসা ছিলো সবার আগে।

কৃতজ্ঞ হচ্ছি আমার সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি, যারা আমার জীবনের শুরু থেকে মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে সাধনা করেছেন। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সকল সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতি, যাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতায় আমি আমার শিক্ষাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটিয়েছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমার এম.ফিল গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম- এর প্রতি। স্যার এর সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা ও সার্বক্ষণিক তদারকিতে আমার এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি, যারা আমাকে এই গবেষণা সময়ে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন।

মহান আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়- ১: আল কুরআন এবং মুহাম্মদ সা. এর মধ্যকার সম্পর্ক

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১.১. কুরআনের সাথে নবী জীবনের সম্পর্ক	১৮
১.২. শেষ জমানায় নবী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা	২০
১.৩. কুরআন দিয়ে মুহাম্মদ সা. নবী হিসেবে প্রেরণ	২২
১.৪. কুরআনের বাস্তবায়ন করে দেখানো নবীজির দায়িত্ব	২৬

অধ্যায়- ২: আল কুরআন মুহাম্মদ সা. এর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য যেভাবে তৈরি করেছে

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
২.১. একজন নিরক্ষর মানুষকে নবুওয়াত দান	২৯
২.২. প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান	৩১
২.৩. মানসিক শক্তি যোগানো	৩৩
২.৪. নেতৃত্বের যোগ্যতা বিকাশ	৩৬
২.৫. দাওয়াতের কৌশল শিক্ষাদান	৩৯
২.৬. সম্মোহনী শক্তি তৈরি	৪২
২.৭. মানবিক যোগ্যতার বিকাশ	৪৩
২.৮. নিষ্ঠাবান সহযোগী তৈরি	৪৪
২.৯. প্রতিপক্ষের কথার জবাবে যুক্তি শিক্ষাদান	৪৬
২.১০. সত্যের পথে সাহস যোগানো	৪৯
২.১১. সবরের প্রশিক্ষণ দান	৫০
২.১২. তায়াক্কুল শিক্ষাদান	৫১
২.১৩. বিজয় ও সফলতার আশ্বাস প্রদান	৫২
২.১৪. অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষাদান	৫৩

অধ্যায়-৩: মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা. এর মাক্কী জীবনের নেতৃত্বে আল কুরআনের ধারাবাহিক সহায়তা ও নির্দেশনার পর্যালোচনা।

৩.১. নবুওয়াতের শুরুর দিকের দিনগুলোতে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩.১.১. নবীজির কাছে প্রথম অহি	৫৫
৩.১.২. নবীজিকে মানসিক ও জ্ঞানগতভাবে প্রস্তুতকরণ	৫৬
৩.১.৩. পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের মাঝে দাওয়াতের নির্দেশনা	৫৭

৩.১.৪. ছোট ছোট সূরার মাধ্যমে তাওহীদ এর মৌলিক পাঠদান	৫৯
৩.১.৫. আখেরাতের ব্যাপারে সঠিক চিন্তা-বিশ্বাস গঠন	৬১
৩.২. মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি দিনগুলোতে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব	
অনুচ্ছেদ	**পৃষ্ঠা**
৩.২.১. মক্কার কাফেরদের ধর্মীয় অবস্থা চিত্রায়ণ	৬৩
৩.২.২. আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কাফেরদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের সমালোচনা	৬৪
৩.২.৩. মুসলমানদেরকে বিশ্বাসের বুনিয়াদ গঠন	৬৬
৩.২.৪. মুসলমানদের উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ	৬৭
৩.২.৫. নবীজির চরিত্র নিয়ে কাফেরদের নানা প্রশ্ন ও অভিযোগের জবাব দান	৬৯
৩.২.৬. কাফেরদের জিজ্ঞাসিত কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রদান	৭১
৩.২.৭. মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতনের প্রতিবাদে নাযিল হওয়া আযাবের ঘোষণা	৭৩
৩.২.৮. নির্যাতনের মুখে দ্বীনের উপর অটুট থাকার জন্যে মুসলমানদের উৎসাহ দান	৭৪
৩.২.৯. দ্বীনের ব্যাপারে কাফেরদের সকল সমঝোতার চেষ্টাকে নাকচ করা	৭৬
৩.২.১০. যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে কাফেরদেরকে তাওহীদ বোঝানো	৭৮
৩.২.১১. অতীত ঘটনা বলে কাফেরদের সতর্ককরণ	৭৯
৩.২.১২. নবীজির রেসালাতের পক্ষে বিগত নবী-রসুলদের সাক্ষ্য পেশ	৮১
৩.২.১৩. আখেরাতের ব্যাপারে মক্কার কাফেরদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ	৮২
৩.৩. মক্কার শেষ দিনগুলোতে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব	
অনুচ্ছেদ	**পৃষ্ঠা**
৩.৩.১. নির্যাতনের কঠিক মুহূর্তে সবর এর নির্দেশনা	৮৫
৩.৩.২. আল্লাহর সাথে মিরাজের মাধ্যমে জ্ঞান ও সান্তনা প্রদান	৯০
৩.৩.৩. তায়েফে নবীর দাওয়াতি কাজ	৯২
৩.৩.৪. মদিনায় ইসলাম ও বাইয়াতে আকাবা	৯৩
৩.৩.৫. হিজরতের নির্দেশনা	৯৪
অধ্যায়-৪: মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা. এর মাদানী জীবনের উজ্জ্বল নেতৃত্বে আল কুরআনের ধারাবাহিক সহায়তা ও নির্দেশনার পর্যালোচনা।	
৪.১. মদিনার শুরুর দিনগুলোতে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব	
অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৪.১.১. মদিনাবাসীর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি	৯৭
৪.১.২. মদিনা সনদ প্রণয়ণ	১০০
৪.১.৩. গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ অবসান	১০২

৪.১.৪. সকলের মিলনগৃহ হিসেবে মসজিদ নির্মাণ	১০৪
৪.১.৫. মুসলমানদেরকে জিহাদের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ	১০৬
৪.১.৬. মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ককরণ	১০৭
৪.২. যুদ্ধ সংগ্রামের দিনগুলোতে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব	
অনুচ্ছেদ	**পৃষ্ঠা**
৪.২.১. যুদ্ধের অনুমোদন দান	১১০
৪.২.২. বদরের রনাঙ্গণে নবীজির নেতৃত্ব	১১১
৪.২.৩. ওহুদের প্রান্তরে নবীজির নেতৃত্ব	১১৬
৪.২.৪. দ্বিতীয় বদরে নবীজির নেতৃত্ব	১২৭
৪.২.৫. ইহুদি গোত্র বনি নজির এর বহিষ্কারে নবীজির নেতৃত্ব	১২৮
৪.২.৬. ইহুদি গোত্র বনি কাইনুকা এর বহিষ্কারে নবীজির নেতৃত্ব	১৩২
৪.২.৭. খন্দকের যুদ্ধে নবীজির নেতৃত্ব	১৩৩
৪.২.৮. বনু কুরাইজার অভিযানে নবীজি নেতৃত্ব	১৪০
৪.২.৯. হুদায়বিয়ার সন্ধিতে নবীজির দূরদর্শীতা	১৪২
৪.২.১০. খায়বারে ইহুদিদের বিরুদ্ধে নবীজির নেতৃত্ব	১৪৪
৪.২.১১. ঐতিহাসিক মক্কার বিজয়ে নবীজির নেতৃত্ব	১৪৬
৪.২.১২. গোত্রসমূহকে দ্বীনের পথে আনতে নবীজির নেতৃত্ব	১৪৭
৪.২.১৩. হুনায়নের যুদ্ধে নবীজির নেতৃত্ব	১৪৮
৪.২.১৪. তাবুক অভিযানে নবীজির নেতৃত্ব	১৫০
৪.২.১৫. বিদায় হজ্জে নবীজির নেতৃত্ব	১৫২
অধ্যায়-৫ঃ ইহুদি খ্রিস্টানদের মোকাবেলায় মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব	
অনুচ্ছেদ	**পৃষ্ঠা**
৫.১. ইহুদি-খ্রিস্টানদের চিন্তা বিশ্বাসের প্রতিবাদ	১৫৩
৫.২. ইহুদি-খ্রিস্টান আলেমদের অপকর্মের সমালোচনা	১৫৫
৫.৩. ইহুদি-খ্রিস্টানদের অতীত স্মরণ করিয়ে সতর্ককরণ	১৫৯
৫.৪. ইবরাহিম আ. কে নিয়ে ইহুদি-খ্রিস্টানদের মিথ্যা দাবির প্রতিখণ্ডন	১৬২
৫.৫. খ্রিস্টানদের ভালো দিকের মূল্যায়ন	১৬৩
৫.৬. ইহুদি-খ্রিস্টানদের ব্যাপারে মুসলমানদের নীতি নির্ধারণ	১৬৪
অধ্যায়-৬ঃ সমাজ সংস্কারে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব	
অনুচ্ছেদ	**পৃষ্ঠা**
৬.১. তাওহিদের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ গঠন	১৬৬
৬.২. সংঘাতমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা	১৬৮
৬.৩. সমাজে মানুষের মৌলিক মানবীয় গুণের বিকাশ সাধন	১৬৮
৬.৪. ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি	১৬৯

৬.৫. অশ্লীলতা রোধ	১৭০
৬.৬. নারীর মর্যাদা নিশ্চিতকরণ	১৭১
৬.৭. দাসদের অধিকার নিশ্চিতকরণ	১৭৪
৬.৮. দরিদ্র-মিসকিনদের পুণর্বাসন	১৭৫
৬.৯. এতিমদের অধিকার সংরক্ষণ	১৭৫
অধ্যায়-৭ঃ রাষ্ট্র সংস্কারে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব	
অনুচ্ছেদ	**পৃষ্ঠা**
৭.১. নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং এর ভিত্তি ও পরিধি নির্ধারণ	১৭৯
৭.২. রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা	১৭৯
৭.৩. শুরা ভিত্তিক সরকার গঠন	১৮১
৭.৪. সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা	১৮২
৭.৫. যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা	১৮৩
৭.৬. জনগনের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	১৮৪
৭.৭. নাগরিকদের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	১৮৫
৭.৮. নাগরিকদের সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	১৮৬
৭.৯. অপরাধ নির্মূলে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ	১৮৭
উপসংহার	১৯০
চিত্র	১৯২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র তালিকা

ক্রম.	চিত্র-বিবরণ	পৃষ্ঠা
১.	চিত্রে মক্কা নগরী	১৮৮
২.	মক্কা নগরীর ম্যাপ	১৮৯
৩.	আরব ভুখন্ডের ম্যাপ	১৯০
৪.	মক্কা ও নবীজির জন্মস্থান	১৯১
৫.	হেরা গুহা	১৯২
৬.	সাওর পর্বত	১৯৩
৭.	মসজিদে আকসা	১৯৪
৮.	মদিনার ম্যাপ	১৯৫
৯.	মসজিদে কুবা	১৯৬
১০.	মসজিদে নববী এর মোকাপ	১৯৭
১১.	মসজিদে নববী এর বর্তমান রূপ	১৯৮
১২.	বদরের যুদ্ধের রূপরেখা	১৯৯
১৩.	ওহুদ যুদ্ধের রূপরেখা	২০০
১৪.	খন্দক যুদ্ধের রূপরেখা	২০১
১৫.	বনু কুরাইজার পরিত্যাক্ত জনপদ	২০২
১৬.	হুদায়বিয়ার মসজিদ	২০৩
১৭.	মক্কা বিজয়ের অভিযানের চিত্রাঙ্গন	২০৪
১৮.	আরাফার ময়দান	২০৫

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

অনু.	:	অনুবাদ
ই.ফা.বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তাং	:	তারিখ
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
সম্পা:	:	সম্পাদনা/সম্পাদিত
অনু.	:	অনুদিত
সা.	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি.	:	হিজরি সাল
বাং.	:	বাংলা সন

Abstract (সার-সংক্ষেপ)

অভিসন্দর্ভের শিরোনাম: **"আল কুরআনের আলোকে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. -এর নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশ" (Formation and Evolution of Leadership of Prophet Muhammad sw. in the light of the Quran)**

কুরআন ও সীরাত, পরস্পর গভীরভাবে জড়িত। একটি যদি নৌকা হয়, তবে অপরটি তার মাঝি। কেউ কাউকে ছাড়া চলতে পারে না। কুরআনকে ছাড়া যেভাবে সীরাতের আসল রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়, তেমনি সীরাতের ঘটনা প্রবাহের সাথে কুরআনের বক্তব্য মিলিয়ে না পড়লে, কুরআনের আসল মজাও পাওয়া যায় না।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র ২৩ বছরের নবুয়াতি জীবনে আরবের মতো এক বিশাল অন্ধকার জগতকে আলোকিত করেছেন, যা ইতিহাসে অনন্য। এই সফল নেতৃত্বের পদে পদে গভীরভাবে কুরআন সম্পৃক্ত রয়েছে। কুরআনের পাতায় পাতায় নবীজিকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বলা যায়, নবীজির প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্ত কুরআনের দেওয়া নির্দেশনা মেনেই হয়েছে। এমনকি, কুরআন নবীজির সাহাবীদের মন-মানসিকতা গঠনেও শক্তিশালী ভুমিকা রেখেছে।

এই গবেষণাকর্মে নবীজির এই সফল নেতৃত্বের পিছনে কুরআন যেভাবে ভুমিকা রেখেছে, তা দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে।

২০৯ (দুইশত নয়) পৃষ্ঠায় লিখিত অভিসন্দর্ভটিতে ৭ (সাত)টি অধ্যায়, ৮৭ (সাতাশি)টি অনুচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। এতে যা কিছু উপস্থাপিত হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- এতে কুরআনের সাথে নবীজির সম্পর্ক, শেষ জমানায় নবী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা, কুরআন দিয়ে নবীজিকে পাঠানোর কারণ, কুরআনের বাস্তবায়নে নবীজির দায়িত্ব– এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

- এতে কুরআন যেভাবে নবীজির মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, মানসিক শক্তি, নেতৃত্বগুণ, দাওয়াতের কৌশল, সত্যনিষ্ঠ সহযোগী দল, যুক্তিবিদ্যা, সাহস, তায়াক্কুল ও ইতিহাস শিক্ষা দিয়েছে, তা দলীল ও যুক্তির আলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

- নবী জীবনের মক্কী যুগের তিনটি পর্যায়কে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নবুওয়াতের শুরুর দিকে দাওয়াতের দিনগুলো, নবুওয়াতের মধ্যবর্তী সময়ে মক্কী জীবনের কঠিন নির্যাতনের দিনগুলো এবং চরম বিরোধিতা ও বিপদসংকুল মক্কার শেষ সময়গুলোতে নবীজির নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশে যেভাবে কুরআন ভুমিকা রেখেছে, তা দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে।

- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাদানী জীবনের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমে মদিনার শুরুর দিনগুলো, এরপর যদ্ধ-সংগ্রামের ঘটনাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে, এর পিছনে কুরআন কিভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভুমিকা পালন করেছে।

- আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিস্টানদের চিন্তা-বিশ্বাসের নানা অসঙ্গতি কুরআনের ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে ওদের নানা মিথ্যাচার ও দ্বীনের বিকৃতি পরিষ্কার হয়েছে। ফলে ওদের সকল মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত হয়েছে।
- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদিনা সমাজে আনীত সংস্কারগুলো আলোচনা করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তার পিছনে কুরআনের ভুমিকা নির্ণয় করা হয়েছে।
- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদিনায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে যে সকল সংস্কার ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন, যা আজও পৃথিবীর জন্যে আদর্শ, তা আলোচনা করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ও স্বনির্ভর রাষ্ট্র গঠনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তার পিছনে কুরআনের ভুমিকা নির্ণয় করা হয়েছে।

ইসলামই পারে পৃথিবীকে শান্তি দিতে। মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতে। আর এর জন্যে প্রয়োজন নবীজির দেখানো আদর্শে সঠিক নেতৃত্ব, যা কুরআনের আলোকে পরিচালিত হবে। কাজেই কুরআনের নির্দেশনায় এবং নবী জীবনের শিক্ষার আলোকে মুসলিম নেতৃত্বই পারে ভেঙ্গে পড়া মানবতাকে মুক্তির গান শোনাতে।

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম)
সহযোগী অধ্যাপক,
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

গবেষক

(মাহমুদুল হাসান)
রেজি: নং- ২০৩/২০১৭-২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য দিয়েছেন এমন একটি পরিপূর্ণ নির্দেশনা, যা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। শত সহস্র দুরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর, যিনি আমাদের জন্যে উত্তম জীবনাদর্শ হয়ে আছেন। দুরুদ ও সালাম সকল সাহাবীদের উপর, যাদের চেষ্টা ও সাধনার উপরে বিশ্বব্যাপী দ্বীন ছড়িয়েছে।

আল কুরআন, বিশ্ব মানবতার মুক্তির জন্যে মহান আল্লাহর পাঠানো সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা তিনি ৬১০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় নাযিল করেছেন। এই কিতাবে সর্বমোট ১১৪টি সূরায় ৬২৩৬টি আয়াত রয়েছে। এই প্রতিটি আয়াতেই মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র– এক কথায় সকল কিছু পরিচালনা করার নীতিমালা এ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। ফলে এ কিতাবের আলোকে চললে মানুষ যেভাবে কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করে; ঠিক একইভাবে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে, শত অকল্যাণ তাদের পেয়ে বসে।

এই কুরআন নাযিল হয়েছে সর্বকালের মহামানব সাইয়্যেদানা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র মক্কা নগরীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তার দাদা ছিলেন পবিত্র কাবা ঘরের মোতাওয়াল্লি এবং কুরাইশ বংশের নেতা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মের আগেই আপন পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে হারান এবং জন্মের কয়েক বছরের মাথায় আপন মাতা আমিনাকেও হারান। ফলে এতিম অবস্থায় তাঁর বাল্যকাল কাটে। এভাবেই বেড়ে ওঠেন প্রিয়নবী মক্কার উষ্ণ ভূমিতে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বয়স যখন ৪০ বছর, তখন তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর পক্ষ থেকে অহি লাভ করেন। এরপর প্রায় ২৩ বছর তিনি একাধারে এই অহি লাভ করেন, যা বর্তমানে আমাদের কাছে কুরআন হিসেবে সংকলিত হয়ে আছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরুতে মক্কায় দাওয়াতের কাজ করেন; তবে শেস পর্যন্ত তাকে হিজরত করে মদিনায় স্থায়ী হতে হয়েছে। তিনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সকল সাহাবীদের নিয়ে একটি সফল নেতৃত্ব উপহার দিয়েছেন। একইসাথে তিনি ইসলামকে সমাজ ও রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করেও দেখিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী ১০ম বছরে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

নেতৃত্ব ব্যাপারটি মানুষের সহজাত প্রকৃতির। মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই নেতৃত্বগুণ তৈরি করে রেখেছেন। সৃষ্টিগতভাবে মানুষ পরিবার ও সমাজভুক্ত। আর এই পরিবার ও সমাজ সঠিকভাবে চালাতে মানুষ নেতৃত্ব দিয়ে থাকে, যা প্রাকৃতিকভাবেই সে অর্জন করে। আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে পৃথিবীর মানুষদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে অসংখ্য নবী ও রসুল প্রেরণ করেছেন। এ সকল নবী ও রসুলগন মানব ইতিহাসে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন।

নেতৃত্বের গঠন ও বিকাশ একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেই হয়ে থাকে। যে কোনো কাজের নেতৃত্ব দিতে হলে প্রয়োজন হয়, ঐ কাজের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও বুঝ। প্রয়োজন হয় সঠিক

লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা লাভ করা। এসব কিছুর পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিকভাবেও সক্ষমতা তৈরি হওয়াও জরুরি। মৌলিক মানবীয় গুণের বিকাশ সাধণ না হলে সফল নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। সর্বোপরি, কাজ করতে করতে অবিজ্ঞতা অর্জনও নেতৃত্বের বিকাশে বড় সহায়ক।

ইসলামে নেতৃত্বকে খুবই গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ, তাঁর রসুল এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নেতৃত্ব মেনে চলার জন্যে সাধারণ মুসলমানদের হুকুম দেওয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, সকলে যেনো একই দ্বীনের অনুসারী হয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বীনের রশিকে আঁকড়ে থাকে। হাদিসেও নেতৃত্বের ব্যাপারে আরো দৃঢ় কথা বলা হয়েছে। কোনো সফরে তিন জন থাকলেও, একজনকে নেতা বানাতে বলা হয়েছে। প্রতিবার নামাজের জামাতে একজনকে ইমাম বানানোর জোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই, আর নেতৃত্ব ছাড়া জামাত নেই। এ সকল ভিত্তি দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, ইসলামে নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুওয়াতি জীবনে যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তা আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। যেহেতু নবী জীবনী আমাদের পথ চলার পাথেয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথেই মানবতার কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। তাই নবী জীবনের প্রতিটি ঘটনা প্রবাহ জানা ও বোঝা আমাদের জন্যে একান্ত জরুরি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতি জীবনের মাত্র ২৩ বছরে যে বিপ্লব সাধন করেছেন, তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। এই সফলতার পিছনের গুঢ় রহস্য খুঁজে দেখা তাই আমাদের একান্ত জরুরি।

মাত্র ২৩ বছরে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র আরবে যে পরিবর্তন সাধন করেছেন, তা ইতিহাসে নজিরহীন। শুধু মক্কা ও মদিনা নয়; বরং পুরো আরব বিশ্বকে তিনি আমুল বদলে দিয়েছেন। জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে সম্পূর্ণ আলোতে নিয়ে এসেছেন। মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র অবধি বদলে দিয়েছেন। একজন আরব মূরুর সন্তান হয়ে তিনি যে সফলতা দেখিয়েছেন, তা অনন্য ও সর্বজন সমাদৃত। নিশ্চয়ই এই সফল নেতৃত্বের পিছনে আল্লাহ তায়ালার সহযোগিতা ও নির্দেশনা সবচেয়ে বড় ভুমিকা পালন করেছে।

বাস্তবে কুরআনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সর্বদা তত্ত্বাবধান করেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্তকে কুরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে। কখন কোন্ কাজটি করবেন এবং তার পদ্ধতি কী হবে, তার পূর্ণঙ্গ পরিকল্পনা কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সর্বদা প্রদান করেছে। কুরআনের নূরে নবীজির সঙ্গী-সাথীরা আলোকিত হয়েছেন। এভাবেই একটি সফল বিপ্লবের পিছনে কুরআন সরাসরি নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশে ভুমিকা রেখেছে। বক্ষমান অভিসন্দর্ভটিতে এই বিষয়টি প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভটি তৈরির পিছনে মৌলিকভাবে যে কারণগুলো রয়েছে, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে, বাংলা ভাষায় কুরআনের আলোকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী খুব একটা দৃশ্যমান নয়। সাধারণত সকল সীরাতের গ্রন্থগুলো ঘটনা ও ইতিহাস নির্ভর। কিন্তু যে কুরআনের আলোকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সফল নেতৃত্ব দিলেন, তার

বিবরণ তেমন একটা পাওয়া যায় না। এই সমস্যার কারণে সাধারণ মানুষেরা কুরআনের মূল চেতনা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে। একইসাথে তারা নবী জীবনী থেকেও তেমন প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করতে পারছে না। যেহেতু কুরআন এবং সীরাত– একে অপরের পরিপূরক। তাই এই দুয়ের মিলিত পাঠ ছাড়া দ্বীনের সঠিক বুঝ তৈরি হওয়া বেশ কঠিন।

এ অভিসন্দর্ভটি তৈরিতে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন সাহিত্য ও গবেষণাকর্ম পাঠ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব থেকে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিজ্ঞজনের অভিমত ও আলোচনা থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভটি সাতটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করা হয়েছে। নিচে প্রতিটি অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ কুরআনের সাথে নবীজির সম্পর্ক কী ও কেমন ছিলো, শেষ জমানায় আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা কী ছিলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কেন কুরআন দিয়ে পাঠানো হলো এবং কুরআন বাস্তবায়নে নবীজির কী দায়িত্ব ছিলো, এই অধ্যায়ে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ের মূল আলোচনা হলো, আল কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে নেতৃত্বের যেসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট তৈরি করেছে, তা নিয়ে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দ্বীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদান, তাঁর মধ্যে মানসিক শক্তি তৈরি, অন্যান্য মানুষদের নেতৃত্ব দেওয়ার গুণ তৈরি, দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার সুন্দর পদ্ধতি ও কৌশল শিক্ষা, একদল সত্যনিষ্ঠ সহযোগী তৈরি করে দেওয়া, প্রতিপক্ষের নানা অপবাদ-অভিযোগের বিরুদ্ধে যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা, হাজারো বাধার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস তৈরি, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ'র উপর তায়াক্কুল এবং ইতিহাসের নানা ঘটনা থেকে কিভাবে শিক্ষা নিতে পারে, এ সব বিষয় কুরআন তাকে কিভাবে সাহায্য করেছে, তা দলীল ও যুক্তির আলোকে সুন্দরভাবে এই অধ্যায়ে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় হলো মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাক্কী জীবনের নেতৃত্বে আল কুরআনের ধারাবাহিক সহায়তা ও নির্দেশনার পর্যালোচনা করা। এই অধ্যায়ে নবী জীবনের মাক্কী যুগের প্রতিটি পর্যায়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নবুওয়াতের শুরুর দিকে দাওয়াতের দিনগুলোতে যা ঘটেছে, নবুওয়াতের মধ্যবর্তী সময়ে মাক্কী জীবনের কঠিন পরিস্থিতির দিনগুলোতে যা ঘটেছে এবং চরম বিরোধিতা ও বিপদসংকুল মক্কার শেষ সময়গুলোতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কঠিন পরিবেশ মোকাবেলা করে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তার পিছনে কুরআন যেভাবে ভুমিকা রেখেছে, তা দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় হলো, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা এর মাদানী জীবনের নেতৃত্বে আল কুরআনের ধারাবাহিক সহায়তা ও নির্দেশনার পর্যালোচনা করা। এই অধ্যায়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাদানী জীবনের মূল ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমে মদিনার শুরুর দিনগুলোতে তিনি মদিনায় যে সকল সংস্কার এনেছেন ও মৌলিক পদক্ষেপ নিয়েছেন, তার পিছনে কুরআনের ভুমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এরপর নবী জীবনে ঘটে যাওয়া অসংখ্য যদ্ধ-সংগ্রামের ঘটনাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, এ সবের পিছনে কুরআনের অবিরত সহায়তা ও নির্দেশনা বর্তমান ছিলো।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে মূলত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নানা ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফল নেতৃত্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং দেখার চেষ্টা করা হয়েছে যে, এর পিছনে কুরআনের ভুমিকা কেমন ছিলো। এই অধ্যায়ে আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিস্টানদের চিন্তা-বিশ্বাসের নানা অসঙ্গতি কুরআনের ভাষায় তুলা ধরা হয়েছে, যেখানে ওদের নানা মিথ্যাচার ও দ্বীনের বিকৃতি পরিষ্কার হয়েছে। ফলে একদিকে ঐসকল ধর্মের লোকদের আক্রমন থেকে আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে রক্ষা করলেন এবং অপরদিকে পূর্ববর্তী সকল ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও একক অনুসরণীয় ধর্ম বলে স্মীকৃতি মিলেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে সমাজ সংস্কারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদত্ত নেতৃত্বের কিছু দিক তুলে ধরা হয়েছে এবং দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, এর পিছনে কুরআন কিভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভুমিকা পালন করেছে। এই অধ্যায়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদিনা সমাজে আনীত কিছু সংস্কার আলোচনা করা হয়েছে, যা বিবাদমান সমাজকে শান্তিপূর্ণ সমাজে পরিণত করে। এই সমাজ সংস্কারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তার পিছনে কুরআনের ভুমিকা ছিলো উল্লেখযোগ্য।

সপ্তম অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে রাষ্ট্র সংস্কারে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদত্ত নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশে কুরআনের ভুমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদিনায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে যে সকল সংস্কার ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন, যা আজও পৃথিবীর জন্যে আদর্শ হয়ে আছে, তা আলোচনা করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ ও স্বনির্ভর রাষ্ট্র গঠনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তার পিছনে কুরআনের ভুমিকা নির্ণয় করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে যে, এসবের পিছনে কুরআনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভুমিকা ছিলো।

অধ্যায়ঃ ১

আল কুরআন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যকার সম্পর্ক

১.১. কুরআনের সাথে নবী জীবনের সম্পর্ক

মহান আল্লাহ যুগ যুগ ধরে মানব জাতির হেদায়াতের জন্যে তাঁর বাণী পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে প্রথম যখন তিনি মানুষ পাঠান, তখন থেকেই তিনি তার নির্দেশনা পাঠিয়েছেন। কেননা তাঁর নির্দেশনা ছাড়া মানুষ কিভাবেইবা তার জীবন পরিচালনা করতে পারে? মানুষ তো এই পৃথিবীর কোনো কিছুই আগে থেকে চেনে না কিংবা জানে না, কারণ সে এখানে নতুন এসেছে। তাছাড়া মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল প্রকৃতির। তার নিজস্ব জ্ঞান-গবেষণার শক্তিও খুব একটা জোরালো নয়। তার উপরে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। সৃষ্টির শুরুতে যখন আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করার জন্যে আল্লাহ তাআলা সকলকে আদেশ করলেন, তখন শয়তান তা অমান্য করে। সে নিজেকে বড় বলে দাবী করে। কুরআনে আমরা সে কথা দেখতে পাই।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾

অর্থ: স্মরণ করো, আমি যখন ফেরেশতাদের হুকুম করলাম, আদমের সামনে সেজদাবনত হও, তখন সব ফেরেশতাই সেজদা করলো; কিন্তু একমাত্র ইবলিস সেজদা করতে অস্বীকার করলো।[১]

এভাবে শয়তান মানুষকে দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে মানুষ আল্লাহর নির্দেশনার আরো বেশি মুখোপেক্ষি হয়ে পড়ে। কার্যত মানুষের জন্যে দুনিয়ায় ঠিকমতো আপন দায়িত্ব পালন করতে হলে মহান আল্লাহর দেওয়া নির্দেশনার কোনো বিকল্প ছিলো না। সেই প্রয়োজন থেকেই আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসার প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

অর্থ: আমি বললাম, এখন তোমরা সবাই এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এরপর নিশ্চিতভাবে তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সঠিক পথের নির্দেশিকা পৌঁছবে। তোমাদের যারা সে নির্দেশিকা অনুসরণ করে চলবে, তাদের কোনো ভয় নেই, এমনকি দুশ্চিন্তারও কারণ নেই।[২]

---

[১] আল কুরআন, ২০:১১৬

[২] আল কুরআন, ২:৩৮

এভাবেই যুগ যুগ ধরে আল্লাহর বাণী আসা চালু হয়েছে, যা আসতো মানুষের কাছে। যার মাধ্যমে এই বাণী সাধারণ মানুষ পেতো, তাদেরকে বলা হতো নবী ও রসুল। এভাবে যারা আপন আপন নবী ও কিতাবের অনুসরণ করবে, পরকালে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং দুনিয়া হাতছাড়া হওয়ার কারণে তারা কোনো চিন্তাও করবে না।[৩] পৃথিবীর আদি মানব সভ্যতা থেকে শুরু করে আমাদের শেষ সময় পর্যন্ত এই নবুওয়াতের ধারা বর্তমান হয়েছে।

শুরুতে পৃথিবীর সকল মানুষ একই জীবন ধারায় বিশ্বাসী ছিলো। সবাই ছিলো সত্যের পথিক। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তাদের মধ্যে মিথ্যা ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা বিশ্বাস প্রবেশ করে। আস্তে আস্তে মানুষ নানা দলে বিভক্ত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে একথা খুবই সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

অর্থ: এক সময় পৃথিবীর সব মানুষ সত্যপন্থী হিসাবে একই দলভুক্ত ছিল। পরে ক্রমান্বয়ে তারা নানা পথে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ এসব লোকদের কাছে নবীদের পাঠাতে থাকেন। নবীরা তাদেরকে সত্যপথে চলার শুভ পরিণতি এবং ভ্রান্ত পথে চলার করুণ বিপদের জন্যে সতর্ক করতেন। নবীদের সাথে আল্লাহ কিতাবও নাযিল করেছেন, যাতে লোকেরা সত্য সম্পর্কে যেসব মতবিরোধে জড়িয়ে আছে তার মীমাংসা করা যায়। অথচ কী আশ্চার্য ব্যাপার দেখো! যাদেরকে কিতাবের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিলো, তারা নিজেরাই একটা সময় মতবিরোধে লিপ্ত হলো। ওরা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ পাওয়ার পরেও কেবল অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ও বাড়াবাড়ির কারণে নিজেরা ভিন্ন ভিন্ন পথ তৈরি করে নিল। এরপর যারা নবীদের প্রতি ঈমান এনেছে, তাদেরকে আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় সত্যপথে পরিচালিত করলেন। যদিও তারা ঈমান আনার আগে নানা মতে বিভক্ত ছিলো। বস্তুত আল্লাহ যাকে চান, সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।[৪]

পৃথিবীর সকল সময়ের সকল কওমের কাছেই আল্লাহ যুগে যুগে তার বার্তাবাহক পাঠিয়েছেন। এমন কোনো কওম বা জাতি নেই, যাদের কাছে আল্লাহ তাআলা র সতর্ককারী আসেনি। কুরআন বলছে,

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

[৩] হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসীর, *তাফসীর ইনবে কাসীর*, (অনু. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ১৯৮৬), খন্ড-১, পৃ.২৪১

[৪] আল কুরআন, ২:২১৩

অর্থ: সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা অভিযোগ করে, ইনি যদি নবীই হয়ে থাকবেন, তবে এর প্রমাণে তার রবের পক্ষ থেকে কোনো অলৌকিক নিদর্শন নাযিল হয় না কেন? হে নবী, আসলে তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। এভাবেই প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর কাছে আমি একজন পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছি।[৫]

কাজেই মানব জাতি যে যুগ যুগ ধরে আল্লাহর নির্দেশনা পেয়েছে, তা সবই ছিলো তাদেরই জাতির কোনো এক সদস্যের মাধ্যমে। ফলে সকল নবীই ছিলেন মানুষ। আল্লাহ মানুষকে পথ দেখানোর জন্য কোনো ফেরেশতা বা জ্বীনদের থেকে কাউকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাননি। কারণ এমনটি করলে সত্যিকারে মানুষদের তেমন কল্যাণ হতো না। কেননা তারা তো মানুষদের চিন্তা-চেতনা ও জীবনবোধ সম্পর্কে তেমন একটা জ্ঞাত নয়।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

অর্থ: তোমার পূর্বে আমি যেসব নবী-রসুলদের বিভিন্ন জনপদে পাঠিয়েছিলাম, তাদের অধিকাংশেরই স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ছিলো। কাজেই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো অলৌকিক নিদর্শন হাজির করার শক্তিও তাদের ছিলো না। প্রত্যেক যুগেই আমার বিধি-বিধান কিতাব আকারে দিয়েছিলাম। [৬]

১.২. শেষ জমানায় নবী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা

একথা অনিস্বীকার্য যে, প্রত্যেক কওম ও যুগের জন্যেই নবী থাকা জরুরি। ঐশী জ্ঞান ও নির্দেশনা ছাড়া কোনো জাতিই পথ চলতে পারে না। নবী পাঠানোর ধারাবাহিকতায় মহান আল্লাহ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর বংশ ধারাকে বাছাই করে নিয়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে এই বংশে একের পর এক নবী আগমন করেছেন। বিশেষকরে তারা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর বংশধর বা সন্তান বলে বিবেচিত হয়েছে। ফলে অধিকাংশ নবী এসেছেন বনি ইসরাইল বংশে এবং এসব নবীদের প্রাথমিক দাওয়াতের লক্ষ্য ছিলো তাদের কওম বনি ইসরাইল সম্প্রদায়।

এই বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ে সর্বশেষ নবী হয়ে আসেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম। তিনি জেরুজালেম শহরে বনি ইসরাইলের জন্যে প্রেরিত হন।[৭] ইহুদিদের একচেটিয়া ধর্মের অপব্যাখ্যা ও

[৫] আল কুরআন, ১৩:৭

[৬] আল কুরআন, ১৩:৩৮

[৭] সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, (ঢাকা: আল কুরআন একাডেমি লন্ডন, ২০১১), খন্ড:২০, পৃ.১৭৮

সাধারণ মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রতিরোধে মহান আল্লাহ তাকে পাঠান। হযরত মারিয়াম আলাইহাস সালাম এর গর্ভে অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে বলেছেন,

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ قَالُوا۟ هَـٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

অর্থ: স্মরণ করো! এসব বনি ইসরাইলের কাছে মরিয়ম পুত্র ঈসা বলেছিলো, হে বনি ইসরাইল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসুল। আমি তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি সুসংবাদ দিচ্ছি, আমার পরে 'আহমদ' নামে একজন রসুল আসবেন; কিন্তু পরে যখন সেই প্রতিশ্রুত রসুল– যার ব্যাপারে ঈসা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো- সুস্পষ্ট প্রমাণসহ হাজির হলো, তখন এসব ইহুদি-খ্রিস্টানেরা একযোগে বলতে লাগলো, না! না! এতো স্পষ্ট যাদু, প্রতারণা।[৮]

এ কথা পরিষ্কার যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলের মধ্যে তাদের জন্যে নবী হয়ে এসেছিলেন। তিনি বনি ইসরাইল ব্যাতীত অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর কাছে নবুওয়াতের জন্যে নির্দেশিত হননি। ফলে তার দাওয়াত সার্বজনীনও ছিলো না। পাশাপাশি এ কথাও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সে সময় বনি ইসরাইল ছাড়াও পৃথিবীতে আরো অসংখ্য জাতি-গোষ্ঠী বর্তমান ছিল। যারা পুরো পৃথিবী জুড়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো।

এরপর ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা তার কাছে তুলে নেন। ইহুদিরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো। কিন্তু হত্যা করতে পারেনি; শূলেও চড়াতে পারেনি। বরং আল্লাহ তাআলা ওদেরকে এ ব্যাপারে একটা সন্দেহ-ধাঁধাঁয় ফেলে রাখেন। এরপর অনেক সময় কেটে যায়। যুগের পর যুগ পার হয়ে যায়। প্রায় ৫০০ বছর ধরে পৃথিবীর কোথাও কোনো নবী আসেননি। পুরো পৃথিবী একটি ঐশী নির্দেশনার সংকটে পতিত হয়।

এদিকে বনি ইসরাইল জাতিও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদায় নিজেদের ধরে রাখতে পারে নাই। তারা নানা অপরাধ ও দ্বীন বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ে। সুদ-ঘুষ, জেনা-ব্যভিচার, স্বজনপ্রীতি-দুর্নীতি সবকিছুই তাদের মধ্যে ছেয়ে যায়। ফলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগোষ্ঠি এদের উপর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যুগ যুগ ধরে যে বনি ইসরাইল আল্লাহ তাআলার প্রিয় ছিলো; তারা ক্রমেই আল্লাহ তাআলার অপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এসময় বনি ইসরাইলের কাছেই আল্লাহ তাআলার কিতাব ছিলো এবং ওরাই কেবল জানতো আল্লাহ তাআলার কালাম। সাধারণ অন্য জাতির লোকেরা জানতো না কিতাব কী কিংবা আল্লাহর বানী কী?

[৮] আল কুরআন, ৬১:৬

ফলে এককভাবে আল্লাহর কিতাব পাওয়ার জোরে তারা নিজেদেরকে অহংকারী করে রাখতো। পাশাপাশি তারা আল্লাহর কিতাবকে জনসম্মুখে প্রকাশ করতো না। সাধারণ জনগন যেনো আল্লাহর কিতাব পড়তে না পারে, তার বিধান বলে বেড়াতো। জাগতিক স্বার্থে ওরা নিজেদের মধ্যে এই কিতাবের পাঠ ও পঠন সীমাবদ্ধ রাখতো। বিশেষকরে পুরোহিতেরা নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে সর্বদা আল্লাহর কিতাবের অপব্যবহার করতো। সামান্য কিছু দুনিয়াবী লাভের আশায় তারা আল্লাহর আয়াতকে বিকৃত করতো। এভাবেই যুগের পর যুগ চলে আসছে।

ফলে দৃশ্যত পৃথিবীর কোথাও সত্যিকারের ওহীর আলো বর্তমান ছিলো না। আল্লাহর দ্বীনের সঠিক রশ্মি প্রজ্বলিত ছিলো না। মানুষ জানতো না সঠিক মুক্তির পথ কোনটা? কোন নবীর অনুসরণ করলে দুনিয়া ও আখেরাত সুন্দর হবে? বরং ক্রমেই অন্ধকার চারদিক দিয়ে্ রব্রঘনিভূত হয়ে আসছেছিলো। মানুষ দিনে দিনে আল্লাহকে ভুলতে বসছিলো। নানা মিথ্যা ও কাল্পনিক খোদায় মানুষ মগ্ন হয়ে যাচ্ছিলো। দিকে দিকে মূর্তি পূজা ছড়িয়ে পড়ছিলো। খোদ আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা শরিফের চারপাশ মূর্তিতে ছেয়ে নিয়েছিলো। এমনকি পবিত্র কাবা ঘরেও মূর্তি ঢুকে গিয়েছিলো। এমন একটি ক্লান্তিলগ্নে মানব জাতির মুক্তির দূত হিসেবে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর ঐশী আলো দিয়ে একজন বার্তাবাহক পাঠালেন। আর তিনিই হলেন সায়্যেদানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১.৩. কুরআন দিয়ে মুহাম্মদ সা. নবী হিসেবে প্রেরণ

আরব উপদ্বীপের একটি বিখ্যাত পবিত্র শহরের নাম মক্কা, যে শহরের গোড়াপত্তন হয়েছে মহান রবের অপর দুই সম্মানিত বান্দা ও নবী সাইয়্যেদানা হযরত ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর হাতে। কুরআন একথা আমাদের জানিয়েছে যে, ধূ ধূ মরুভূমির বুকে পিতা ইবরাহিম ও সন্তান ইসমাইল মিলে আল্লাহর হুকুমে এখানে পবিত্র কাবা নির্মাণ করেন।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

অর্থ: এরপর ইবরাহিম ও ইসমাইল যখন কাবাঘরের প্রাচীরের ভিত নির্মাণ করছিলো, তখন তারা উভয়ে দোয়া করলো, হে আমাদের প্রভু, আমাদের এ খেদমতটুকু কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সব শোনো এবং সব জানো।[৯]

এ সময় তারা উভয়ে আল্লাহর কাছে লম্বা দোয়ায় রত হন। এই নতুন শহরের জন্যে তারা মন খুলে আল্লাহর দরবারে চাইলেন। তারা উভয়ে এই শহরের জন্যে একজন নেতা চাইলেন। একজন

[৯] আল কুরআন, ২:১২৭

পথপ্রদর্শক, যার হাত ধরে এই জনপদের চারপাশ আলোকিত হবে। এমন এক সম্মানিত রাহাবারকে পাঠাতে বললেন, যিনি হয়ে উঠবেন সমগ্র কায়েনাতের জন্যে আলো। তাদের কণ্ঠে,

رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

অর্থ: তারা আরো দোয়া করলো, হে আমাদের মালিক, আমাদের দুজনকেই তোমার একান্ত অনুগত গোলামে পরিণত করো। আর কালক্রমে আমাদের বংশধরদের মধ্যেও তোমার অনুগত একটি জাতি অব্যহত রাখো। তোমার ইবাদতের নিয়ম নীতি আমাদের শিখিয়ে দাও। আমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করো। আসলে তুমি বড়ই ক্ষমাশীল এবং অনুগ্রহকারী। হে আমাদের রব, সে জাতির কাছে তাদেরই কোনো একজনকে তোমার রসুল করে পাঠাও। যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াত পাঠ করবে, তোমার কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদের কর্ম ও আচরণকে পরিশুদ্ধ করে তুলবে। প্রকৃতপক্ষে তুমি বড়ই প্রতিপত্তিশালী এবং প্রজ্ঞাময়। [১০]

পবিত্র কাবার মুতাওয়াল্লী আবদুল মুত্তালিব এর সন্তান আব্দুল্লাহ ও পুত্রবধূ আমেনার ঘরে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন বিশ্ব কায়েনাতের সরদার, রহমাতুল্লিল আলামিন, নবীয়ে পাক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীজির বয়স যখন ৪০ এর কোটায় এসে পড়ে, তখনই আসমান থেকে ভেসে এলো ওহীর আওয়াজ। এভাবে তিনি নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব লাভ করলেন। কুরআন অসংখ্যবারই কথার সাক্ষ্য পেশ করছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

অর্থ: হে লোকেরা, তোমরা তো জানো যে, মুহাম্মদ কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং সে আল্লাহর রসুল এবং শেষ নবী। বস্তুত আল্লাহই সব জিনিসের সঠিক জ্ঞান রাখেন। [১১]

[১০] আল কুরআন, ২:১২৮-১২৯

[১১] আল কুরআন, ৩৩:৪০

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَءَامَنُوا۟ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾

অর্থ: অন্যদিকে যারা সত্যকে মেনে নিয়েছে ও সৎকর্ম করেছে এবং নবী মুহাম্মদের প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের রবের পক্ষ থেকে আগত সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে, আল্লাহ তাদের জীবনের অতীত গুনাহগুলো ক্ষমা করেছেন এবং তাদের অবস্থান আগের চেয়ে আরো মজবুত করেছেন। [১২]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِى ن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

অর্থ: ভালোকরে জেনে রেখো, মুহাম্মদ তোমদের কাছে একজন রসুল ছাড়া আর কিছুই নন। এরকম বহু রসুল তার আগে পৃথিবীতে এসেছে এবং গত হয়ে গেছে। কাজেই এখন যদি মুহাম্মদ মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা আমার দ্বীন ত্যাগ করে আগের অবস্থানে ফিরে যাবে? মনে রেখো, কেউ যদি দ্বীন ত্যাগ করে আগের অবস্থানে ফিরে যায়, তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই। তবে যারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, তাদেরকে তিনি অচিরেই পুরস্কৃত করবেন। [১৩]

আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাষায় মানব জাতিকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মুহাম্মদ আমার রসুল।

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا ۖ سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ

[১২] আল কুরআন, ৪৭:২

[১৩] আল কুরআন, ৩:১৪৪

فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

অর্থ: সন্দেহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল। তার সঙ্গী-সাথীরা সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে দৃঢ় ও আপোসহীন। আর নিজেরা পরস্পরের প্রতি বড়ই দয়াপরবশ। আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা তাদেরকে রুকু ও সেজদায় লুটিয়ে থাকতে দেখবে। সেজদার প্রভাবে তাদের চেহারায় সমর্পিত জীবনের প্রতিফলন ঘটবে। আল্লাহ তাওরাতে তাদের পরিচয় এভাবেই দিয়েছেন। আর ইঞ্জিল কিতাবে তাদের উপমা দেওয়া হচ্ছে, তারা এমন বীজ, যা অঙ্কুরিত হয়ে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, একসময় কাণ্ডের উপর শক্ত হয়ে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। ফলে চাষির মন আনন্দে ভরে যায়। আল্লাহ এভাবেই ঈমানদারদের সমৃদ্ধ করেন। আর তা দেখে সত্যের দুশমনদের অন্তর্জ্বালা আরো বাড়তে থাকে। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তিনি তাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন। [১৪]

আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরেকটি নাম হলো আহমদ, যার অর্থ অধিকতর প্রশংসাকারী। খোদ্ কুরআনে এই নামটির বর্ণনা পাওয়া যায়, যা সাইয়্যেদানা ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর উম্মতদেরকে আমাদের নবীজি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। কুরআনে সে বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে,

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ قَالُوا هَـٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

অর্থ: স্মরণ করো! এসব বনি ইসরাইলের কাছে মরিয়ম পুত্র ঈসা বলেছিলো, হে বনি ইসরাইল, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসুল। আমি তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি সুসংবাদ দিচ্ছি, আমার পরে 'আহমদ' নামে একজন রসুল আসবেন; কিন্তু পরে যখন সেই প্রতিশ্রুত রসুল– যার ব্যাপারে ঈসা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো- সুস্পষ্ট প্রমাণসহ হাজির হলো, তখন এসব ইহুদি-খ্রিস্টানেরা একযোগে বলতে লাগলো, না! না! এতো স্পষ্ট যাদু, প্রতারণা।[১৫]

মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মানব জাতির কাছে আল্লাহ তাআলার পাঠানো সর্বশেষ নবী। যুগ যুগ ধরে যতো নবী এসেছেন, তাদের প্রত্যেকেই তার সম্পর্কে জানতেন এবং

[১৪] আল কুরআন, ৪৮:২৯

[১৫] আল কুরআন, ৬১:৬

তাদের অনুসারীদের জানাতেন। অন্যান্য সকল নবীর উপরে আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীজিকে দিয়েছিলেন আলাদা কিছু সম্মান ও প্রাপ্তি। প্রত্যেক নবীর কাছ থেকেই আল্লাহ তাআলা পূর্ণ অঙ্গিকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা যদি মুহম্মদ রসুলুল্লাহর সময়কাল পায়; তবে নিজেদের রেসালাতের বদলে তাঁর রেসালাত মেনে নিবে এবং তাকে পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা করবে। সেই অঙ্গিকারের আয়াত কুরআনের পাতায় আজও অমলীন।

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى ۖ قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ﴿٨١﴾

অর্থ: হে কিতাবওলারা, তোমরা সে অঙ্গীকরের কথা স্মরণ করো, যা আমি সব নবীর কাছে থেকে নিয়েছিলাম। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমাদের কাছে যদি আমার এমন কোনো রসুল আসে, যে তোমাদের কাছে থাকা আমার কিতাব ও হিকমতকে সত্য বলে স্বীকার করে, তবে তার উপর অবশ্যই ঈমান আনবে। এমনকি, তার নবুওয়াতি কাজে পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এরপর আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার কাছে এ কথার উপর ওয়াদা দিচ্ছো এবং এ গুরু দায়িত্ব বহন করতে প্রস্তুত রয়েছো? তখন নবীরা এ ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ হলো। আল্লাহ বললেন, তাহলে তোমরা এ কথার উপর সাক্ষী থাকো। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।[১৬]

এখানে বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যে, আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবী আলাইহিস সালাম এর নিকট আল্লাহ তাআলা এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, কোন সময় যখন তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ তাআলা গ্রন্থ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করবেন এবং তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন, তখন যদি তাঁর যুগেই অন্য কোনো নবী এসে যান, তবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁকে সাহায্য করা এ নবীর অবশ্য কর্তব্য।[১৭]

১.৪. কুরআনের বাস্তবায়ন করে দেখানো নবীজির দায়িত্ব

আল্লাহ তাআলা যুগযুগ ধরে মানুষের জন্যে তাঁর কিতাব পাঠিয়েছেন। আর নবী-রসুলদের সেই কিতাব বাস্তবায়ন করে দেখানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রিয় নবী সাইয়্যেদানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও সেই একই মিশন দিয়ে পাঠিয়েছেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট

[১৬] আল কুরআন, ৩:৮১

[১৭] ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড-৩-৫ পৃ. ১০৬

হয়েছে। কোথাও এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে আবার কোথাও সংক্ষিপ্ত। নবী জীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন বলছে,

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾

অর্থ: তিনি অ-ইসরাঈলী একজনকে রসুল করে লোকদের কাছে পাঠিয়েছেন। সে লোকদেরকে আল্লাহর বাণী পড়ে শোনায়, তাদের জীবনাচারকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। অথচ ইতিপূর্বে এ লোকেরা ছিলো ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে। ৩. এবং এমন সব অনাগত লোকদের জন্যেও তাকে রসুল করা হয়েছে, যারা এখনো সত্যবাণীর সাথে পরিচিত হয়নি। বস্তুত আল্লাহ সব করতে পারেন, সব কিছু বোঝেন।[১৮]

অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবতাকে উদ্ধারের মিশন সম্পর্কে আরো বক্তব্য পাওয়া যায় এভাবে-

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

অর্থ: আল্লাহ মুমিনদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন, তাদেরই একজনকে রসুল হিসেবে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। সে রসুল তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শুনায়, তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে তোলে, তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও হেকমত শিখায়। অথচ এর আগে তারা সুস্পষ্ট ভুল পথে ছিলো।[১৯]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন কাবাঘর নির্মাণ করলেন, তখন তিনি এ ঘরের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে একজন রসুলের দাবি করেছিলেন। সে সময় তিনি আল্লাহ তাআলা র কাছে আরজি পেশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন কেন একজন রসুল বড়ই দরকার হবে এই জনপদে। কুরআনে সে দোয়া আজও দৃশ্যমান।

رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

[১৮] আল কুরআন, ৬২:২-৩

[১৯] আল কুরআন, ৩:১৬৪

অর্থ: হে আমাদের রব, সে জাতির কাছে তাদেরই কোনো একজনকে তোমার রসুল করে পাঠাও। যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াত পাঠ করবে, তোমার কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদের কর্ম ও আচরণকে পরিশুদ্ধ করে তুলবে। প্রকৃতপক্ষে তুমি বড়ই প্রতিপত্তিশালী এবং প্রজ্ঞাময়। [২০]

এসব আয়াতের মাধ্যমে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবকে বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই কিতাবের সার্বজনীন পাঠ চালু করা, এর আলোকে মানুষকে পরিশুদ্ধ করে তোলা, মানুষকে সুশিক্ষিত করে তোলা এবং সর্বোপরি এই কিতাবের আলোকে সমাজ-রাষ্ট্রকে সাজিয়ে তোলার গুঢ় দায়িত্ব দিয়েই নবীজিকে পাঠিয়েছিলেন। তাই একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, কুরআন এর বাস্তবায়নই ছিলো নবীজির জীবনের মূল দায়িত্ব।

[২০] আল কুরআন, ২:১২৯

অধ্যায়ঃ ২

আল কুরআন মুহাম্মদ সা. এর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য যেভাবে তৈরি করেছে

২.১. একজন নিরক্ষর মানুষকে নবুওয়াত দান

সাধারণত সে সময়ের আরবের লোকেরা অধিকাংশই ছিলো নিরক্ষর। লিখতে ও পড়তে জানতো না। তখন পড়া-শুনার জন্যে তেমন কোনো ব্যবস্থাও ছিলো না। যারা লিখতে ও পড়তে জানতো, সেটা অর্জন করতো একান্ত নিজ উদ্যোগে। বিশেষভাবে যারা ব্যবসা বানিজ্যের কাজে সিরিয়া বা ইয়ামেন যেতো, তাদের কেউ কেউ সেখান থেকে কিছুটা অক্ষরজ্ঞান লাভ করতো। এছাড়া খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের লোকেরা নিজ নিজ কিতাব পড়তে পারতো। তারা এই জ্ঞান প্রজন্মধরে লাভ করেছিলো।

ফলে দৃশ্যত মক্কার অধিকাংশ লোকই লিখতে ও পড়তে জানতো না। তাদেরকে বলা হতো উম্মী বা নিরক্ষর।[২১] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু মক্কায় বেড়ে ওঠেছেন এবং এখানেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন, তাই তিনিও পড়া ও লেখার সুযোগ পাননি। তাই তার জন্যে অক্ষরজ্ঞান শূণ্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয় ছিলো।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই নিরক্ষর হওয়াটা তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে একটি দলিল হয়ে কাজ করেছে। কুরআনের বক্তব্য দেখে এটা বোঝা যায় যে, একজন নিরক্ষর ব্যক্তির কাছে যখন এমন গুরুত্বপূর্ণ চমৎকার কথা পাওয়া যায়, তা অবশ্যই তাঁর নিজের বানানো বা লেখা কোনো বিষয় নয়; বরং তা অন্য কোনো মহান সত্তার কাছ থেকে আগত। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় নবীজির নিরক্ষর হওয়ার এই বয়ানটি বর্তমান রয়েছে।

هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ

> অর্থ: তিনি উম্মি একজনকে রসুল করে লোকদের কাছে পাঠিয়েছেন। সে লোকদেরকে আল্লাহর বাণী পড়ে শোনায়, তাদের জীবনাচারকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে তোলে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। অথচ ইতিপূর্বে এ লোকেরা ছিলো ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে।[২২]

এই আয়াতে আরবের লোকদের উম্মি বা নিরক্ষর হওয়ার কথা স্পষ্ট। আর একজন নিরক্ষর সমাজের সদস্য হিসেবে নবীজিও ছিলেন নিরক্ষর। এই অক্ষরজ্ঞানহীন জনগোষ্ঠীকে নবীজি কিভাবে পথ দেখাবেন, কিভাবে এদের সত্য সঠিক জীবনবোধে চালিত করবেন, তাও বলা হয়েছে উপরের আয়াতে। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে উম্মি নবীর প্রতি ঈমান আনার জন্যে আদেশ করছেন।

---

[২১] সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খন্ড:২০, পৃ.২০৭

[২২] আল কুরআন, ৬২:২

তিনি নিজের বড়ত্ব ও ক্ষমতা প্রকাশ করে বলছেন, ঈমান আনো নিরক্ষর এই নবীর প্রতি। এ পথেই সত্য-সঠিক পথের দিশা মিলবে। কুরআন ভাষায়,

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِى وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِى يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থ: হে নবী, তুমি ঘোষণা করো, হে দুনিয়ার মানুষেরা শোনো, আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল হয়ে এসেছি। মনে রেখো, এ মহাকাশ ও পৃথিবীর একক সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই সবার জীবন দান করেন আবার মৃত্যু ঘটান। কাজেই এখন তোমরা পূর্ণ ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর সে বার্তাবাহক এ উম্মি নবীর প্রতি, যে নিজেই আল্লাহ ও তাঁর বাণীর প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা সে রসুলকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে চলো। আশা করা যায়, এ ভাবেই তোমরা সহজ-সঠিক পথের সন্ধান লাভ করবে।[২৩]

এমনকি পূর্ববর্তী আসমানি কেতাবেও এই উম্মি নবীর কথা আল্লাহ তাআলা বলেছেন। আহলে কিতাবদের আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, শেষ সময়ে একজন উম্মি নবী আসবেন এবং সেই নবীর অনুসরণ তাদের করতে হবে। ফলে পূর্ববর্তী কিতাবের অধিকারীরা আগে থেকেই জানতো যে, শেষ নবী হবেন একজন নিরক্ষর জাতির সদস্য এবং তিনি নিজেও হবেন নিরক্ষর। কুরআনের বর্ণনায় এমনটা দৃশ্যত দেখা যাচ্ছে।

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ

অর্থ: যারা আমার পাঠানো সর্বশেষ বার্তাবাহক এই উম্মি নবীর পূর্ণ অনুগত হবে– যার পূর্ণ বিবরণ তাদের তাওরাত ও ইনজিলে তারা লিখিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে। [২৪]

বাস্তবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না কোনো দিন কোনো বই পড়েছেন, আর না কোনোদিন কোনো কিছু লিখেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই নিরক্ষরতাই তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার এক জ্বলন্ত প্রমাণ। এমনকি পূর্ববর্তী কিতাবেও নবীজির নিরক্ষর হওয়ার উল্লেখ ছিলো।[২৫] যখন মক্কার কাফেরেরা এই অভিযোগ উত্থাপন করছিলো যে, কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

[২৩] আল কুরআন, ৭:১৫৮

[২৪] আল কুরআন, ৭:১৫৭

[২৫] ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড-৮-১১, পৃ. ৪০৯

আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে রচনা করে শুনাচ্ছেন, তখন আল্লাহ তাআলা এ কথা জোরালোভাবে বলছেন যে, যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পড়তে জানেন না, লিখতে জানেন না, তিনি কিভাবে হঠাৎ করে এতো সুন্দর ও মহত্বপূর্ণ কালাম রচনা করবেন?

যিনি জীবনের ৪০টি বছর পর্যন্ত মক্কার সবার সাথে মিলেমিশে থাকলেন, অথচ এই দীর্ঘ সময়ে একটি কবিতাও রচনা করলেন না, কোনো দিন কোনো বই পড়লেন না, কোথাও পাঠ শেখার জন্যে গেলেন না; তিনি কিভাবে হঠাৎ করে কুরআন রচনা করে নিয়ে আসলেন? নিশ্চয়ই এটি তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই কালাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিল হয়েছে। কাজেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মি বা নিরক্ষর হওয়াটা তাঁর নবুওয়াতের পক্ষে এক শক্তিশালী দলিল। কুরআন বারবার তাঁর অবিশ্বাসীদের সামনে এই কথাটি তুলে ধরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বকে শক্তিশালী করেছে। তাঁকে প্রতিপক্ষের আক্রমণের প্রতিরোধে সাহস ও যুক্তি যুগিয়েছে। সে জন্যেই কুরআন স্পষ্ট করে বলছে,

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

অর্থ: হে নবী, এসব পদ্ধতিতেই আমার নির্দেশে তোমার কাছে এ কুরআনকে ওহী করা হয়েছে। আসলে এ কিতার পাওয়ার আগে তো তুমি জানতেও না যে, কিতাব কী? ঈমান কী? [২৬]

২.২. প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান

জ্ঞানকে বলা হয় আলো এবং শক্তি। বাস্তবে কোনো নেতৃত্বই সফল হতে পারে না এই জ্ঞানের আলো ছাড়া। মশাল ছাড়া যেমন অন্ধকারে মানুষ পথ দেখতে পায় না; তেমনি সত্যের জ্ঞান ছাড়া কেউ জীবনপথে ন্যায় ও শান্তির দেখা লাভ করতে পারে না। ইসলামে তাই জ্ঞান অর্জন করাকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআনে ও হাদিসে এ সম্পর্কে অসংখ্য বক্তব্য পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জ্ঞান দান করেছেন এবং নেতৃত্ব দেওয়ার সকল কলা কৌশল শিখিয়েছেন। মানুষের জীবনের গতিপথ বাতলে দিয়েছেন এবং জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বাস্তবে কোনো মানুষ, এমনকি কোনো রসুল যে জ্ঞান লাভ করেন, তা আল্লাহ তাআলারই দান।[২৭] তিনিই তাদের জানিয়েছেন, ঈমান কী, ইসলাম কী, কিতাব কী? আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[২৬] আল কুরআন, ৪২:৫২

[২৭] মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শাফী, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, (অনু. মাওলানা মহিউদ্দীন খান, রিয়াদ: বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি:) পৃ. ১২০৫

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

অর্থ: হে নবী, এসব পদ্ধতিতেই আমার নির্দেশে তোমার কাছে এ কুরআনকে ওহী করা হয়েছে। আসলে এ কিতার পাওয়ার আগে তো তুমি জানতেও না যে, কিতাব কী? ঈমান কী? কিন্তু আমিই এ কিতাবকে সত্যের এক আলোকবর্তিকা বানিয়ে দিলাম, যাতে এর মাধ্যমে আমি আমার প্রিয় বান্দাদের সঠিক পথ দেখাতে পারি। আর তুমি! লোকদেরকে সেই সত্য-সরল পথের দিকেই ডেকে চলছো। [২৮]

কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনেক ইতিহাস শিখিয়েছে। অতীত নবী ও জাতির কাহিনীগুলো পড়িয়েছে। এভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নেতৃত্বের পাঠ দিয়েছে। সাধারণত ইতিহাস আমাদের সামনে মডেল দাঁড় করায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে অতীত নবীদের সংগ্রামী কাহিনী তুলে ধরে তাদের নেতৃত্ব কৌশল হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছে। কুরআন বলছে,

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾

অর্থ: হে নবী, আমি এখন এ কুরআনের মাধ্যমে তোমাকে একটি চমৎকার কাহিনী শুনাতে যাচ্ছি, যা আমার ওহী পাওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি জানতে না।[২৯]

উন্নত নেতৃত্বের জন্যে শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রদানই যথেষ্ট নয়; বরং চাই যথার্থ প্রশিক্ষণও। আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের জন্যে রাত জেগে আত্ম উন্নয়ন করার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। সবচেয়ে নিরব সময়ে আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে শিখেয়েছে। বস্তুত রাতের শেষ সময়ে দিনের জন্যে সঠিক পরিকল্পনা করা যায়। যে কোনো নেতৃত্ব দানের জন্যে একটি নিখুত পরিকল্পনা প্রণয়ন খুবই জরুরি। আর তার জন্যে চাই সামগ্রিক চিত্র বোঝা ও দেখার সুযোগ, যা কেবল শেষ রাতের পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন মেধা ও পরিবেশে করা সম্ভব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফল নেতৃত্ব এর পিছনে এই শেষ রাতের পরিকল্পনা গ্রহণের পদ্ধতিটি খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনই এই পদ্ধতি বাতলে দিয়েছে। কাজেই এ কথা বলা মোটেই অতিরিক্ত নয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফল নেতৃত্ব গঠনের পিছনে কুরআন সরাসরি ভুমিকা রেখেছে। কুরআনে বলা হচ্ছে,

[২৮] আল কুরআন, ৪২:৫২

[২৯] আল কুরআন, ১২:৩

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ ﴿٢٠﴾

অর্থ: হে নবী, তোমার রব জানেন যে, তুমি কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ, আবার কখনোবা এক-তৃতীয়াংশ সময় ইবাদতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্ছো। তোমার সাহাবীদের একদলও এমনটা করছে। আসলে রাত ও দিনের সময়ের হিসাব আল্লাহই রাখেন। তিনি জানেন, তোমরা সময়ের সঠিক হিসাব কখনো রাখতে পারবে না। তাই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই এখন থেকে তোমরা রাতের নামাযে কুরআনের যেটুকু পড়তে সহজবোধ করো, সেটুকুই পড়ো।[৩০]

নেতৃত্ব ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে পাঠ ও পঠন খুবই জরুরি। দাওয়াতের সকল সঙ্গীদের মাঝে নেতৃত্বগুণ তৈরি করতে আল্লাহ তাআলা পাঠ ও পঠনকে জারি করতে বলেছেন। তাইতো কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে পাঠ করো নির্দেশনা দিয়ে।

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

অর্থ: পড়ো! তোমার সৃষ্টিকর্তা মহান রবের নামে। যিনি মানুষকে সামান্য এক নিষিক্ত ডিম্ব থেকেই সৃষ্টি করেছেন। পড়ো! তোমার মহান রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে অজানা অনেক কিছু শিখিয়েছেন।[৩১]

২.৩. মানসিক শক্তি যোগানো

নেতৃত্বের জন্যে প্রয়োজন এক শক্তিশালী মানসিক দৃঢ়তার। চাই প্রচণ্ড মজবুত মনবল, যা শত আঘাতের প্রতিরোধে ইস্পাতশক্ত প্রমাণিত হবে। জাহিলিয়াতের মোকাবেলায় মজবুত কদমে দাঁড়িয়ে থাকবে। এমন মানসিক দৃঢ়তা ছাড়া কোনো সমাজের পরিবর্তন সাধন করা বড়ই কঠিন। কুরআন ও হাদিসে মুসলমানদেরকে এভাবে মানসিকভাবে মজবুত হওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

[৩০] আল কুরআন, ৭৩:২০
[৩১] আল কুরআন, ৯৬:১-৫

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন, তখন চারদিক দিয়ে অসংখ্য-অগণিত বিপদ ও আঘাত আসতে লাগলো। তিনি ও তাঁর গুটি কয়েক সাহাবা মিলে সকল আঘাত মোকাবেলা করলেন। তিনি যতোই যুক্তি প্রমাণ পেশ করেন না কেন, কাফেরদের মন গলে না। তিনি ও তাঁর সাহাবাগন যতো আন্তরিকতা দিয়ে লোকদের ঈমানের দাওয়াত দেন না কেন, কোনো প্রভাব পড়ে না। গোত্রে গোত্রে গিয়ে দাওয়াত দেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্যকে বুঝান। ধরে ধরে প্রত্যেককে দ্বীনের পথে আসার ফজিলত বুঝান। এই কালামকে অস্বীকার করার পরিণতি যে কতোটা ভয়ংকর হবে– তাও বুঝান।

কিন্তু হাতে গোনা কয়েক জন মানুষ ছাড়া মক্কার তেমন লোকেরা সাড়া দেয় না; বরং উল্টো নবীজিকে নানাভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তাঁকে নানা অপবাদে জর্জরিত করে। তাঁর চারিত্রিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তাঁকে অসম্মান করে তাড়িয়ে দেয়। তাঁর অনেক সাথীকে মানসিক নির্যাতন করা হয়। এমনকি অনেক সাথীকে শারীরিক নির্যাতনও করা হয়। হাজারো বিপদের মধ্যে কখনো কখনো খোদ্ সাথীদের মধ্যেও নানা সন্দেহমূলক প্রশ্ন জেগে ওঠে। কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে– এমন প্রশ্নও দেখা দেয়। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা বারবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সান্ত্বনা দিয়েছেন। সঠিক কর্ম পরিকল্পনা ঠিক করে দিয়েছেন। কুরআন বলছে,

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

> অর্থ: অতএব তোমার এসব লোকেরা যদি আজ তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে, তবে তাতে ভেঙ্গে পড়ো না। তোমার পূর্বেও অসংখ্য রসুলকে মিথ্যারোপ করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলো। অথচ তারা ওদের সামনে নবুওতের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছিলো। উপদেশপূর্ণ বাণী শুনিয়েছিলো। এমনকি, সমুজ্জ্বল কিতাব পর্যন্ত দিয়েছিলো।[৩২]

যারা সত্যকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছিলো, নবীজিকে বারবার প্রত্যাখ্যান করছিলো, তাদের উদ্দেশ্যে কুরআন নবীজিকে শক্ত কথা বলতে বলেছে। বলেছে, দেখা যাবে কার পরিণতি সুখকর হয়। বলেছে, তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, ওরা ওদের মতো পড়ে থাক। সময় এলে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে। কুরআনের ভাষ্যে,

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

[৩২] আল কুরআন, ৩৫:২৫

অর্থ: হে নবী, এরপরেও যদি ওরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তুমি পরিষ্কার বলে দাও, আমার কাজের ফল আমি পাবো এবং তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। সুতরাং আমার কাজের জন্যে তোমাদের যেমন জবাবদিহি করতে হবে না, ঠিক তেমনি তোমাদের কাজের কোনো জবাবদিহি আমাকে করতে হবে না।[৩৩]

এমনকি আহলে কিতাবদের মধ্যেও যারা জেনে বুঝে সত্যকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকেও ছাড় দেওয়া হয়নি। তাদের মোকাবেলায় আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শক্ত প্রতিরোধ বাক্য শিখিয়েছেন। তাদের সাথে তাত্ত্বিক বিতর্কে না জড়িয়ে; বরং অপ্রতিরোধ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে শিখিয়েছেন। আল্লাহ বলছেন,

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

অর্থ: হে নবী, এখন ওরা যদি তোমার সাথে এ ব্যাপারে বিতর্কে জড়াতে চায়, তবে তুমি বলো, আমি এবং আমার অনুসারী মুসলমানেরাতো ইতোমধ্যে এক আল্লাহয় পুরোপুরি সমর্পিত হয়েছি। আচ্ছা! তোমরা যারা আমাদের আগেই আল্লাহর কিতাব পেয়েছিলে এবং যারা কিতাব পাওনি– তোমরা কি এক আল্লাহয় পূর্ণ সমর্পিত হয়েছো? হে নবী, ওরা যদি সত্যিই আল্লাহর অনুগত হয়ে থাকে, তবেতো ওরা তোমার আহুত সঠিক পথেই রয়েছে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে থাকে, তবে ওদের কাছে সত্যের দাওয়াত পৌঁছানো ছাড়া তোমার কোনো জবাবদিহি নেই। আল্লাহ স্বয়ং এ ধরনের বান্দাদের কাজকর্ম দেখছেন। [৩৪]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বারবার শান্তনা দেওয়া হয়েছে। কাজের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করতে এবং কাফেরদের আচরণে দুঃখ-কষ্ট পেয়ে পেরেশান না হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বাস্তবতার আলোকে নেতৃত্ব দেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে যে,

فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

অর্থ: এতসব কিছু বোঝার পরেও যদি ওরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; তবে হে নবী, সুস্পষ্টভাবে সত্যবাণী তুলে ধরা ছাড়া তোমার উপর আর কোনো জবাবদিহি নেই। [৩৫]

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ

[৩৩] আল কুরআন, ১০:৪১
[৩৪] আল কুরআন, ৩:২০
[৩৫] আল কুরআন, ১৬:৮২

অর্থ: কাজেই হে নবী, এখন ওরা যদি তোমার দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তবে তাতে তোমার কোনো দায় নেই। কেননা তোমাকে ওদের উপর রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার দায়িত্ব তো স্রেফ পৌঁছিয়ে দেওয়া।[৩৬]

এই শান্তনা শুধু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা হয়নি; বরং তাঁর পবিত্র মুখে আপন সাথীদেরকেও দিতে বলা হয়েছে। কুরআন সে কথা এভাবে বলছে যে,

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

অর্থ: আর দয়াময়ের বাণী যথাযথভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই। [৩৭]

২.৪. নেতৃত্বের যোগ্যতা বিকাশ

নেতৃত্ব সফল করার জন্যে প্রথমে প্রয়োজন কাজের লক্ষ্যমাত্রা জানা এবং কাজের পরিধি নির্ধারণ করা। কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা কখন কতোটুকু সম্পন্ন করতে হবে, তা জানা থাকলে নেতৃত্ব সহজ ও স্বার্থক হতে পারে। আর এসবের জ্ঞান না থাকলে অনেক সময় সফল নেতৃত্ব দেওয়া যায় না। বাস্তবে পরিকল্পনাই যুদ্ধের অর্ধাংশ বলে বিবেচিত হয়।

আল কুরআন অধ্যয়ন থেকে জানা যায়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নেতা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত ওহী আল কুরআনের সাথে নিজের হৃদয় মনের সুনিবিড় বন্ধন সৃষ্টি করেন। এখানে কুরআনই ছিলো তাঁর মূল প্রশিক্ষক। এ কুরআনই তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানুষরূপে তৈরি করেছে এবং গড়েছে নিঁখুত নেতা হিসেবে।[৩৮] এভাবে কুরআনের আলোতে নবীজি নিজেকে পৃথিবীর সবার চেয়ে সফল নেতা হিসেবে প্রমাণ করতে পেরেছেন, যা ইতিহাসের পাতায় স্বীকৃত।

আল্লাহ তাআলা নবীজিকে নেতৃত্বের জন্যে বাছাই করে নেওয়ার পরে তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নেতৃত্বের লক্ষ্যমাত্র কী এবং কাজের ধরণ ও পরিধি কী? পাশাপাশি এও জানিয়েছেন যে, কোন ধরনের পদ্ধতি বা আচরণরীতি তিনি অনুসরণ করবেন। কুরআনে সে কথা বারবার উল্লেখ হয়েছে। কোথাও নবীজিকে স্পষ্ট নীতিমালাও দেওয়া হয়েছে। কুরআন নবীজিকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে উল্লেখ করছে।[৩৯] তেমনই একটি নির্দেশনা,

---

[৩৬] আল কুরআন, ৪২:৪৮

[৩৭] আল কুরআন, ৩৬:১৭

[৩৮] আবদুস শহীদ নাসিম, *আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ*, (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশন, ২০১১), পৃ. ১৮

[৩৯] ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া, *কুরআনুল কারীম*, (রিয়াদ: বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ২০১৫), খন্ড: ২, পৃ.২৪৩৬

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾

অর্থ: হে নবী, আমি তোমাকে মানুষের কাছে সত্যের সাক্ষীরূপে, সুসংবাদ দানকারী এবং সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। [৪০]

নেতৃত্ব দানের জন্যে আরেকটি গুণ হচ্ছে দয়াশীলতা। সহকর্মীদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক মেনে চলা। অনুসারী বন্ধুদের সাথে সহানুভূতিময় আচরণ করা। চারপাশের সবাইকে দয়া ও ভালোবাসায় আবৃত করা। অন্যথায় সে নেতৃত্ব মানুষের মন জয় করতে পারে না। বাস্তবে যে নেতৃত্ব কেবল ভয় ও আতঙ্ক তৈরি করে চলে, তা আর যাই হোক, সফল নেতৃত্ব বলা যায় না। সে নেতৃত্বের ফসল দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। তাইতো কুরআনে আল্লাহ তাআলা নবীজিকে বারবার কোমল ও সুহৃদ হওয়ার কথা বলেছেন। ঘোষণা দিয়েছেন, তুমি জগৎবাসীর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়ার উপহার।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

অর্থ: হে নবী, আমি যে তোমাকে পঠিয়েছি, এটা আসলে জগতবাসীর জন্যে আমার এক অপার করুণা।[৪১]

নবীজিকে দয়া ও কোমলতার পদ্ধতিও বলে দেওয়া হয়েছে। কিভাবে নরম ও রহম দিল দিয়ে সহকর্মীদের মন জয় করতে হবে এবং কী কী করা যাবে না– সবই শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কিভাবে সবার সাথে মিলে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, তাও শিখিয়ে দিয়েছেন। পাশাপশি সবাই মিলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, কিভাবে তা বাস্তবায়নে দৃঢ় থাকতে হবে– তারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এভাবেই আল্লাহ তাআলা কুরআনের পাতায় পাতায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশে সরাসরি অবদান রেখেছে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

অর্থ: হে নবী, এটা তোমার উপর আল্লাহর রহমত যে, তুমি তোমার অনুসারীদের প্রতি বড়ই কোমল হৃদয়ের। পক্ষান্তরে যদি উগ্র মেজাজ ও পাষান হৃদয়ের হতে, তবে এসব অনুসারীরা তোমার চারপাশ থেকে কেটে পড়তো। অতএব তাদের সাধারণ ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দাও, আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে ক্ষমা চাও এবং সামষ্টিক কাজকর্মে তাদের সাথে নানা বিষয়ে

[৪০] আল কুরআন, ৪৮:৮

[৪১] আল কুরআন, ২১:১০৭

পরামর্শ করে নাও। এভাবে কোনো ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলে, আল্লাহর উপর ভরসা করো। মনে রেখো, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তার উপর ভরসা করে কাজ করে। [৪২]

কুরআন এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মান্যকারী ও তাঁর অবাধ্যতা হতে বহু দূরে অবস্থানকারীদের জন্য স্বীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্তরকে কোমল করে দিয়েছেন। তাঁর অনুকম্পা না হলে তাঁর নবীর হৃদয় এত কোমল হতো না।[৪৩]

নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে এসে এই নেতৃত্ব নানা পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে। কখনো বন্ধুত্ব পেয়েছে, আবার কখনো শত্রুতার মুখোমুখি হয়েছে। কেউ কেউ দাওয়াত পাওয়ার সাথে সাথে আন্তরিকতার সাথে কবুল করেছে, আবার কেউ কেউ শত্রুতার চূড়ান্ত রূপ দেখিয়েছে। দাওয়াতের এই কঠিন পথের শত বাধা মাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে নেতৃত্ব, তা কুরআনের প্রণিত পরিকল্পনা ও নির্দেশনা ধরেই এগিয়েছে। আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আহলে কেতাব ও মুশরিকদের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৪] কুরআন স্পষ্টভাবে এই নেতৃত্বকে বলেছে, কখন কিভাবে ও কোন্ গতিতে দাওয়াতের কাফেলাকে চালাতে হবে। তেমনই একটি নির্দেশনা হচ্ছে এমন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

অর্থ: হে রসুল, তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাযিল হয়েছে, তা লোকদের কাছে ঠিকঠাকভাবে পৌঁছে দাও। যদি এ কাজ না করো, তবে তা রেসালাতের দায়িত্ব পালনে গাফলাতি বলে গণ্য হবে। আর হ্যাঁ, নির্ভয় থাকো, আল্লাহ নিজেই তোমাকে অবাধ্য লোকদের খারাপি থেকে রক্ষা করবেন। অবশ্য মনে রেখো, যারা কুফরিতে মজে গেছে, ওরা আল্লাহর হেদায়াত পাবে না।[৪৫]

এ কথা সর্বজন সত্য যে, আল্লাহর রসুল সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি স্বার্থকভাবে তাঁর সঙ্গীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং প্রতিপক্ষ জালেমদেরকে শক্ত হাতে প্রতিরোধ করেছেন। একইসাথে এমন একদল সাহসী সহকর্মী সৈন্যদল তৈরি করেছেন, যারা আল্লাহর সন্তোষ পাওয়ার আশায় রাত-দিন একাকার করে খোদার পথে জীবন উৎসর্গ করেছে। যাদের জন্যে আল্লাহ তাআলা মহাপুরস্কারের

[৪২] আল কুরআন, ৩:১৫৯

[৪৩] ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৪-৯, পৃ: ২০২

[৪৪] আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী, *তাফসীর তাবারী*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), খন্ড-৯, পৃ. ৮৩

[৪৫] আল কুরআন, ৫:৬৭

ঘোষণাও দিয়েছেন।[৪৬] তাদের পবিত্র চেহারা সুরত ও আচার-আচরণ দেখেই আশেপাশের অন্য লোকেরা সত্যের সুমহান আলো অনুভব করতে পারতো। কুরআন সে চিত্র এভাবে অঙ্কন করছে যে,

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

অর্থ: সন্দেহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল। তার সঙ্গী-সাথীরা সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে দৃঢ় ও আপোসহীন। আর নিজেরা পরস্পরের প্রতি বড়ই দয়াপরবশ। আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা তাদেরকে রুকু ও সেজদায় লুটিয়ে থাকতে দেখবে। সেজদার প্রভাবে তাদের চেহারায় সমর্পিত জীবনের প্রতিফলন ঘটবে। আল্লাহ তাওরাতে তাদের পরিচয় এভাবেই দিয়েছেন। আর ইঞ্জিল কিতাবে তাদের উপমা দেওয়া হচ্ছে, তারা এমন বীজ, যা অঙ্কুরিত হয়ে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, একসময় কাণ্ডের উপর শক্ত হয়ে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। ফলে চাষির মন আনন্দে ভরে যায়। আল্লাহ এভাবেই ঈমানদারদের সমৃদ্ধ করেন। আর তা দেখে সত্যের দুশমনদের অন্তর্জ্বালা আরো বাড়তে থাকে। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তিনি তাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন।[৪৭]

২.৫. দাওয়াতের কৌশল শিক্ষাদান

কুরআন নবীজিকে দাওয়াতের কৌশল শিক্ষা দিয়েছে। দাওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য কী হবে, কিভাবে মানুষকে আহ্বান করতে হবে, কোন বিষয়ে ফোকাস করে আহ্বান করতে হবে, দাওয়াতের সীমা-পরিসীমা কি হবে– এরকম শত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। বস্তুত নবীজি নিজে এসব জানতে পারতেন না; যদি না আল্লাহ তাআলা তাঁকে শিখাতেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁকে রেসালাতের দায়িত্ব দিয়েছেন, তাই যৌক্তিক কারণেই তিনি নবীজিকে দাওয়াতের সকল কর্মকৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এই শিক্ষার ফলেই নবীজি যোগ্য নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয়েছেন।

---

[৪৬] ড. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া, *কুরআনুল কারীম*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ২, পৃ.২৪৪৬

[৪৭] আল কুরআন, ৪৮:২৯

দাওয়াতের অন্যতম কৌশল ছিলো, মানুষকে সতর্ক করা। প্রত্যেক মানুষকে জাহান্নামের শাস্তির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা। ব্যক্তি ও পরিবারকে লক্ষ্য করে কাজ করা। প্রত্যেককে নিজে ও তার পরিবারের দায়িত্ব বহন করতে আগ্রহী করা। দেশ ও জাতির অন্য মানুষদের পরিশুদ্ধ করার আগে ব্যক্তি নিজে ও তার পরিবারকে সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে– এটি ছিলো নবীজির দাওয়াতের প্রধান কর্মকৌশল। বাস্তবে পৃথিবীর সকল মানুষই পরিবার ও আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ। ফলে এই দাওয়াতি পদ্ধতি সর্বোত্তম কৌশল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা শিখেয়ে দিচ্ছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের সে আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যার নিয়ন্ত্রণ থাকবে কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাদের হাতে, যারা আল্লাহর আদেশ কখনোই অমান্য করে না; বরং তাঁর নির্দেশ হুবহু শতভাগ পালন করে।[৪৮]

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

অর্থ: আর আপন আত্মীয়-স্বজনদের এ ব্যাপারে সতর্ক করো।[৪৯]

দাওয়াতের নেতৃত্বে আরো একটি পদ্ধতি ছিলো এমন যে, সাধারণ মানুষদেরকে প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম উপদেশের সাথে দাওয়াত দিতে বলা হয়েছে। জনসাধারণের সাথে আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও সহনশীলতার সাথে দাওয়াত দিতে বলা হয়েছে। সুন্দর পদ্ধতি ছাড়া কারো সাথে তর্ক-বিতর্কে জড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। বস্তুত দাওয়াতের জন্যে কোমল ভাষা ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ খুবই গুরুত্ববহ। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলছেন,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

অর্থ: হে নবী, তুমি প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে মানুষদেরকে তোমার রবের পথে আহবান করো। আর তাদের সাথে বিতর্ক করার সময় সর্বোত্তম পদ্ধতি অনুসরণ

[৪৮] আল কুরআন, ৬৬:৬

[৪৯] আল কুরআন, ২৬:২১৪

করো। তোমার রব ভালোকরেই জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয়েছে এবং কে তাঁর সত্যপথের উপর দাঁড়িয়ে আছে।[৫০]

দাওয়াতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের মতামতকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কারো উপরে জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। ইসলামে ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কাউকে জোর জবরদস্তি করার অনুমতি নেই; বরং প্রত্যেকেই স্বাধীন ও স্বেচ্ছায় আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করবে। এই নীতির ফলে একদিকে ইসলামের যেমন প্রশংসা হয়েছে, অপরদিকে নবীজির নেতৃত্ব শক্ত ও আদর্শ হয়ে উঠেছে। কুরআন বলছে,

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

অর্থ: হে নবী, লোকদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও, এটাই আমার পথ। তোমাদেরকে আমি এ পথেই ডাকছি। জেনে রেখো, আমি ও আমার সাথীরা সুস্পষ্ট জ্ঞান ও প্রমাণের ভিত্তিতে এ পথ গ্রহণ করেছি। সুবহানাল্লহ! বস্তুত তোমাদের শিরক থেকে আল্লাহ পূতঃপবিত্র। আর আমি কখনোই তোমাদের মতো মুশরিকদের দলভুক্ত নই।[৫১]

نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

অর্থ: হে নবী, এসব মিথ্যাচারীরা যা কিছু বলাবলি করছে, আমি তা সবই জানি। আর ওদেরকে জোরপূর্বক সত্যের পথে আনা তোমার দায়িত্ব নয়। অতএব যাদের অন্তরে আমার আযাবের ভয় রয়েছে, কেবল তাদেরকেই এ কুরআনের দ্বারা উপদেশ দান করো।[৫২]

দাওয়াতের নেতৃত্বে সীমা-পরিসীমা জানা ও মানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট নির্দেশনায় জানিয়েছেন যে, যদিও কাফেরদের বানানো খোদারা মিথ্যা ও কাল্পনিক; তবুও তুমি তাদের অপমান করো না। তাদের নামে কুৎসা বলো না। এতে তারা তোমার কথা শোনার চেয়ে তোমায় বরং শত্রুই ভাববে। এই সীমা-পরিসীমার জ্ঞান নবীজির নেতৃত্বের একটি সুন্দরতম দিক হয়ে ওঠে।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

[৫০] আল কুরআন, ১৬:১২৫
[৫১] আল কুরআন, ১২:১০৮
[৫২] আল কুরআন, ৫০:৪৫

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, সাবধান থেকো, শরিককারীরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব খোদাদের ডাকে, তোমরা কখনোই তাদের নামে বদনাম করো না। ফলে ওরা শিরকের শেষ সীমা পেরিয়ে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে। কেননা আমি প্রত্যেক জাতির চোখে তাদের কাজকর্মকে যৌক্তিক ও সুশোভন করে রেখেছি। কাজেই শেষ পর্যন্ত ওদেরকে ওদের আসল রবের কাছে ফিরতে দাও, তখন আমি নিজেই ওদের সব কৃতকর্মের বয়ান শুনিয়ে দিব।[৫৩]

২.৬. সম্মোহনী শক্তি তৈরি

দাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দ্বায়ীর চরিত্র। যিনি দাওয়াত দিচ্ছেন তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখেই মূলত আহুত লোকেরা দাওয়াত কবুল করে। সাধারণ মানুষের উপরে দ্বায়ীর কথার চেয়ে তার আচার আচারণ ও ব্যাবহারিক জীবন বেশি প্রভাব রাখে। মূলত মানুষ শুনে যতোটা শিখে, দেখে তারচেয়ে বেশি শিখে। এই জন্যেই আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সর্বোত্তম চারিত্রিক সৌন্দর্য দিয়ে পাঠায়েছেন। মহানবী ছিলেন ব্যক্তি জীবনে সবার চেয়ে সৎ ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। কুরআনে সে কথা বারবার গুরুত্বের সাথে পেশ করা হয়েছে।

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

অর্থ: সন্দেহ নেই, তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী। [৫৪]

গোটা দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ ও অনুকরণীয় পদ্ধতি। বিশেষকরে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে– এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তাঁর জীবনের অনুসরণ-অনুকরণ একান্ত বাধ্য। কুরআন শক্তভাষায় এ কথা আমাদেরকে বলছে। একজন নেতার জন্যে এটি খুবই সহায়ক যে, তাঁর আদর্শে তাঁর সকল অনুসারীরা চলবে। তাঁকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ-অনুকরণ করবে। এই আসমানি নির্দেশনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশে খুবই সহায়ক হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ বলছেন,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

[৫৩] আল কুরআন, ৬:১০৮

[৫৪] আল কুরআন, ৬৮:৪

অর্থ: যাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ও আখেরাতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং কার্যত আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে চলে, নিশ্চয়ই তাদের জন্যে আল্লাহর রসুলের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।[৫৫]

وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾

অর্থ: এবং আমাকে এও বলা হয়েছে যে, আমি যেনো তোমাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাই। আর আমাকে জানানো হয়েছে যে, কেউ সত্য-সঠিক পথে চললে, তাতে তারই কল্যাণ হবে। আর কেউ ভুল পথে চললে আমি যেনো তাকে বলে দেই যে, আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী মাত্র।[৫৬]

২.৭. মানবিক যোগ্যতার বিকাশ

নবী হওয়ার আগে প্রায় ৪০ বছর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় কাটিয়েছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি সেখানে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই ছিলেন। যেভাবে সমাজের আর আট-দশজন থাকেন, তিনিও ঠিক তেমনই ছিলেন। এ সময় পর্যন্ত তাঁর মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের বৃহৎ কোনো পরিকল্পনা ও আহ্বান পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু যখন তিনি নবুওয়াত পেলেন, তখন থেকে তাঁর মধ্যে নেতৃত্বগুণ বড় আকারে প্রকাশ পেলো। তিনি হাজারো বাধার পাহাড় ডিঙিয়ে দ্বীনের কাজ চালিয়ে গেলেন। কুরআনই একমাত্র সেই শক্তি, যা তাঁর ভিতরে নেতৃত্বগুণ তৈরি করছে। কুরআন সে কথা বলছে,

قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

অর্থ: হে নবী, তুমি আরো বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর বাণীসমূহ জানাতে চান বলেই আমি তাঁর হুকুমে সেসব তোমাদের সামনে পড়ে শুনাচ্ছি। অথচ ভেবে দেখো, এসব বাণী পেশ করার আগে বহু বছর আমি তোমাদের মধ্যে কাটিয়েছি। এরপরও কি তোমরা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি কাজে খাটাবে না? [৫৭]

---

[৫৫] আল কুরআন, ৩৩:২১

[৫৬] আল কুরআন, ২৭:৯২

[৫৭] আল কুরআন, ১০:১৬

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

অর্থ: হে নবী, তুমি ওদেরকে বলো, আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলি, তোমরা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহকে ভয় করে একাকী কিংবা যৌথভাবে একটু চিন্তা করে দেখো তো, তোমাদের মাঝে তো আমি বহু বছর কটিয়েছি। আমার মধ্যে কি কখনো পাগলামির কোনো চিহ্ন দেখেছো? আসলে আমি তো তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন আযাব থেকে বাঁচাতে চাইছি মাত্র।[৫৮]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বের ব্যাপারে কুরআন স্পষ্ট করে বলছে যে, সে কখনো পথহারা হয়নি। ভুল পথে এই নেতৃত্ব যায়নি। যদিও সমাজের বড় বড় নেতারা প্রচার চালাচ্ছে যে, মুহাম্মদ ভুল পথে হাটছে; আসলে সে ভুল পথে নয়। বরং ঐসকল নেতৃবৃন্দই ভুল পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾

অর্থ: তেমননি একথাও সত্য যে, তোমাদের সাথী এ রসুল মোটেই পথভ্রষ্ট নয়, বিপথগামী নয়।[৫৯]

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾

অর্থ: তেমননি একথাও সত্য যে, তোমাদের সাথী এ রসুল মোটেই পথভ্রষ্ট নয়, বিপথগামী নয়।[৬০]

২.৮. নিষ্ঠাবান সহযোগী তৈরি

যেকোনো আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন হয় একদল নিবেদিত সহকারীদের। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার দাওয়াতী কাজ শুরু করেছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে একদল নিবেদিত-সক্রিয় সহযোগী তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই সহযোগী তৈরির পেছনে আল্লাহ তাআলার সাহায্য বড় ভূমিকা পালন করেছে। এ সকল সহযোগীদের মাধ্যমেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃত্ব

[৫৮] আল কুরআন, ৩৪:৪৬
[৫৯] আল কুরআন, ৫৩:২
[৬০] আল কুরআন, ৮১:২২

সঠিকভাবে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে নবীজির এইসকল সাথীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য খুবই চমৎকারভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

অর্থ: সন্দেহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল। তার সঙ্গী-সাথীরা সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে দৃঢ় ও আপোসহীন। আর নিজেরা পরস্পরের প্রতি বড়ই দয়াপরবশ। আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা তাদেরকে রুকু ও সেজদায় লুটিয়ে থাকতে দেখবে। সেজদার প্রভাবে তাদের চেহারায় সমর্পিত জীবনের প্রতিফলন ঘটবে। আল্লাহ তাওরাতে তাদের পরিচয় এভাবেই দিয়েছেন। আর ইঞ্জিল কিতাবে তাদের উপমা দেওয়া হচ্ছে, তারা এমন বীজ, যা অঙ্কুরিত হয়ে আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, একসময় কাণ্ডের উপর শক্ত হয়ে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। ফলে চাষির মন আনন্দে ভরে যায়। আল্লাহ এভাবেই ঈমানদারদের সমৃদ্ধ করেন। আর তা দেখে সত্যের দুশমনদের অন্তর্জ্বালা আরো বাড়তে থাকে। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করবে, তিনি তাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন।[৬১]

সাহাবাগন নিজেদের জীবনের বিনিময়ে হলেও আল্লাহর দ্বীনের বিজয় ও প্রতিষ্ঠার কাজে সচেষ্ট থেকেছেন। নবীজির সকল আহ্বানে তারা এক বাক্যে সাড়া দিয়েছেন। আর সে কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাদের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন। সন্দেহ নেই যে, সাহাবাগন কে এমন নিবেদিত ও যোগ্য করে গড়ে তোলা পিছনে নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যোগ্য নেতৃত্ব যে ভূমিকা রেখেছে, তার পিছনে অবদান উল্লেখযোগ্য। কুরআনে সাহাবাদের প্রশংসা নিয়ে এমন অসংখ্য আয়াত বর্তমান রয়েছে।

لَّقَدْ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

[৬১] আল কুরআন, ৪৮:২৯

অর্থ: হে নবী, আল্লাহ তোমার সেসব ঈমানদার সাথীদের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে তোমার হাতে আমৃত্যু লড়াইয়ের বায়াত করেছিলো। তখনকার তাদের মনের অবস্থা আল্লাহ ভালো করেই জানতেন। তাই তিনি তাদের মনকে করেছিলেন প্রশান্ত ও স্থির-দৃঢ়চেতা এবং পুরস্কার হিসেবে দিলেন আসন্ন বিজয়। [৬২]

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

অর্থ: শোনো! যেসব মুহাজির এবং আনসারেরা প্রথমদিকের দুর্দিনে ঈমানের পথে দাঁড়িয়েছিলো এবং পরবর্তী সুদিনগুলোতেও যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সবার উপরেই সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহকে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্যে জান্নাত সাজিয়ে রেখেছেন, যার পাদদেশে রয়েছে প্রবাহমান জলধারা। চিরকালের জন্যেই তারা সে সুখ উপভোগ করবে। আর এটাকেই বলে মহাসাফল্য।[৬৩]

২.৯. প্রতিপক্ষের কথার জবাবে যুক্তি শিক্ষাদান

মক্কার অবিশ্বাসীরা শুরু থেকেই এই অভিযোগ করে আসছিলো যে, কুরআন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বানিয়ে নিয়েছে। সে নিজে কিছু একটা রচনা করে তা আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবে আল্লাহ তাআলা কোনো কিছুই নাযিল করেননি। তাদের কেউ কেউ বলতে থাকলো, মুহাম্মদ একজন কবি। সে নিজের কবিতাগুলোকে আল্লাহর কালাম বলে আমাদের থেকে ফায়দা নিতে চায়। কেউ বললো, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তবে একজন গনক। সে নানা চটকদার কথা বলে নিজেকে আল্লাহর পয়গম্বর দাবী করতে চায়। আসলে তার মতলব ভিন্ন। কারো ব্যাখ্যায় নবীজির উদ্দেশ্য ধরা পড়লো, ক্ষমতার মসনদ লাভ করা। কেউ বলতে থাকলো, সে আসলে সুন্দরী রমনিদের মন জয় করতে এসব করছে। আবার কারো ধারণা হলো, হয়তো মুহাম্মদ এসব বলে কিছুটা ধন-সম্পত্তি লাভ করতে চায়। এভাবে মক্কার কাফেরা যে যার মতো মিথ্যা অপবাদ দিতে লাগলো।

যখন তাদের বলা হলো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিরক্ষর। তিনি কোনো কিছুই লিখতে পারেন না। তাঁর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনা নেই। তখন তারা বললো, তাহলে তাকে

[৬২] আল কুরআন, ৪৮:১৮
[৬৩] আল কুরআন, ৯:১০০

কোনো জীন এসব শিখিয়ে দেয়। অথবা সে অন্য কারো কাছ থেকে এসব শুনে এসে আমাদেরকে বলে। বাস্তবে মক্কার কাফেরেরা সত্যকে স্বীকার করতে আগ্রহী ছিলো না।

এই একই কথা বলতো আহলে কিতাবের লোকেরাও। তারাও নবীজিকে অস্বীকার করতো। যদিও তারা জানতো যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী। তবুও তারা জাগতিক স্বার্থে তাঁর বিরোধিতা করতো। তারা বলতো, এই কুরআন আসমানি কিতাব নয়; বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বানিয়ে বলছেন। তাদের এই কথার প্রতুত্তোরে মহান আল্লাহ খুবই শক্তিশালী বয়ান দিয়েছেন। তিনি সূরা আল বাকারার একেবারে শুরুতেই বলেছেন, সন্দেহ নেই এই কিতাব আসমানি কিতাব।[৬৪]

এ সকল অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায় কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে চমৎকার যুক্তি শিখিয়েছে। বলেছে, কাফেরদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে। যদি সত্যিই এই কিতাব কোনো মানুষের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে লেখা সম্ভব হয়, তবে তোমরা চেষ্টা করে দেখো, এর মতো কিছু বানাতে পারো কিনা। তোমাদের মধ্যেতো অনেক যোগ্য নামকরা কবি-সাহিত্যিক আছো, চেষ্টা করে দেখো, এই কিতাবের কোনো একটি সূরার মতো সূরা বানাতে পারো কিনা? কুরআনের অসংখ্য জায়গায় এমন চ্যালেঞ্জের নানা সুরত বর্তমান পাওয়া যায়।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾

অর্থ: নাকি ওরা এ কথা বলতে চায় যে, এ কিতাব তুমি নিজে রচনা করেছো? হে নবী তুমি ওদের বলো, ঠিক আছে! তোমাদের সৎ সাহস থাকলে এর সূরার মতো দশটা সূরা নিজেরা রচনা করে নিয়ে এসো। প্রয়োজনে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্যান্য সব শক্তিকে কাজে লাগাও।[৬৫]

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

অর্থ: আচ্ছা! আমি আমার বান্দার উপর যে কিতাব নাযিল করেছি, তার ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ-সংশয় থাকে, তবে তোমরা এ কিতাবের কোনো সূরার মতো একটি সূরা বানিয়ে দেখাও। প্রয়োজনে এ কাজে এক আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্যান্য সব সাহায্যকারী উপাস্যদের ডেকে নাও। তোমাদের সন্দেহের দাবী যদি সত্য হয়, তবে এ কাজ করে দেখাও।[৬৬]

---

[৬৪] আল কুরআন, ২:২

[৬৫] আল কুরআন, ১১:১৩

[৬৬] আল কুরআন, ২:২৩

আরেক আয়াতে বলা হচ্ছে,

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

অর্থ: এরপরেও কি ওরা বলতে চায় যে, নবী নিজেই এ কুরআন রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছে? ঠিক আছে! তাহলে ওদেরকে বলো, এ দোষারোপের ব্যাপারে তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এ কুরআনের কোনো একটি সূরার মতো সূরা রচনা করে দেখাও। প্রয়োজনে এ কাজে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্যসব সহযোগীদের ডেকে নাও।[৬৭]

কুরআন নবীজিকে অসংখ্য যুক্তি শিখিয়েছে। অনেকভাবে তাঁর নেতৃত্বকে শক্তি যুগিয়েছে। তাঁর প্রতিপক্ষকে সরাসরি আক্রামণ করেছে। নানা ভঙ্গিতে তাদের অসার যুক্তিগুলোর প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেছে। নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতের নেতৃত্বকে বৈধতা দিতে কুরআন এ যুক্তিও পেশ করেছে যে,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

অর্থ: ওরা কি আসলেই কুরআনের ব্যাপারটি নিয়ে ভালোভাবে চিন্তভাবনা করে দেখেনি? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে আসতো, তবে এর মধ্যে ওরা নানা ধরনের অসঙ্গতি খুঁজে পেতো।[৬৮]

সর্বোপরি আল্লাহ তাআলা জগৎবাসীকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বের বৈধতা স্বীকৃতি দিতে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁর কথাকে মিথ্য প্রতিপন্ন করার শাস্তি হবে খুবই ভয়ানক। আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে বানানো বা আল্লাহর দেওয়া কিতাবকে অস্বীকার করা ব্যক্তির চেয়ে বড় সীমালঙ্ঘনকারী আর কেউ হতে পারে না।[৬৯] আল্লাহর নামে যে বা যারা মিথ্যা রচনা করে, তাদের পরিনাম হবে জাহান্নাম। কুরআন বলেছ,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

[৬৭] আল কুরআন, ১০:৩৮

[৬৮] আল কুরআন, ৪:৮২

[৬৯] কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, (অনু. মাওলানা তালেব আলী, ঢাকা: হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ২০০০) খন্ড: ৯, পৃ. ২৬৯।

অর্থ: আল্লাহর সাথে যে শরিক করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা মহাসত্যকে জেনে-বুঝে অস্বীকার করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? এখন তোমরাই বলো, এসব কাফেরদের জন্যে জাহান্নাম ছাড়া আর কী আবাস হতে পারে?[৭০]

২.১০. সত্যের পথে সাহস যোগানো

নবুওয়াতের শুরু থেকেই আল্লাহ তাআলা নবীজিকে সত্যের ওপর টিকে থাকার জন্য নানাভাবে সাহস যুগিয়েছেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন সময় নবীজিকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহদ্রোহী সকল শক্তির মোকাবেলায় শক্ত ভূমিকা পালন করার জন্য কুরআনে অসংখ্য নির্দেশনা এসেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে সাহস যুগিয়েছেন। কখনো কখনো মানসিকভাবে আবার কখনও কখনও লোকবল ও গায়েবী মদদ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

অর্থ: হে নবী, ওদের একদল তো তোমাকে বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে প্রায় বিভ্রান্ত করেই ফেলেছিল। আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ ও দয়ায় তুমি বেঁচে গেছো। অবশ্য এ কাজের মাধ্যমে ওরা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারতো না; বরং নিজেদেরকেই পথভ্রষ্ট হিসেবে প্রমাণ করতো। আসলে আল্লাহ তোমাকে কিতাব ও হিকমাত দান করেছেন এবং তোমার না জানা অনেক কিছুই তোমায় শিখিয়েছেন। বস্তুত তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ অপরিসীম।[৭১]

নবুওয়াতের শুরুর দিকে কিছুদিন ওহী বন্ধ থাকায়, নবীজি মানসিকভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তার মনে নানা শঙ্কা উদ্বেগ দেখা দিচ্ছিল। কখনো কখনো তিনি ভাবতেন হয়তো আল্লাহ তাআলা তাকে ভুলে গেছেন, নয়তো আর কোন ভুলের জন্য আল্লাহ তাআলা তার ওপরে নাখোশ হয়েছেন। এভাবে তিনি যখন বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

[৭০] আল কুরআন, ২৯:৬৮

[৭১] আল কুরআন, ৪:১১৩

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ ﴿٥﴾

অর্থ: হে নবী, তোমার রব না তোমায় পরিত্যাগ করেছেন, আর না কোনো ব্যাপারে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নিঃসন্দেহে তোমার আগামীর দিনগুলো অতীত সময়ের চেয়ে অনেক অনেক ভালো হবে। অচিরেই তোমার রব তোমাকে এতসব নেয়ামত দান করবেন যে, খুশিতে তোমার মন ভরে যাবে। [৭২]

এমনকি যে সকল দুশমনেরা নবীজিকে নানা সময়ে কষ্ট দিত তাদের ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলার নবীজিকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

অর্থ: নিশ্চয়ই তোমার সাথে যারা বিদ্বেষ-শত্রুতা করে, শেষ পর্যন্ত ওরাই হবে নির্বংশ।[৭৩]

২.১১. সবরের প্রশিক্ষণ দান

সবর অর্থ ধৈর্য। যে কোনো কাজ সুন্দরভাবে করতে প্রয়োজন হয় এই সবরের। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতি কাজে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন। সকল প্রতিকূলতা ধৈর্যের সাথে তিনি মোকাবেলা করেছেন। কখনো কখনো তিনি দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন। আবার কখনও কখনও তার পেশ করা দাওয়াত লোকেরা প্রত্যাখ্যান করেছে। কখনোবা থাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। কখনো তার সাথীদের কে আঘাত করেছে, নির্যাতন করছে।[৭৪] কখনো তার দাওয়াতের লক্ষ্যবস্তুকে মানুষের সামনে পেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। কখনো বা নবীজির দাওয়াতি আয়োজনকে ভন্ডুল করে দেওয়া হয়েছে। এই সকল পরিস্থিতিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়তার সাথে তার সাথীদের নিয়ে দ্বীনের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে কুরআন দৃঢ়ভাবে কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেছেন যে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের হৃদয়

[৭২] আল কুরআন, ৯৩:৩-৫

[৭৩] আল কুরআন, ১০৮:৩

[৭৪] মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)*, (রাজশাহী, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৫) পৃ. ১৪৯

মৃত।[৭৫] কুরআনের নির্দেশনার আলোকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম এই কাজ করতে পেরেছেন। পবিত্র কুরআনে এই ব্যাপারে অসংখ্য নির্দেশনা পাওয়া যায়।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾

অর্থ: হে নবী, তুমি তো মৃতকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না। আর যে বধির– তোমাকে দেখা মাত্রই পিছন ফিরে পালিয়ে যাচ্ছে, তার কাছেও তোমার দাওয়াত পৌঁছাতে পারবে না।[৭৬]

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ﴿١٠﴾

অর্থ: হে নবী, সত্য অস্বীকারকারীরা তোমার বিরুদ্ধে যা কিছু বলে বেড়াচ্ছে, তুমি তাতে ধৈর্য ধারণ করো এবং ভদ্রভাবে ওদের এড়িয়ে যাও। [৭৭]

২.১২. তায়াক্কুল শিক্ষাদান

তাওয়াক্কুল মানে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা। কোনো কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করে এগিয়ে যাওয়াই হলো তায়াক্কুল এর পরিচয়। আল্লাহ তা'আলা সকল কাজে তার ওপরে ভরসা করাকে পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। নবী-রসুলদের ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকল নবী রসুলগন সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা রেখে দাওয়াতি কাজ করেছেন।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার উপরে ভরসা করে দ্বীনের কাজ চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সকল বাধা বিপত্তি মোকাবেলায় এক আল্লাহর সাহায্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বীন ইসলামের প্রতিপক্ষ শক্তির সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা চাইতে বলেছেন। বলা যায় কুরআন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বের মূল্যবান গুণটি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾

অর্থ: কাজেই শুধুমাত্র আল্লাহর উপর আস্থা ও ভরসা রেখে চলো। সন্দেহ নেই, কাজ সম্পাদনের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।[৭৮]

---

[৭৫] কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৯, পৃ. ৯০।

[৭৬] আল কুরআন, ২৭:৮০

[৭৭] আল কুরআন, ৭৩:১০

[৭৮] আল কুরআন, ৩৩:৩

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

অর্থ: হে নবী, একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করো। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। সদা সর্বদা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা জপতে থাকো। আর তিনিই তার বান্দাদের পাপ সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন।[৭৯]

২.১৩. বিজয় ও সফলতার আশ্বাস প্রদান

দ্বীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও বিজয় মুসলমানদের জন্য বড় সৌভাগ্যের এবং প্রয়োজনীয়। আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গী সাথীদের কে দ্বীনের বিজয় ঘটবে বলে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। যত বিপদ বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন একদিন না একদিন আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হবে। পবিত্র কুরআনে অসংখ্য জায়গায় দ্বীনের বিজয় ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে যখন মক্কায় মুসলমানেরা দুর্বল হয়ে নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছে, তখন আল্লাহ তাআলা দ্বীন বিজয়ের ঘোষণা দিয়েছেন।

এ সকল ঘোষণায় একদিকে মুসলমানদের মধ্যে যেমন শক্তি, আগ্রহ ও উদ্দীপনা তৈরী করেছে, অপরদিকে ইসলাম বিরোধী শক্তির মনে ভয় ও শঙ্কা তৈরি করেছে। যখন মুসলমানেরা চরমভাবে নির্যাতিত হয়েছে, তখন তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় দেওয়ার ঘোষণা তাদেরকে আনন্দিত ও শক্তিশালী করেছে। আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথীদের-কে এভাবেই বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে দাওয়াতের কাজে শক্তি যুগিয়েছেন।

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾

অর্থ: যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন দেখবে হে নবী, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন কবুল করছে। [৮০]

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾

অর্থ: তখন দেখবে হে নবী, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন কবুল করছে। [৮১]

---

[৭৯] আল কুরআন, ২৫:৫৮

[৮০] আল কুরআন, ১১০:১-২

[৮১] আল কুরআন, ৪৮:১

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান রাখে এবং সৎকাজ করে চলে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, পূর্ববর্তীদের ন্যায় তাদেরকেও জমিনে কতৃত্ব-ক্ষমতা দান করবেন। আল্লাহ তাদের জন্যে যে জীবনব্যবস্থা পছন্দ করেছেন, তাকে সুদৃঢ় করবেন। আর তাদের বর্তমান ভয়-ভীতি ও অনিশ্চয়তা দূর করে নিরাপত্তা ও শান্তিময় পরিবেশ দান করবেন। কাজেই ঈমানদারদের উচিত, কেবল আমার বন্দেগী করা এবং আমার সাথে কাউকে শরিক না করা। অতএব এখন কেউ যদি ঈমানের পথ থেকে সরে যায়, তবে সে নিশ্চিত সত্যত্যাগী-পাপিষ্ঠ।[৮২]

২.১৪. অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষাদান

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী অনেক জাতি এবং নবীদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতী কাজের নানা সময়ের প্রেক্ষাপটে ঐসকল জাতি ও নবীদের জীবনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে ঈমানদারদের বিজয় এবং বেঈমানদের পরাজয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা দেখিয়েছেন, যারা সত্যকে গ্রহণ করেনি, যুগে যুগে তাদের পরাজয় ঘটেছে। অন্যদিকে যারা সত্যকে মেনে নিয়েছে এবং সত্যের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দিয়েছে।

কুরআনে কখনো কখনো কাফেরদের উদ্দেশ্য করে পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে, আবার কখনো ঈমানদারদের কে উদ্দেশ্য করে পূর্ববর্তী ঈমানদারদের লড়াই-সংগ্রামের ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বয়ান পেশ করা হয়েছে। এভাবে একদিকে ঈমানদারগন যেভাবে শক্তিশালী হয়েছে, অপরদিকে বেঈমানরা আশাহত এবং শঙ্কিত হয়েছে। কুরআনে এ ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত পাওয়া যায়।

[৮২] আল কুরআন, ২৪:৫৫

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾

অর্থ: হে নবী, আমি এখন এ কুরআনের মাধ্যমে তোমাকে একটি চমৎকার কাহিনী শুনাতে যাচ্ছি, যা আমার ওহী পাওয়ার আগ পর্যন্ত তুমি জানতে না।[৮৩]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

অর্থ: হে নবী, আমি তোমার আগে এ পৃথিবীতে আরো বহু রসুল পাঠিয়েছি। তাদের কারও কারও ঘটনা তোমায় বলেছি। তবে আরো অনেকের কথা তোমায় বলা হয়নি। এসব রসুলদের কেউই আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কোনো অলৌকিক নিদর্শন দেখাতে পারতো না। কাজেই তুমি অপেক্ষা করো, আল্লাহর হুকুম এসে গেলে ওদের ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন এ মিথ্যাচারী বাতিলপন্থীরা মারাত্মক ক্ষতির শিকার হবে।[৮৪]

[৮৩] আল কুরআন, ১২:৩

[৮৪] আল কুরআন, ৪০:৭৮

অধ্যায়: ৩

মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা এর মাক্কী জীবনের নেতৃত্বে আল কুরআনের ধারাবাহিক সহায়তা ও নির্দেশনার পর্যালোচনা।

৩.১. নবুওয়াতের শুরুর দিকের দিনগুলোতে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব

৩.১.১. নবীজির কাছে প্রথম অহি

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির কয়েক বছর আগে থেকেই হেরা গুহায় ধ্যান করতেন। কাবা ঘরের কাছেই একটি পর্বতে এই হেরাগুহাটি অবস্থিত। কখনো কখনো নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম সেখানে কয়েক মাস পর্যন্ত ধ্যান করতেন। বিশেষ করে নবুওয়াত পাওয়ার কয়েক মাস আগে থেকে তিনি দীর্ঘ সময় ধ্যান করতেন। বিশেষ করে রমজান মাস এলে তিনি তিনি পুরো মাস হেরা গুহায় কাটাতেন।[৮৫] এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কিছু কিছু স্বপ্ন দেখতেন যেগুলো পরবর্তী দিন বাস্তবে ঘটে যেত।

এভাবে তার বয়স যখন চল্লিশ বছর ছয় মাসে পৌঁছে তখন তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম ওহী নাযিল হয়।[৮৬] ৬১০ খ্রিস্টাব্দের রমজান মাসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম হেরাগুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। এমন সময় একজন ফেরেশতা আগমন করেন। তিনি ছিলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম।[৮৭] নবীজিকে বলেন পড়ুন, নবীজি বলেন আমি তো পড়তে পারি না। তখন ফেরেশতা তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন এবার পড়ুন। নবীজি আগের মতই বললেন, আমি তো পড়তে পারি না। এরপর ফেরেশতা তাকে আবারও আলিঙ্গন করে বললেন পড়ুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন পড়লেন। সর্বপ্রথম ওহী হিসেবে আল্লাহ তাআলা নবীজিকে পড়তে বললেন।[৮৮] বস্তুত জ্ঞানের জন্য সবার আগে পড়তে শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেতৃত্বের গুণাবলী মধ্যে অন্যতম হলো জ্ঞানসমুদ্রের বিচরন করতে শেখা। সত্যি কারের জ্ঞান ছাড়া, সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব নয়।

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

---

[৮৫] আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, (ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন, ২০১১), পৃ. ৯৪

[৮৬] আবুদস শহীদ নাসিম, *নবীদের সংগ্রামী জীবন*, (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ২১৬

[৮৭] অহির দায়িত্বে থাকা মহান ফেরেশতা।

[৮৮] আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

অর্থ: পড়ো! তোমার সৃষ্টিকর্তা মহান রবের নামে। যিনি মানুষকে সামান্য এক নিষিক্ত ডিম্ব থেকেই সৃষ্টি করেছেন। পড়ো! তোমার মহান রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে অজানা অনেক কিছু শিখিয়েছেন। [৮৯]

৩.১.২. নবীজিকে মানসিক ও জ্ঞানগতভাবে প্রস্তুতকরণ

প্রথম ওহী পাওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি অনেকটা ভয় পেয়ে যান। এসময় তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। এবং স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। তখন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবীজিকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তার প্রশংসা করলেন। বললেন ভয় পাবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার কোন ক্ষতি করবেন না। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। নবীজির অস্থিরতাও কিছুটা কমে এলো। এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াতি দায়িত্ব পালনের জন্য নতুন করে ওহী করা হলো। এ ব্যাপারে কুরআন বলছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ
زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

অর্থ: হে কাপড় মুড়ি দিয়ে শায়িত, ওঠো! রাতের এক অংশে নামাজের জন্যে দাঁড়াও। রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কিছু কম সময়। অথবা চাইলে তার চেয়ে কিছু বেশি সময়ও নিতে পারো। আর অবশ্যই এ সময় কুরআন পাঠ করবে ধীরে ধীরে, স্পষ্ট উচ্চারণে, অর্থ ও ভাবের প্রতি খেয়াল রেখে। কেননা অচিরেই আমি তোমার উপর আমার পবিত্র বাণীর গুরু দায়িত্ব অর্পণ করতে যাচ্ছি।[৯০]

মাঝখানে কিছুদিন ওহী আসা বন্ধ থাকে। সময় নবীজি অস্থিরতা বোধ করেন।[৯১] কখনো কখনো তার মনে নানা সন্দেহ দেখা দেয়। কখনো তিনি ভাবেন হয়তো আল্লাহ তাকে ভুলে গেছেন অথবা তার কোন কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা আসলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলছেন। ওহীর এই বিরতিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম নিজেকে গুছিয়ে নিতে সময় পেয়েছিলেন। এরপর নবীজিকে সান্ত্বনা দিয়ে পূর্ণ একটি সূরা নাযিল করলেন। এভাবেই ধীরে ধীরে অল্প করে করে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে নেতৃত্বের যোগ্য করে গড়ে তোলেন।

---

[৮৯] আল কুরআন, ৯৬:১-৫

[৯০] আল কুরআন, ৭৩:১-৫

[৯১] আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

وَٱلضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلْءَاخِرَةُ
خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰٓ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا
فَـَٔاوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾

অর্থ: শপথ আলো ঝলমলে সকালের। শপথ নিঝুম কালো রাতের। হে নবী, তোমার রব না তোমায় পরিত্যাগ করেছেন, আর না কোনো ব্যাপারে তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। নিঃসন্দেহে তোমার আগামীর দিনগুলো অতীত সময়ের চেয়ে অনেক অনেক ভালো হবে। অচিরেই তোমার রব তোমাকে এতসব নেয়ামত দান করবেন যে, খুশিতে তোমার মন ভরে যাবে। হে নবী, তুমি তো এতিম ছিলে। আমি কি তোমায় আশ্রয় দেইনি? তুমি তো পথহারা ছিলে, আমি কি তোমায় সত্য পথের সন্ধান দেইনি? তুমি তো নিঃস্ব-অসহায় ছিলে, আমি কি তোমায় অভবমুক্ত করিনি? [৯২]

৩.১.৩. পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের মাঝে দাওয়াতের নির্দেশনা

দাওয়াতী কাজের জন্য প্রয়োজন কর্মকৌশলের। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা শুরু থেকেই দাওয়াতের কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। শুরুতে যখন প্রথম ওহী লাভ করলেন, সবার আগে তিনি তার আপন স্ত্রী হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে দাওয়াত দিলেন। এরপর নিজ ভাতিজা হযরত আলীকে দাওয়াত দিলেন। এরপর গোলাম হযরত জায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের দাওয়াত পেলেন। এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন বন্ধু হযরত আবু বকর কে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন।[৯৩] এভাবে পরিবার এবং নিকট বন্ধুদের কাছে সবার আগে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের দাওয়াত প্রকাশ করলেন। আস্তে আস্তে তিনি তার নিজ বংশ ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে দ্বীনের দাওয়াত প্রকাশ করতে লাগলেন।

পবিত্র কুরআনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবেই দ্বীনের দাওয়াত দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবীজিকে বলা হয়েছে, তুমি তোমার নিকট আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের কাছে দ্বীনের দাওয়াত প্রকাশ করো।[৯৪] এভাবে কিছুদিন দাওয়াতী কাজ করার পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তার গোত্রের সকল লোকদেরকে একটি ভোজসভার আমন্ত্রণ জানান। সভায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয়-স্বজনের কাছে দ্বীনের দাওয়াত উপস্থাপন করলেন।

---

[৯২] আল কুরআন, ৯৩:১-৮

[৯৩] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *মহানবী স. ও সভ্য পৃথিবীর ঋণ স্বীকার*, (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০০) পৃ. ৪৮

[৯৪] নঈম সিদ্দিকী, *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ*, (ঢাকা:শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ১২০

সে অনুষ্ঠানে তার বংশের সকল লোকেরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।[৯৫] যদিও তারা তখন নবীজির দাওয়াত গ্রহণ করেনি সে অনুষ্ঠানে, শুধুমাত্র নবীজির চাচা আবু লাহাব বিরোধিতা করলো। সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিরস্কার করলো। পবিত্র কুরআনে ওই চাচার বিষয়ে একটি সূরা আল্লাহ তাআলার নাজিল করে তার সকল অপকর্মের প্রতিবাদ করলেন।

এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম একদিন খুব ভোরে মক্কার অদূরে সাফা পাহাড়ে উঠে ইয়া সাবাহ বলে সকল লোকদেরকে আহ্বান করলেন।[৯৬] ইয়া সাবাহ সাধারণত কোন বিপদ এর সংকেত হিসেবে বলা হয়ে থাকতো। নবীজির ডাক শুনে তার আশেপাশের সকল লোকেরা জড়ো হয়ে গেল। তখন নবীজি তাদের বললেন, আচ্ছা আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এই পাহাড়ের পিছনে শত্রুদল লুকিয়ে আছে, তোমরা কি সেটা বিশ্বাস করবে? লোকেরা বলল হ্যাঁ আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি। কারণ তুমি কখনো মিথ্যে বলো না। তখন নবীজি তাদের বললেন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি, তোমরা যদি আমার এই দাওয়াত গ্রহণ না করো, তবে তোমরা জাহান্নামের আগুন ভোগ করবে। এভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বংশ ও গোত্রের সকল লোকদেরকে প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন।[৯৭] নবুওয়াতের ৩ বছর পরে তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ লাভ করেন।[৯৮] এভাবেই তিনি কুরআনের নির্দেশনার আলোকে দ্বীনের দাওয়াত সম্প্রসারণ ও মজবুতকরণে সক্রিয় হয়ে উঠলেন।

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

অর্থ: আর আপন আত্মীয়-স্বজনদের এ ব্যাপারে সতর্ক করো। [৯৯]

কুরআনে আরো বলা হচ্ছে,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

অর্থ: হে চাদরাবৃত, ওঠো! মানুষকে সতর্ক করো এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো [১০০]

---

[৯৫] আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

[৯৬] মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, *যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা*, (ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ. ১২১

[৯৭] আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

[৯৮] আব্দুল মান্নান তালিব, *প্রিয় নবীর আদর্শ জীবন*, প্রাগুক্ত, (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ২০১২) পৃ. ১৪

[৯৯] আল কুরআন, ২৬:২১৪

[১০০] আল কুরআন, ৭৪:১-৪

এভাবে প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা যেনো সবাই নিজেকে ও আপন লোকদেরকে দ্বীনের পথে চালিত করে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের সে আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যার নিয়ন্ত্রণ থাকবে কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাদের হাতে, যারা আল্লাহর আদেশ কখনোই অমান্য করে না; বরং তাঁর নির্দেশ হুবহু শতভাগ পালন করে। [১০১]

৩.১.৪. ছোট ছোট সূরার মাধ্যমে তাওহীদ এর মৌলিক পাঠদান

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াতের কাজে মানুষদেরকে কি বলবেন, তা আল্লাহ তাআলা তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। কোন জিনিসের দিকে মানুষকে আহবান করে, কোন বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করবেন, কি বলে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবেন, আবার কোনটা মানুষকে সংযত হতে বলবেন, তার সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের মধ্যে ওহী পাঠিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল তাই মানুষকে বলতেন যা আল্লাহ তাআলা তাকে বলার জন্য নির্দেশ দিতেন।

দাওয়াতের শুরুর দিকে আল্লাহ তাআলা ছোট ছোট সূরা নাযিল করতেন। সকল সূরা গুলোতে কাব্যিক ছন্দে এক আল্লাহর বর্ণনা দেওয়া হত। পাশাপাশি আখিরাতের জীবনের বাস্তবতা নানাভাবে তুলে ধরা হতো। একই সাথে এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলে যে কি ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে তা বর্ণনা করা হতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গী-সাথীগন অন্যান্য সাধারণ মানুষকে এই সকল সূরা গুলো পড়ে পড়ে শুনাতেন। এভাবেই নবীজি তার দাওয়াতী কাজ করতেন।

একথা সুস্পষ্ট নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গী-সাথীগন কুরআনের বাণী পাঠ করে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। সাধারণ মানুষের উপরে কুরআন তেলাওয়াতের প্রভাব ছিল অসাধারণ এবং অপ্রতিরোধ্য। খুব সহজেই কুরআনের তেলাওয়াত শুনে একজন সাধারণ মানুষ বিমোহিত হত। এমনকি মক্কার বড় বড় কাফের নেতারাও কুরআনের তেলাওয়াত শুনে মোহিত হতো। ফলে তারা সাধারণ মানুষকে কুরআন পাঠ শুনতে নিষেধ করতো। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষ তারা বল প্রয়োগ করে

[১০১] আল কুরআন, ৬৬:৬

কুরআনের তেলাওয়াত অনুষ্ঠানকে বন্ধ করে দিত। এ সকল দৃশ্যপট চিন্তা করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একেবারেই সহজ যে, কুরআন নিজেই দাওয়াতের কাজে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

মক্কায় নাযিল হওয়া সেই ছোট ছোট সূরাগুলোর মধ্যে এক ধরনের বৈপ্লবিক শক্তি নিহিত ছিল। এই শক্তির বলে নবীজি এবং তার সাহাবীগন খুব সহজেই দাওয়াতের কাজ করতে পারতেন। এমন একটি সূরা 'ইখলাস', মাত্র ৪ লাইনের এই ছোট্ট সূরাটিতে একত্ববাদের পরিচয় খুবই চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

অর্থ: হে নবী, লোকদের বলো, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও উপর নির্ভরশীল নন বরং প্রত্যেকেই তাঁর উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ কাউকে জন্ম দেন নাই এবং কারও কাছ থেকে নিজেও জন্ম নেন নাই। কাজেই আল্লাহর সমতুল্য কেউ হতে পারে না। [১০২]

সূরা কাফিরুন, এমনই একটি সূরা, যেখানে আল্লাহ তাআলা মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্য করে খুবই জ্বালাময়ী বক্তব্য রেখেছেন। এ সূরা নাযিল পর মক্কার কাফেররা পরিষ্কারভাবে বুঝে গিয়েছিলো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের কে কোনোভাবেই দ্বীনের দাওয়াত থেকে ফিরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। কোন প্রলোভন কিংবা কোনো ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদেরকে থামানো যাবে না। বস্তুত এ সময় মক্কার কাফের নেতারা নানা কৌশলে ও নানা প্রলোভনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গী সাথীদের কে দ্বীনের দাওয়াত থেকে ফিরাতে চেয়েছিলো। তারা নানা ধরনের প্রস্তাব এসেছিল। তারা বলেছিল, প্রয়োজনে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নিব। তুমি চাইলে তোমাকে অনেক সম্পত্তির মালিক বানিয়ে দিবো। কোন সুন্দরী নারীকে পেতে চাইলে আমরা তাও এনে দেবো। তবুও তুমি তোমার দাওয়াত থেকে বিরত হও।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন তাদের সকল প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কুরআনের সেই কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যা আল্লাহ তাআলা সূরা আল কাফিরুন নাজিল করে জানিয়ে দিয়েছেন। এভাবেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফল নেতৃত্বের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন। বলা যায় কুরআন নিজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নেতৃত্বের পথে এগিয়ে নিয়েছে।

[১০২] আল কুরআন, ১১২:১-৪

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَـٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾

অর্থ: হে নবী, ওদের বলো, ওহে কাফেরেরা, তোমরা যেসব দেবতার ইবাদত করো, আমি তাদের ইবাদত করি না। আর আমি যে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করি, তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও। তোমাদের ইলাহদের ইবাদত করতে যেমন আমি প্রস্তুত নই, তেমনি তোমরাও আমার ইলাহের ইবাদত করতে প্রস্তুত নও। কাজেই এখন তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্যে, আর আমার দ্বীন আমার জন্যে। [১০৩]

৩.১.৫. আখেরাতের ব্যাপারে সঠিক চিন্তা-বিশ্বাস গঠন

মক্কার কাফেররা আখেরাতকে অস্বীকার করতো। তারা মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করতো না; বরং তারা ভাবতো, দুনিয়ার জীবনই শেষ জীবন, এরপর আর কোন জীবন নেই। তারা এও মনে করতো, কেউ একজন মারা গেছে, মাটির সাথে তার হাড়গোড় পঁচে মিলে যায়। তার পুনরুজ্জীবন করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন তাদের এই ভুল ধারণা কে বাতিল করে দেয়। কুরআন তাদেরকে বলে, অবশ্যই মৃত্যুর পর জীবন রয়েছে। সেখানে তোমাদেরকে এই দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজের হিসেব দিতে হবে। সেই হিসেবে যারা উত্তীর্ণ হবে কেবল তারাই মুক্তি পাবে। অন্যদের জন্য থাকবে ভয়ঙ্কর শাস্তি।

ইসলামের দাওয়াতের এই দিকটি মক্কার কাফেরদের কে নাড়া দিয়েছে। তাদের কেউ কেউ আখেরাতকে সরাসরি অস্বীকার করলেও অনেকেই ছিল দ্বিধান্বিত। কারো কারো মধ্যে পরকালের ব্যাপারে ভয় ও আশঙ্কা বিরাজ করছিল। বিশেষ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ব্যাপারে বেশি আলোচনা শোনা যাচ্ছিলো।

মক্কার শুরুর দিকে আল্লাহ তাআলা আখেরাতকে বেশি বেশি করে আলোচনায় এনেছেন। এ সময় সত্য প্রত্যাখ্যানের শাস্তি হিসেবে জাহান্নামের বর্ণনা তুলেছেন। ছোট ছোট সূরার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আখেরাতের ব্যাপারে খুবই চমৎকার নির্দেশনা দিয়েছেন। এসব নির্দেশনা ও বর্ণনা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগনের দাওয়াতি কাজে সহায়ক হয়েছে। এ কথা বলা যায় যে, কুরআনের এরকম সূরাগুলো নবীজির নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশ সরাসরি ভূমিকা পালন করেছে। এমন অসংখ্য নির্দেশনা কুরআনে পাওয়া যায়।

[১০৩] আল কুরআন, ১০৯:১-৬

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

অর্থ: হে নবী, যে বিচার দিনকে অস্বীকার করে, তুমি কি তার পরিণতি ভেবে দেখেছো? এ ধরনের লোকেরা এতিমদের সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। দরিদ্র-অসহায়দের খাবার দিতে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে না। [১০৪]

ٱلْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴿٥﴾

অর্থ: ভয়ানক মহাপ্রলয়! কী সে মহাপ্রলয়! তুমি কি ধারণা করতে পারো, সে মহাপ্রলয়ে কী ঘটতে যাচ্ছে? সেদিন মানুষ ভয়ে আতঙ্কে কীট-পতঙ্গের মতো এদিক-সেদিক দৌড়াতে থাকবে। বিশাল বিশাল পাহাড়-পর্বতগুলো রঙ-বেরঙের ধুনা তুলার মতো উড়তে থাকবে। [১০৫]

[১০৪] আল কুরআন, ১০৭:১-৩

[১০৫] আল কুরআন, ১০১:১-৫

৩.২. মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি দিনগুলোতে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব

৩.২.১. মক্কার কাফেরদের ধর্মীয় অবস্থা চিত্রায়ণ

মক্কার কাফেররা ছিল মূর্তিপূজারী। তাদের অধিকাংশই শিরকে ডুবেছিল। অথচ সেখানে ছিল এক আল্লাহর ইবাদাতের নিদর্শন পবিত্র কাবা ঘর, যা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তার পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালাম তৈরি করেছিলেন। সাধারণ লোকেরা মূলত এই কাবাঘরের সম্মানে নিরাপদ ও স্বনির্ভর জীবন লাভ করেছিলো। কাজেই তাদের উচিত ছিল, কাবা ঘরের এক ও অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করা। কুরআনে আল্লাহ তাআলা মক্কার কাফেরদের এই ব্যাপারটি বর্ণনা করেছেন। এভাবে কাফেরদের মোকাবেলায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগনকে নৈতিকভাবে শক্তি যুগিয়েছেন।

لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴿٣﴾ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ﴿٤﴾

অর্থ: আশ্চর্য! কুরাইশরা এখন ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। শীত-গ্রীষ্ম সব সময় ওরা এখন নিশ্চিন্ত-নিরাপদে বাণিজ্যযাত্রা করছে। কাজেই যে ক্বাবার সম্মানে ওরা এ সুযোগ পেলো, ওদের উচিত সে ক্বাবার মালিক এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদাত করা। কেননা তিনিই ওদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং সকল ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রেখেছেন। [১০৬]

কুরআনে এমন কথা অসংখ্যবার বলা হয়েছে যে, মক্কার কাফেররা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদের এবাদত করছে, তাদের কেউই খোদা হবার উপযুক্ত নয়। তারা না মানুষের কোন সাহায্য করতে পারে, আর না পারে কারো কোন ক্ষতি করতে। এমন অক্ষম ও অসার বস্তুকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা কোনভাবেই বৈধ হতে পারে না। নবীজি লোকদেরকে এ কথাগুলোই বুঝিয়েছেন।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾

[১০৬] আল কুরআন, ১০৬:১-৪

অর্থ: তারপরও কি ওরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমনসব ভ্রান্ত খোদাদের পূজা চালিয়ে যাবে, যারা ওদের জন্যে মহাকাশ কিংবা পৃথিবী কোনো জায়গা থেকে সামান্য একটু জীবিকাও সরবরাহ করার সক্ষমতা রাখে না? এমনকি যারা ওদের জন্যে কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না? [১০৭]

৩.২.২. আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কাফেরদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের সমালোচনা

আল্লাহর ব্যাপারে মক্কার কাফেরদের ধ্যান ধারণা ছিল বিভ্রান্তিকর। তাদের কেউ কেউ আল্লাহকে সর্বশক্তিমান স্রষ্টা মনে করলেও, তার সাথে আরও অনেক দেব-দেবীর পূজা করতো। বস্তুত তারা আল্লাহর চাইতে ঐ সকল দেবদেবীকে বেশি ডাকতো। তাদের কারো কারো ধারণা ছিল, এইসব দেবদেবী তাদের মনোবাসনা পূরণ করতে সক্ষম।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাওহীদের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা নিজের পরিচয় বর্ণনা করার পাশাপাশি, আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে যাদেরকে পেশ করা হয় তাদের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। এমন একটি বাস্তবতা হল, কাফেররা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য যেসকল উপাস্য তৈরি করে নিয়েছিল, আসলে তারা ছিল কতগুলো মিথ্যে কাল্পনিক নাম মাত্র। যুগে যুগে মানুষেরা কালক্রমে এ সকল নাম তৈরি করে নিয়েছিল। এর পিছনে আল্লাহর কোনো অনুমোদন কিংবা সমর্থন ছিল না।

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾

অর্থ: আসলে এসব দেবদেবী, এগুলো কিছুই না, স্রেফ কতগুলো নাম, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা মিলে রেখেছো। অথচ এর সমার্থনে আল্লাহ কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি। প্রকৃত ব্যাপার হলো, ওরা ভ্রান্ত ধ্যন-ধারনা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা নিয়েই পড়ে রয়েছে। অথচ ওদের কাছে ওদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য-সঠিক পথনির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে।[১০৮]

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

[১০৭] আল কুরআন, ১৬:৭৩

[১০৮] আল কুরআন, ৫৩:২৩

অর্থ: আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্যান্য ভ্রান্ত খোদাদের ডেকে চলছে, অথচ এর বৈধতার জন্যে কোনো দলিল-প্রমাণ নেই– তাকে তার রবের কাছে এর জন্যে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। এ ধরনের সত্য অস্বীকারকারীরা কখনোই সফল হবে না।[১০৯]

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

অর্থ: এ তোমাদের কেমন অদ্ভুত কথা! পুত্র সন্তান দিয়ে তোমাদেরকে তোমাদের রব বড়ই সৌভাগ্যবান করেছেন; অথচ তিনি নিজে তার জন্যে ফেরেশতাদেরকে কন্যা হিসাবে গ্রহণ করলেন? এসব তোমাদের ভয়ানক মিথ্যাচার। তোমরা নিজেরাই এগুলো বানিয়ে নিয়েছো।[১১০]

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

অর্থ: তুমি ওদের জিজ্ঞেস করো, আল্লাহর চেয়ে বড় সাক্ষী আর কে হতে পারে? কাজেই আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষ্য দেবেন। ওদেরকে আরো বলো, তোমাদেরকে এবং তোমাদের অনাগত প্রজন্মকে সত্য সম্পর্কে সতর্ক করতেই আল্লাহ এ কুরআনকে আমায় ওহীর মাধ্যমে দিয়েছেন। আচ্ছা! তোমরা কি এখনো এ সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, আল্লাহর সাথে অন্য আরো অনেক ইলাহ রয়েছে? তবে শুনে রেখো, আমি কখনোই এমন সাক্ষ্য দেই না; বরং আমি স্পষ্ট ভাষায় বলি, কেবল আল্লাহই একমাত্র ইলাহ এবং এ ব্যাপারে আমি তোমাদের মতো শিরক করি না। [১১১]

৩.২.৩. মুসলমানদেরকে বিশ্বাসের বুনিয়াদ গঠন

আল্লাহ তাআলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনিই সকল লাভ ও ক্ষতির মালিক। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নিজের ইচ্ছেমত ব্যবস্থাপনা চালিয়ে থাকেন। তাঁর নির্দেশকে না কেউ পিছনে সরাতে পারে, আর না তাঁর মীমাংসাকে কেউ বাধা প্রদান করতে পারে। যদি তিনি অকল্যাণ ও অমঙ্গলকে থামিয়ে দেন, তবে

[১০৯] আল কুরআন, ২৩:১১৭
[১১০] আল কুরআন, ১৭:৪০
[১১১] আল কুরআন, ৬:১৯

সেটা কেউ চালু করতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি কল্যাণ ও মঙ্গলকে চালু করেন, তবে সেটাকে কেউ থামাতে পারে না। [১১২]

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

অর্থ: অতএব আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হও এবং তাঁর সাথে কাউকেই শরিক করো না। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করে, তার উপমা হচ্ছে সেই ব্যক্তির মত, যে আকাশের মতো উঁচু কোনো জায়গা থেকে নিচে পড়ছে আর মুহূর্তের মধ্যেই কোনো মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো কিংবা ঝড়ো হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোনো এক অজানা জায়গায় আছড়ে ফেললো। [১১৩]

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

অর্থ: কেউ আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করলে, আল্লাহ তাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। তবে এ ছাড়া সে আর যে পাপই করুক না কেন, তিনি চাইলে তাকে মাফ করবেন। আসলে যে আল্লাহর সাথে শরিক করে, সেতো ভ্রান্ত পথে হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর চলে গেছে। [১১৪]

৩.২.৪. মুসলমানদের উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ

দাওয়াতের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে উন্নত চরিত্র ও আদর্শ। আদর্শবান ব্যক্তি কথা এবং কাজের মাধ্যমে মানুষকে সত্যের পথে দাওয়াত দিয়ে থাকে। যাদের কথা এবং কাজের মধ্যে মিল নেই, সাধারণত লোকেরা তাদের দাওয়াত কবুল করে না। এ কারণেই কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে উন্নত চরিত্র ও আদর্শ জীবন গঠন করতে উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সর্বোত্তম জাতি হিসেবে তৈরি করেছেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর।[১১৫] তাদেরকে মানুষের কল্যাণে নিবেদিতভাবে কাজ করে যাওয়ার নির্দেশ

[১১২] ইবনে কসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড:৯-১১, পৃ. ২১
[১১৩] আল কুরআন, ২২:৩১
[১১৪] আল কুরআন, ৪:১১৬
[১১৫] ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৪-৭, পৃ. ১৩৯

দিয়েছেন। মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুত অন্যকে ভালো উপদেশ দিতে হলে নিজের নৈতিক চরিত্র উন্নত করতে হয়।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

অর্থ: হে মুসলমানেরা, বর্তমানে তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল। মানুষের কল্যাণে অনবরত কাজ করার জন্যেই তোমাদের বাছাই করা হয়েছে। সুতরাং লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ দাও, অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখো এবং নিজেরা সর্বাবস্থায় এক আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখো। আসলে এ কিতাবওলারা যদি তোমাদের মতো ঈমান আনতো, তবে সেটা ওদের জন্যেই ভালো হতো। অবশ্য ওদের থেকে সামান্য কয়েকজন ঈমান এনেছে, তবে অধিকাংশই নাফরমান রয়ে গেছে। [১১৬]

চরিত্র উন্নত করার জন্য আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের কে বলেছেন, বিশুদ্ধ চিত্তে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহমুখী হতে। জাগতিক সকল কাজকর্মে আল্লাহকে ভয় করতে। বিশেষ করে যারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরিক করে, তাদের থেকে দূরত্ব রাখতে। কুরআন বলছে

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

অর্থ: কাজেই তোমরা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ অভিমুখী হও। আল্লাহ সচেতন হও। নামাজ কায়েম করো। কখনো শরিককারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। [১১৭]

একসাথে শয়তান যে মানুষের চূড়ান্ত দুশমন, সে কথাও বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বস্তুত শয়তান মানুষের সর্বদা পাপের পথে চালিত করে। উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনে শয়তান সবসময় বড় বাধা হয়ে কাজ করে। কুরআন তাই বলছে,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

[১১৬] আল কুরআন, ৩:১১০

[১১৭] আল কুরআন, ৩০:৩১

অর্থ: ভুলে যেও না, শয়তান তোমাদের ভয়ানক শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ করো। আসলে শয়তান তার দলবলকে জাহান্নামের লেলিহান শিখার দিকেই ডেকে নিয়ে যাচ্ছে। [১১৮]

আল্লাহ তাআলার সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যমে শয়তানের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন করা সম্ভব। ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তাআলা সর্বদা আল্লাহর গুণগান ও মহিমা জপতে আদেশ করেছেন।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

অর্থ: কাজেই হে নবী, সত্যের এসব দুশমনেরা যা-ই বলুক না কেন, তুমি ধৈর্যের সাথে কাজ চালিয়ে যাও। আর তোমার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘেষণা করো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে, রাতের কিছু অংশে এবং দিনের দুই প্রান্তে। হয়তো এতে তুমি পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হতে পারবে। [১১৯]

একই সাথে পবিত্র কুরআনে উন্নত আদর্শবান মানুষদের সম্মান ও মর্যাদা বিষয়ে পরিষ্কার আলোচনায় এসেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সর্বোত্তম মানুষ হিসেবে সম্মানিত করেছেন। সত্যিকার অর্থে যে বা যারা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং নিজেরাও সে পথে দৃঢ়ভাবে অটল ও অবিচল থাকে, তারাই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম। এ দাওয়াত মুখে, কলমে ও অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে হতে পারে। আজানদাতাও এ দাওয়াতে শামিল।[১২০]

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

অর্থ: ভেবে দেখো! যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে চলে এবং বলে, আমি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমার্পিত করেছি– তার চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে? [১২১]

৩.২.৫. নবীজির চরিত্র নিয়ে কাফেরদের নানা প্রশ্ন ও অভিযোগের জবাব দান

মক্কার কাফের নেতারা যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে সঠিক যুক্তি ও প্রমাণ হাজির করতে সক্ষম হয়নি, তখন তারা নবীজির নামে মিথ্যা রটনা করতে আরম্ভ করে।

---

[১১৮] আল কুরআন, ৩৫:৬

[১১৯] আল কুরআন, ২০:১৩০

[১২০] মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শাফী, *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০৫

[১২১] আল কুরআন, ৪১:৩৩

ওরা ইনিয়ে-বিনিয়ে নানা কিছু প্রচার করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি সাধারণ লোকদের ভীতস্পৃহ করে তোলার চেষ্টা করে।[১২২] তারা নানাভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে মিথ্যা অপবাদ দেয়। সাধারণ মানুষকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য তারা এ কাজ করছিল।

তারা একবার বলে, মোহাম্মদ একজন গণক। গণনা করে সে মানুষের জীবনের কথাগুলো বলতে পারে। এরকম অন্যান্য গণকদের মতো কেউ একজন গণক মাত্র। আবার কখনও কখনও তারা নবীজিকে পাগল বলে অপবাদ দিতে।[১২৩] বুঝাতে চাইতো, একজন পাগলের কথায় কান দেওয়ার কিছু নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এমন কথা ও আচরণে ভীষণ কষ্ট পেতেন। ব্যক্তিত্ব-আত্মমর্যাদার কারণে তিনি ওইসব কাফের নেতাদের সাথে ঝগড়ায় জড়াতেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাফেরদের মিথ্যাচারের শক্ত জবাব দিয়েছেন।

فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

অর্থ: অতএব হে নবী, তুমি মানুষেকে উপদেশ দিতে থাকো। আর হ্যাঁ! তোমার রবের দয়ায় তুমি গণক কিংবা পাগল– কোনোটাই নও। [১২৪]

কখনো কখনো কাফেরেরা আবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন কবি বলে ছোট বানানোর চেষ্টা করতো। কুরআনের সূরার কাব্যিক সৌন্দর্য মোকাবেলা করতে না পেরে ওরা এমন অভিযোগ করতো। বোঝাতে চাইতো, মক্কার অন্যান্য শত শত কবিদের মতো নবীজি নিজেও একজন কবি। কাজেই কুরআনের এই বাণীকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। অন্যান্য কবিদের কবিতার মতোই নবীজির কবিতাকেও গ্রহণ করতে হবে। এভাবে তারা কুরআনের গুরুত্ব ও মর্যাদা ছোট করার হীন প্রচেষ্টা চালাতো। মহান আল্লাহ তাআলা ওদের এমন প্রত্যেকটি অপচেষ্টাকে প্রতিরোধ করেছেন কুরআনের মাধ্যমে। এভাবেই নবীজির নেতৃত্ব মজবুত ও শক্তিশালী হয়েছে, যার পিছনে সরাসরি কুরআনের ভূমিকা রয়েছে।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

অর্থ: এ কোনো কবির রচনা নয়, যদিও তোমরা খুব কমই ঈমান এনে থাকো। [১২৫]

মক্কার কাফেররা দাওয়াতের প্রতিউত্তরে বারবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রেসালাতের উপরে আক্রমণ করেছে। তাদের ধারণা ছিল, একজন সাধারণ মানুষ কখনোই আল্লাহর নবী হতে পারে না। এমন তো হবে এমন কেউ, যে আমাদের মতো হাটে বাজারে যাবেনা, ঘর সংসার

---

[১২২] এ কে এম নাজির আহমদ, *অপপ্রচারের মুকাবিলায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ*, (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৬), পৃ. ৬

[১২৩] আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতূম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

[১২৪] আল কুরআন, ৫২:২৯

[১২৫] আল কুরআন, ৬৯:৪১

করবে না, মানবিক চাহিদার মধ্যে থাকবে না। এমন পবিত্রসত্তা আল্লাহর পয়গাম নিয়ে আসবে, যারা মানুষ না হয়ে অন্য কিছু হবে। সাধারণত ফেরেশতাদের কে নবী হিসেবে পেতে চাইতো। অথচ আল্লাহ তাআলা সব সময় নবী হিসেবে মানুষদেরকে নির্বাচন করেছেন। সকল যুগ ও সকল জাতির কাছে মানুষদেরকে নবী বানিয়েছেন।

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾

অর্থ: ওরা বলে, এ আবার কেমন রসুল, যে আমাদের মতোই খাওয়া-দাওয়া করে, হাট বাজারে ঘুরে বেড়ায়? আচ্ছা! তার সাথে একজন দৃশ্যমান ফেরেশতা কেন পাঠানো হলো না, যে তার সাথে সবসময় ঘুরতো এবং তার অমান্যকারীদের ভয় দেখাতো? [১২৬]

মক্কার কাফেররা অদ্ভুত কিছু কথা বলতো। ওরা বারবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন দেখতে চাইতো। ওরা বলতো, কেন এই নবীর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ কোন নিদর্শন আসেনা? কেন তার সাথে একজন ফেরেশতা সব সময় দৃশ্যমান হয় ঘোরাফেরা করে না, যাতে সকল মানুষ ওই ফেরেশতাকে দেখে বুঝতে পারে, যে তিনি আল্লাহর নবী।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের এমন এমন সব উদ্ভট দাবি ও অভিযোগের প্রতিবাদ করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করতে পবিত্র কুরআন অসংখ্যবার কাফেরদের এমন অভিযোগের যৌক্তিক জবাব দিয়েছে। কুরআন বলছে, কখন এবং কোন ধরনের নিদর্শন নাযিল করতে হবে, তা কেবল আল্লাহই ভালো জানেন। তাছাড়া ফেরেশতাদেরকে নবী না বানানোর যুক্তিগত দিক তুলে ধরেছেন। মানুষের জন্য মানুষই নবী হওয়ার যোগ্য। আর কোন জনপদের ফেরেশতা দৃশ্যমান হওয়ার অর্থই হলো, এলাকাবাসীকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান। আর ফেরেশতারা মানুষের সুরত ধরে আসলে, তখনও বর্তমান সন্দেহ থেকেই যেতো।[১২৭]

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾

অর্থ: সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা অভিযোগ করে, ইনি যদি নবীই হয়ে থাকবেন, তবে এর প্রমাণে তার রবের পক্ষ থেকে কোনো অলৌকিক নিদর্শন নাযিল হয় না কেন? হে নবী, আসলে তুমি

[১২৬] আল কুরআন, ২৫:৭

[১২৭] ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৮-১১, পৃ. ১৬

তো একজন সতর্ককারী মাত্র। এভাবেই প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর কাছে আমি একজন পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছি। [১২৮]

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿٨﴾

অর্থ: ওরা আবার যুক্তি দেখায়, তাহলে এ রসুলের সাথে একজন ফেরেশতা এলো না কেন? ওরা কি এটুকুও বুঝে না যে, ফেরেশতা এলে তো সব বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালাই হয়ে যেত। ফলে ওরা আর সামান্য অবকাশও পেতো না। [১২৯]

৩.২.৬. কাফেরদের জিজ্ঞাসিত কিছু প্রশ্নের উত্তর প্রদান

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় কাফেরদের এমন তির্যক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা এসেছে। সাধারণত কাফেরেরা কেয়ামতের সময় নিয়ে প্রশ্ন করতো। অনেক সময় তারা তাচ্ছিল্যের স্বরে এসব বলতো। ওরা ধারণা করতো যে, কখনোই কেয়ামত হবে না। বাস্তবে যখনই কেউ কেয়ামতের সময় নিয়ে প্রশ্ন করেছে, আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় তাকে সতর্ক করেছেন। কেয়ামতের দিন একমাত্র আল্লাহ জানেন। কুরআন মানুষকে কেয়ামতের জন্য প্রস্তুত হতে বলে; তবে কেয়ামতের দিন কবে হবে তা নিয়ে চিন্তা করতে নিরুৎসাহিত করে।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

অর্থ: হে নবী, এসব লোকেরা আবার তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কেয়ামত কবে-কখন হবে? তুমি সাফসাফ বলে দাও, এ ব্যাপারটি একমাত্র আমার রবই জানেন। তিনি যথাসময়ে তা তোমাদের সামনে প্রকাশ করবেন। তবে মনে রেখো, সে সময়টি মহাকাশ ও পৃথিবীর জন্যে খুবই ভয়ানক ব্যাপার হবে এবং কিছু বুঝে উঠার আগেই তোমাদের উপর তা সংগঠিত হয়ে যাবে। আসলে ওরা তোমার কাছে এমনভাবে প্রশ্ন করছে, যেনো তুমি এসব ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে বসে আছো। তুমি ওদের ভালোকরে জানিয়ে দাও, আল্লাহ ছাড়া কেয়ামতের সময়-

[১২৮] আল কুরআন, ১৩:৭
[১২৯] আল কুরআন, ৬:৮

ক্ষণ সম্পর্কে আর কেউ কিছুই জানে না। আসলে অধিকাংশ মানুষই এ সত্যটি সম্পর্কে রয়েছে বড়ই বেখবর। [১৩০]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেররা মাঝেমধ্যে কিছু প্রশ্ন করতো। এভাবে তারা নবীজির নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ করতে চাইতো। এমন একটি প্রশ্ন ছিল জুলকারনাইন সম্পর্কে। সাধারণত একজন নবী ছাড়া আর কেউই জুলকারনাইন এর ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিতে সক্ষম নয়। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে জুলকারনাইন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। কাজেই কুরআন যদি আসমানী কিতাব হয়, তবে অবশ্যই এখানেও জুলকারনাইন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের সূরা কাহাফে জুলকারনাইন এর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বের উপরে কাফেরেরা যে অভিযোগ তুলেছিল, তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন। এভাবেই প্রতিটি মুহূর্তে কুরআন নবীজির দাওয়াতকে শক্তিশালী করেছে।

وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

অর্থ: হে নবী, ওরা তোমাকে 'জুলকারনাইন' সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করছে। ওদের বলো, তার জীবন ইতিহাস আমি তোমাদের এখনই জানাচ্ছি। [১৩১]

কাফেরেরা আরেকবার নবীজির কাছে এসে জিজ্ঞেস করল মানুষের জীবন সম্পর্কে। প্রশ্ন করল, রুহ কি জিনিস? সাধারণ একজন আরব ব্যক্তির কাছে এমন প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। সকল প্রশ্নের উত্তর একজন নবী দিতে পারেন। কুরআন নবীজির এই কঠিন পরিস্থিতিতে সাহায্য করল। নবীজিকে জানানো হলো, রুহ হচ্ছে আল্লাহর একটি নির্দেশ। আল্লাহর নির্দেশে এই রুহ মানবদেহের মধ্যে প্রবেশ করে, আবার মানব দেহ থেকে সেই রুহ বের হয়ে যায়।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

অর্থ: হে নবী, ওরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। ওদের বলে দাও, রূহ আমার রবের হুকুমে আসে এবং যায়। তোমরা এর গোপন রহস্য বুঝবে না। কেননা তোমদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে। [১৩২]

কাফেরেরা কখনো ভিন্ন প্রশ্ন করতো। কেয়ামতের সম্ভাব্যতাকে নাকচ করে দিতে তারা জিজ্ঞেস করতো, সেইসময় মজবুত পাহাড়গুলোর অবস্থা কি হবে? কুরআন তারও জবাব দিয়েছে।

[১৩০] আল কুরআন, ৭:১৮৭
[১৩১] আল কুরআন, ১৮:৮৩
[১৩২] আল কুরআন, ১৭:৮৫

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

অর্থ: হে নবী, ওরা তোমায় জিজ্ঞেস করছে, মহাপ্রলয়ের দিনে পাহাড়গুলোর অবস্থা কী হবে? তুমি বলে দাও, আমার রব এগুলোকে বালুকণায় পরিণত করে বাতাসে উড়িয়ে দেবেন। [১৩৩]

৩.২.৭. মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতনের প্রতিবাদে নাযিল হওয়া আযাবের ঘোষণা

মক্কায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইসলামের দাওয়াত দিন দিন ছড়িয়ে পড়েছিল। দাওয়াতের পরিসর যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, একই সাথে কাফেরদের পক্ষ থেকে আক্রমনাত্মক অবস্থান তৈরি হচ্ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কার দাস শ্রেণি ও গরিব অসহায় শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করতো, তাদের ওপরে নানা শারীরিক নির্যাতন চালাতো। দিন দিন নির্যাতনের মাত্রা ও পরিষর বাড়তে লাগল। মুসলমানদের উপর শারীরিক ও মানসিক এবং অর্থনৈতিকভাবে এসব নির্যাতন চালানো হতো। ধনী বণিক সাহাবীগণের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করা হতো। অনেকে কর্মক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হতেন।

বিশেষভাবে দুর্বল ও অসহায় মক্কার কাফেররা চালাতো নানা নির্যাতন। কখনো তাদেরকে কারাবন্দি করে রাখত, আবার কখনো তাদেরকে জনসম্মুখে পিটিয়ে রক্তাক্ত করতো। কখনো দিনের পর দিন তাদেরকে অনাহারে-অর্ধাহারে রাখত। কখনো লোকসভা কবে তাদেরকে ভৎসনা করতো।[১৩৪] এক কথায় মক্কার যারাই ইসলামের সুমহান ছায়ায় আশ্রয় নিতে তাদের প্রত্যেককেই কোনো-না-কোনোভাবে নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হতো।

এ সকল নির্যাতনের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অসংখ্যবার সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে স্পষ্টভাষায়, জানিয়েছেন যে, যে বা যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী লোকদের ওপর নির্যাতন চালাবে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর শাস্তি। অপেক্ষা করছে জাহান্নাম। পবিত্র কুরআনের উল্লেখ মক্কার কাফেরদের জন্যে একদিকে যেমন ছিল ভীতিকর সতর্কবার্তা, অপরদিকে মুমিনদের জন্য ছিল সান্ত্বনা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতি কাজে কুরআনের এই বর্ণনা বেশ সহায়ক হয়েছিল। বলা যায়, এসব উল্লেখের কারণে নবীজির নেতৃত্ব শক্ত ও মজবুত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

---

[১৩৩] আল কুরআন, ২০:১০৫

[১৩৪] ইবনে হিশাম, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১২), পৃ. ৭৫

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾

অর্থ: অতএব যারা ঈমানদার নর-নারীর উপর জুলুম-নিপীড়ন চালিয়েছে, ওরা যদি তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে না আসে, তবে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে জাহান্নামের ভয়ানক আযাব, মাংসভেদী দহনযন্ত্রণা। [১৩৫]

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

অর্থ: বস্তুত কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া যাবে, যারা মানুষের উপর জুলুম চালায় এবং সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে চলে। এসব দুরাচারীদের জন্যে অপেক্ষা করছে এক মর্মান্তুদ শাস্তি। [১৩৬]

৩.২.৮. নির্যাতনের মুখে দ্বীনের উপর অটুট থাকার জন্যে মুসলমানদের উৎসাহ দান

দ্বীনের পথে চলার কারণে মুসলমানদের উপরে নানা সময়ে নানা নির্যাতন চলেছে। নির্যাতনের শিকার হয়ে মুসলমানরা কখনো কখনো তাদের আবাসভূমি থেকেও বিতাড়িত হয়েছেন। নিজের সহায়-সম্পত্তি হারিয়েছেন। আত্মীয়-স্বজন ওবন্ধু বান্ধবদের ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি দীর্ঘদিন গিরি দুর্গে সম্পূর্ণ হাশিমি বংশকে কারাবাস করতে হয়েছে।[১৩৭] অনেকে আপন পরিবার ছাড়তেও বাধ্য হয়েছেন। এ সকল নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য কুরআন অসংখ্য প্রতিদানের কথা উল্লেখ করেছে।

বিশেষভাবে যেসকল ঈমানদারেরা তাদের দ্বীনের কারণে কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, বাড়ি ঘর ছেড়েছেন, এরপরেও আল্লাহর পথে অবিচল থেকে কাজ করেছেন, তাদের জন্য মহান আল্লাহ বিরাট প্রতিদান দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। মক্কার মাঝামাঝি সময়ে অনেক সাহাবীগন হিজরত করে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।[১৩৮] তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা ব্যবস্থা করেছেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো।

---

[১৩৫] আল কুরআন, ৮৫:১০

[১৩৬] আল কুরআন, ৪২:৪২

[১৩৭] আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, (ঢাকা: ফাহিম বুক ডিপো, ২০১৫) পৃ. ৬২

[১৩৮] ইবনে হিশাম, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

অর্থ: যারা আল্লাহর পথে থাকায় নির্যাতনের শিকার হয়ে নিজ বাড়ি-ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে এ দুনিয়ায় আরো ভালোভাবে থাকা-পড়ার ব্যাবস্থা করে দেবো। আর পরকালে তো তাদের জন্যে অনেক বড় পুরস্কার থাকছেই। হায়! যালেমেরা যদি এ কথা জানতে পারতো। [১৩৯]

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

অর্থ: শুনে রেখো, যারা ঈমান এনেছে, এর জন্যে নিজেদের ঘর-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এবং আল্লাহর পথে লড়াই-সংগ্রাম করেছে, আর যারা এসব লোকদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে– তারা উভয়েই নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে শতভাগ খাঁটি বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমার ঘোষণা এবং সম্মানজন জীবিকার ব্যবস্থা। [১৪০]

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

অর্থ: তবে অবশ্যই সেসব কবিরা বিভ্রান্ত নয়, যারা ঈমান রাখে এবং সৎকর্ম করে চলে, নিজের কবিতায় বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ জারি রাখে এবং মাজলুমের পক্ষে প্রতিবাদী হয়। আর হ্যাঁ, শেষ কথা হচ্ছে, প্রত্যেক জালেম অচিরেই টের পাবে, কী করুণ পরিণতিই না ওদের কপালে জোটে! [১৪১]

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

[১৩৯] আল কুরআন, ১৬:৪১

[১৪০] আল কুরআন, ৮:৭৪

[১৪১] আল কুরআন, ২৬:২২৭

অর্থ: এতোদিন ধরে যারা অন্যায়ভাবে আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হয়েছে, আজ তাদেরকে সেসব যালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো। আল্লাহ অবশ্যই এসব মাজলুমদের সাহায্য করতে পূর্ণ সক্ষম। [১৪২]

৩.২.৯. দ্বীনের ব্যাপারে কাফেরদের সকল সমঝোতার চেষ্টাকে নাকচ করা

মক্কা শহরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজ অব্যাহত ভাবে করে যাচ্ছিলেন, তখন একপর্যায়ে মক্কার কাফের নেতৃবৃন্দ নবীজির সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে চাইছিলেন। তারা নবীজিকে আলোচনায় বসার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। নবীজির সাথে তারা কয়েক বার দেখা সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছিল। কাফেরেরা চাইছিল, যে কোনভাবেই হোক নবীজি ও তার সাহাবীদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখতে। তাই তারা সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছিলো। তারা নবীজিকে অর্থ সম্পদের লোভ দেখিয়েছিল। বলেছিল, যদি তুমি এই দাওয়াতী কাজ পরিত্যাগ করো তবে আমরা তোমাকে মক্কার সবচেয়ে বড় ধনী বানিয়ে দিব। তুমি চাইলে তোমাকে মক্কার সবচেয়ে সুন্দরী রমণীর সাথে বিয়ে দিব। কিংবা তুমি চাইলে তোমাকে আমাদের শীর্ষ নেতৃত্বের পদ প্রদান করবো। এভাবে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবাদেরকে দ্বীনের এই পবিত্র কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। এমনকি নবীজির অভিভাবক ও চাচা আবু তালিব এর কাছেও কাফেরেরা সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে আসে; কিন্তু নবীজি সবকিছুকেই বাতিল করে দেন। [১৪৩]

এ সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে কাফেরদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন। আল্লাহ বলে দিলেন, দুনিয়ার কোন প্রতিদান এর বিনিময়ে এই দাওয়াত বন্ধ করা হবে না। তোমাদের পথ তোমাদের, এবং আমাদের পথ আমাদের। তোমরা তোমাদের মত কাজ চালিয়ে যাও, আমরাও আমাদের মতন কাজ করে যাব। দেখা যাবে কাদের পরিণতি কেমন হয়।

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾

অর্থ: হে নবী, ওদের বলো, ওহে কাফেরেরা, তোমরা যেসব দেবতার ইবাদত করো, আমি তাদের ইবাদত করি না। আর আমি যে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করি, তোমরাও তাঁর

[১৪২] আল কুরআন, ২২:৩৯

[১৪৩] মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

ইবাদতকারী নও। তোমাদের ইলাহদের ইবাদত করতে যেমন আমি প্রস্তুত নই, তেমনি তোমরাও আমার ইলাহের ইবাদত করতে প্রস্তুত নও। কাজেই এখন তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্যে, আর আমার দ্বীন আমার জন্যে। [১৪৪]

একসাথে মক্কার কাফেরদের মিথ্যা খোদা ও ধর্মের ব্যাপারে সমালোচনা করা হলো। নবীজির কণ্ঠে কুরআন বলছে, তোমরা তো কিছু মিথ্যে মন গড়া কাল্পনিক খোদায় বিশ্বাস করো, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা মিলে নিজ হাতে বানিয়েছ। এ সব মূর্তি তো তোমাদের কোনো লাভও করতে পারে না, আবার কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। আল্লাহ তোমাদেরকে এগুলোর ইবাদত করার কোনো সনদও দেন নাই এবং তোমাদের কাছে এর কোনো দলিল-প্রমাণও নেই।[১৪৫] কাজেই তোমাদের সব খোদারা কোনভাবেই ইবাদতের যোগ্য নয়।

এভাবে কাফেরদের কূটনৈতিক কৌশলের মোকাবেলায় নবীজির নেতৃত্ব শক্তিশালী ও দৃঢ় হিসেবে প্রমাণিত হলো। সাধারণ চোখে এটা দৃশ্যমান যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বিজয় কুরআনের সাহায্যে হয়েছে।

ءٍ سَمَّيْتُمُوهَا

أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ

﴿٧١﴾

অর্থ: তোমরা তো ইতোমধ্যেই তোমাদের রবের শাস্তি ও ক্রোধের উপযুক্ত হয়ে বসে আছো। তোমরা তো কিছু নাম সর্বস্ব খোদাদের নিয়ে আমার সাথে বিতর্ক করছো, যাদেরকে তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা মিলে নিজেরাই বানিয়েছো; অথচ এর বৈধতার জন্যে আল্লাহ কখনোই কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। অতএব এখন তোমরা এর পরিণতি দেখার জন্যে অপেক্ষা করো, আমিও অপেক্ষা করছি। [১৪৬]

৩.২.১০. যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে কাফেরদেরকে তাওহিদ বোঝানো

দ্বীন বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে অসংখ্য যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করেছেন। সাধারণ মানুষকে শুধুমাত্র হুকুম দিয়ে দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়নি; বরং তাদেরকে মানবিক যুক্তি ও বিবেক বোধের মাধ্যমে দাওয়াতের যৌক্তিকতা বোঝানো হয়েছে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন কারাবন্দি ছিলেন, সেই সময়কার একটি ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা মানুষদের বুঝাচ্ছেন,

---

[১৪৪] আল কুরআন, ১০৯:১-৬

[১৪৫] ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৪-৭, পৃ. ৩২৫

[১৪৬] আল কুরআন, ৭:৭১

কেন এক ও অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করতে হবে। সাধারণ মানুষের বিবেকের সাথে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে যে, অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন খোদা রাজত্বে কি থাকার চেয়ে এক ও অদ্বিতীয় প্রভুর রাজত্বে বেশি নিরাপদ নয়?

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾

অর্থ: ইউসুফ আরো বললো, হে আমার কারাসঙ্গীরা, তোমরাই বলো, আলাদা আলাদা গুণবিশিষ্ট বহুসংখ্যক খোদা থাকা ভালো, নাকি সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ থাকা ভালো? [১৪৭]

সাধারণ মানুষের কাছে এই প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে যে, যদি কুরআন একাধিক খোদার পক্ষ থেকে আসতো, তবে নিশ্চয়ই এর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কথা ও পথ পরিলক্ষিত হতো। বিভিন্ন উৎস থেকে যদি এই কুরআনের বানী সংগৃহীত হতো, তবে অবশ্যই এর মধ্যে নানা অসঙ্গতি দৃশ্যমান হতো। নিশ্চয়ই এই বলিষ্ঠ যুক্তি সাধারণ মানুষের বিবেকে শক্তিশালী হয়ে আঘাত হানে।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

অর্থ: ওরা কি আসলেই কুরআনের ব্যাপারটি নিয়ে ভালোভাবে চিন্তভাবনা করে দেখেনি? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে আসতো, তবে এর মধ্যে ওরা নানা ধরনের অসঙ্গতি খুঁজে পেতো।[১৪৮]

কুরআনে আল্লাহ তাআলা সাধারণ মানুষদের জন্য এমন অসংখ্য প্রশ্ন ও নিদর্শন উপস্থাপন করেছেন। কখনো দিন ও রাতের পালাক্রম, চাঁদ ও সূর্যের আবর্তন, পৃথিবীর মহাকাশ এর মেলা বন্ধন, নদী সমুদ্র ও স্থল পথে নানা বিষয় নিয়ে কুরআনে অসংখ্য যুক্তি প্রমান উপস্থাপিত হয়েছে। এক আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতায় মানুষের উপর দিন ও রাত স্থায়িত্ব পায়। আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলছেন, আল্লাহ ছাড়া এমন কোন খোদা রয়েছে, যে তোমাদেরকে দিন বা রাত এনে দিতে পারে? এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রাথমিকভাবে মক্কাবাসীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছেন যে, তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ যদি দিন বা রাত কে তোমাদের উপর স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে, তোমাদের সাহায্য করার?[১৪৯]

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

[১৪৭] আল কুরআন, ১২:৩৯

[১৪৮] আল কুরআন, ৪:৮২

[১৪৯] পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৯, পৃ. ১৮৭

অর্থ: ওদেরকে জিজ্ঞাস করো, কখনো ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ যদি তোমাদের উপর দিনের আলোকে কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন্ ইলাহ রয়েছে, যে তোমাদের বিশ্রামের জন্যে রাত এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা দু'চোখ মেলে সত্যকে দেখবে না? [১৫০]

ٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ

يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾

অর্থ: হে নবী, ওদেরকে জিজ্ঞাস করো, আচ্ছা! তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যদি আল্লাহ তোমাদের উপর রাতের অন্ধকারকে কেয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো ইলাহ রয়েছে, যে তোমাদেরকে দিনের আলো এনে দিতে পারে? এরপরও কি তোমরা সত্যের প্রতি কর্ণপাত করবে না? [১৫১]

৩.২.১১. অতীত ঘটনা বলে কাফেরদের সতর্ককরণ

পবিত্র কুরআনে অসংখ্য পূর্ববর্তী জাতির জীবন কথা উল্লেখিত হয়েছে। ঐ সকল জাতির কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রসুল এসেছিলো। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ঐ রসুলদের দাওয়াতে সাড়া দেয় নাই। ফলে তাদের উপরে আল্লাহর ভয়ংকর আযাব এসেছিলো। এমন জালেম জনপদ ধ্বংসের অসংখ্য ইতিহাস কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ঐ সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাস মক্কার কাফেরদের সামনে বারবার পেশ করেছেন। আর এর অধিকাংশ ধ্বংসাবশেষ সম্পূর্ণ আরব জুড়ে রয়েছে, যা মক্কাসহ আরবের অনেকেই অবগত। ফলে কুরআন যখনই ঐ ধ্বংস ও পতনের ব্যাপারে আলাপ করে, তা মক্কার নাফরমানদের চোখে ভয় ধরিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষের অন্তরে কুরআনের দাওয়াতের ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে। কারণ মক্কার ঐসব নাফরমানরদের তুলনায় পূর্ববর্তী কাফেরেরা ছিলো অনেক বেশি শক্তিশালী।[১৫২] এভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতি মিশনের নেতৃত্ব বিকাশে সরাসরি কুরআন ভুমিকা রাখে। কুরআন বলছে,

---

[১৫০] আল কুরআন, ২৮:৭২

[১৫১] আল কুরআন, ২৮:৭১

[১৫২] শাইখুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন*, (অনু.মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১১) খন্ড: ৩, পৃ.৩২৬

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾

অর্থ: সীমালঙ্ঘনের শাস্তি হিসাবে কতো জালেম জনপদকেই আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। আহ! সেসব জনপদ আজ কেবল ধ্বংসস্তুপ। হায়! কতো কূপ পরিত্যক্ত হয়ে আছে! কতো সুরম্য প্রাসাদ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে! [১৫৩]

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

অর্থ: হে নবী, সত্যের দুশমনেরা যে জনপদ থেকে তোমায় বের করে দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী বহু জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। না, তখন সাহায্য করার জন্যে ওদের পাশে কেউ এসে দাঁড়ায়নি। [১৫৪]

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

অর্থ: হে নবী, ওদের পূর্বে কতো অবাধ্য জনপদকেই না আমি ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছি। ওরা নিত্যদিন সেসব ধ্বংসস্তুপের উপর দিয়ে চলাচল করছে। এসব দেখেও কি ওরা সত্য পথে ফিরে আসবে না? নিশ্চয়ই এসব ধ্বংসের ইতিহাসে ওদের জন্যে শেখার আছে, দেখার আছে। তবুও কি ওরা শুনবে না? [১৫৫]

৩.২.১২. নবীজির রেসালাতের পক্ষে বিগত নবী-রসুলদের সাক্ষ্য পেশ

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রসুল দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। পৃথিবীর সকল জনপদের লোকদের কাছেই আল্লাহর নবীগন দাওয়াতের জিম্মা বহন করেছেন। প্রত্যেক কওমের কাছে আল্লাহর সতর্কবর্তা পৌঁছানো হয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী। আল কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ আসমানি কিতাব।

[১৫৩] আল কুরআন, ২২:৪৫
[১৫৪] আল কুরআন, ৪৭:১৩
[১৫৫] আল কুরআন, ৩২:২৬

পূর্ববর্তী সকল নবী ও রসুলদের কাছে আখেরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুয়তের ব্যাপারে জানানো হয়েছে। ঐ সকল নবীদের কিতাবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। নবীগন তাদের উম্মতদেরকে এ ব্যাপারে আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছেন। এমনকি, ঐসকল নবীগনের কাছে এই ব্যাপারে অঙ্গিকারও গ্রহণ করা হয়েছে যে, তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াতকে মেনে নিবেন। সুযোগ পেলে তাকে সাহায্য পাবেন। তাঁর নবুওয়াতের পক্ষে নিজেদের নবুওয়াতকে বাতিল করবেন। নবীদের থেকে নেওয়া সেই অঙ্গিকারের ব্যাপারে কুরআন বলছে,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾

অর্থ: হে কিতাবওলারা, তোমরা সে অঙ্গীকরের কথা স্মরণ করো, যা আমি সব নবীর কাছে থেকে নিয়েছিলাম। আমি তাদের বলেছিলাম, তোমাদের কাছে যদি আমার এমন কোনো রসুল আসে, যে তোমাদের কাছে থাকা আমার কিতাব ও হিকমতকে সত্য বলে স্বীকার করে, তবে তার উপর অবশ্যই ঈমান আনবে। এমনকি, তার নবুওয়াতি কাজে পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এরপর আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার কাছে এ কথার উপর ওয়াদা দিচ্ছো এবং এ গুরু দায়িত্ব বহন করতে প্রস্তুত রয়েছো? তখন নবীরা এ ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ হলো। আল্লাহ বললেন, তাহলে তোমরা এ কথার উপর সাক্ষী থাকো। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম। [১৫৬]

কুরআন মাজীদ তার পূর্বের সমস্ত আসমানি কিতাবের সত্যতা স্বীকারকারী এবং ঐ কিতবাগুলো এই কুরআনের সত্যতার উপর দলীল স্বরূপ।[১৫৭] বিশেষত তাওরাত ও ইনজিল কিতাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল কুরআনের ব্যাপারে অসংখ্য বিবৃতি রয়েছে। মদিনার ইহুদিরা আগে থেকেই সে কারণে মদিনায় বসত গড়েছিলো। যেহেতু ওরা জানতো যে, আখেরি নবী মদিনায় আসবেন।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿٣﴾

অর্থ: তিনি ধাপে ধাপে তোমার উপর এ কিতাব নাযিল করেছেন, যা সত্যের বাণী বহন করে এবং এর আগের আসমানি কিতাবগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করে। [১৫৮]

---

[১৫৬] আল কুরআন, ৩:৮১

[১৫৭] ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৪-৭, পৃ. ১০

[১৫৮] আল কুরআন, ৩:৩

যখন কুরআন আল্লাহর বনী নয়– বলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বের উপর অভিযোগ আনা হতো, তখন আল্লাহ তাআলা নিজেই ঐসব অভিযোগ খন্ডন করতেন। যুক্তির মাধ্যমে সকল অভিযোগ নাকোচ করে দিতেন। যেহেতু আল্লাহ নিজেই তাওরাত ও ইনজিল নাযিল করেছেন, তাই কুরআনও তিনি নাযিল করেছেন। ফলে কুরআনে তাওরাত ও ইনজিল এর বক্তব্য সমর্থন করে।

وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

অর্থ: ভালোকরে জেনে রেখো, এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া আর কারও পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। এ কিতাব তো পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ণকারী এবং মানব জীবনের প্রতিটি বিধি-বিধানের বিশদ ব্যাখ্যাদানকারী। কাজেই এ কিতাব যে মহাবিশ্বের রবের পক্ষ থেকে এসেছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। [১৫৯]

৩.২.১৩. আখেরাতের ব্যাপারে মক্কার কাফেরদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতি কাজে শুরু থেকেই আখেরাত ছিলো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। মক্কার মুশরিকদের কাছে এ কথা বড়ই আশ্চার্য লাগতো যে, মারা যাওয়ার পর একদিন আবার জীবিত হতে হবে এবং এই দুনিয়ার সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। ওরা কোনো ভাবেই এটা মানতে পারতো না। ওদের অধিকাংশই মনে করতো যে, এই দুনিয়াই শেষ। এরপর আর কোনো দুনিয়া নেই।

আখেরাতের পূণর্জীবন নিয়ে মক্কার অধিকাংশ মানুষ নানা মতে বিভক্ত ছিলো। কেউ বলতো, একটা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। যখন মরে-পঁচে গলে যাবো, তখন আবার নতুন করে কিভাবে আমাদেরকে সৃষ্টি করবে? যখন একজন ব্যক্তির কোনো অস্তিত্বই থাকবে না, তখন তাকে কিভাবে নতুন করে তৈরি করবে? এটা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা ওদের এমন চিন্তার প্রতিবাদে যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে আলোচনা করছেন। আল্লাহ একটি মৃত ভূমির উদাহরণ দিয়ে বুঝাচ্ছেন যে, একসময় সামান্য বৃষ্টির পানি পেলে ঐ মৃত জমিনও জীবিত হয়ে ওঠে। সেভাবেই তোমরা আমার জীবিত হবে। এটা করা আল্লাহর জন্যে কোনো কঠিন বিষয় নয়। কুরআনে এটিকে ভূমির মৃত্যুর পরে বৃষ্টির মাধ্যমে জীবত হওয়ার উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে।[১৬০]

---

[১৫৯] আল কুরআন, ১০:৩৭

[১৬০] পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৯, পৃ. ৩২০।

فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

অর্থ: আল্লাহর দয়ার এ বৃষ্টির ফলাফল নিয়ে একবার ভেবে দেখো, কিভাবে এর দ্বারা তিনি মৃত জমিনকে জীবিত করে তোলেন? এভাবেই আল্লাহ তোমাদের মৃতদের জীবিত করবেন। মনে রেখো, প্রতিটি জিনিসের উপরই তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। [১৬১]

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

অর্থ: দেখো! আল্লাহ নিষ্প্রাণ থেকে প্রাণের উন্মেষ ঘটান। আবার কখনো প্রাণকে নিষ্প্রাণ বানিয়ে দেন। মৃত জমিনকেও তিনি জীবিত করে তোলেন। হ্যাঁ! এভাবেই একদিন তোমাদেরকেও মৃত থেকে পুনরুত্থিত করা হবে। [১৬২]

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾

অর্থ: ওরা জেনে রাখুক, মানুষের পুনরুত্থান ঠিক এভাবেই ঘটবে, যেভবে প্রথমে আল্লাহ বাতাস পাঠান এবং সে বাতাস মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে নিষ্প্রাণ ভূখন্ডের দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর এর মাধ্যমে তিনি প্রাণহীন জমিনে জীবনের বিকাশ ঘটান। [১৬৩]

পূনর্জীবন বা পরকালের সম্ভাবনা প্রমাণ করতে কখনো কখনো গল্প বা ইতিহাসের সত্য ঘটনার আশ্রয় নিয়েছেন। কুরআনে এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী নবীদের সময়ে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছে। বিশেষকরে এক পথিকের আল্লাহর কাছে করা প্রশ্নে, তার ১০০ বছর ঘুমিয়ে থেকে জেগে ওঠা এবং তার গাধা ও খাবারের যে সজিবতার গল্প তা মানুষের মনে নাড়া দেয়।[১৬৪] একইভাবে আসহাবে কাহাফের[১৬৫] ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য। এমনকি হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর পোষ্য পাখিগুলোকে আল্লাহ তাআলা যেভাবে পুনর্জীবন দিয়েছিলেন[১৬৬], সেই গল্পটাও গুরুত্ববহ। এমনকি মুসা আলাইহিস সালাম এর সময় বনি ইসরাইল এর একটি হত্যাকান্ড প্রামণে একজন

[১৬১] আল কুরআন, ৩০:৫০
[১৬২] আল কুরআন, ৩০:১৯
[১৬৩] আল কুরআন, ৩৫:৯
[১৬৪] আল কুরআন, ২:২৫৯
[১৬৫] কিছু যুবক ঈমান রক্ষার জন্যে গুহায় আশ্রয় নেয় এবং সেখানে ৩০৯ বছর পরে আবার জীবিত হয়। যা কুরআনের সূরা কাহাফের শুরুর দিকে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।
[১৬৬] আল কুরআন, ২: ২৬০

মৃতব্যক্তিকে জীবিত করে তোলা হয়েছিলো। এভাবে আল্লাহ তাআলা অনেক গল্প ও ঘটনা বর্ণনা করে মক্কার সাধারণ মানুষদেরকে আখেরাতের সত্যতার প্রমাণ দিয়েছেন।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

﴿٧٣﴾

অর্থ: সে সময় আমি আদেশ করলাম, নিহত ব্যক্তির লাশের সাথে যবেহ করা গাভীটির কোনো এক অংশ স্পর্শ করো। আসলে আল্লাহ এভাবেই মৃতদের জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তার নিদর্শন দেখান। হয়তো এর মাধ্যমে তোমাদের সঠিক বুঝ আসবে। [১৬৭]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে যে দাওয়াতের মিশন শুরু হয়েছিলো, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস ছিলো তার মৌলিক ও প্রধানতম আলোচ্য বিষয়। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব বিকাশে আখেরাতের ব্যাপারে শক্তিশালী বয়ান ও যৌক্তিক প্রমাণ হাজির করা ছিলো অতি দরকারী। কুরআন নিজে সেই কাজ করে দিয়েছে। ফলে নবীজির নেতৃত্ব খুব সহজেই বিকশিত হতে পেরেছে।

[১৬৭] আল কুরআন, ২:৭৩

৩.৩. মক্কার শেষ দিনগুলোতে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব

৩.৩.১. নির্যাতনের কঠিক মুহূর্তে সবর এর নির্দেশনা

দ্বীনের দাওয়াত যখন মক্কায় ও তার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে, তখন এর বিরোধিতাও দিন দিন বৃদ্ধি পায়। প্রথম দিকে কেবল মুখে মুখে এর বিরোধিতা চললেও, সময় গড়ালে এর বিপক্ষে নির্যাতনের পথ খুলে যায়। মক্কায় যারাই ইসলাম গ্রহণ করতো, তাদের উপরে শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক নির্যাতন চালানো হতো।

বিশেষকরে যারা দাস থেকে ইসলাম গ্রহণ করতো, তাদের উপরে তাদের মালিকেরা নির্মম নির্যাতন চালাতো। এমন অসংখ্য নির্যাতনের শিকারদের মধ্যে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখযোগ্য।[১৬৮] খাব্বাব ইবনে আরাত রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন তাদের একজন। এ সময় নির্যাতনের হাত থেকে অন্যান্য গরিব সাহাবীগনও রেহাই পেতেন না। সামাজিকভাবে একটু দুর্বল কেউ ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিলে, তার উপরে কাফের হায়েনারা ঝাপিয়ে পড়তো নগ্নভাবে। মানবিকতার ছিটে-ফোটাও রাখতো না। এমনকি খুনও করতে ফেলতো।

ইসলামের ইতিহাসে সবার প্রথম শাহাদাতের নজরানা পেশ করেন হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা। মক্কায় তাকে প্রকাশ্যে নির্যাতন করে কাফের নেতারা হত্যা করেছিলো। অনেক পরিবারের সম্পদ-সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেছে। মুসলিম হওয়ার কারণে অসংখ্য স্বচ্ছল ব্যক্তিকে অস্বচ্ছল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের ব্যবসা-বানিজ্যের সকল পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি মক্কার একজন শক্তিশালী ব্যবসায়ী নেতা ছিলেন, একটা সময় তারও অর্থকষ্টে দিন কাটাতে হয়েছে। এমনকি খোদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সফল ও বড় ব্যবসায়ী হওয়ার পরেও শেষ সময়ে তাকেও অর্থকষ্ট অনুভব করতে হয়েছে।

এভাবে মক্কার শেষ সময়ে চারদিক দিয়ে নানা বৈরি পরিবেশ মুসলামানদের মোকাবেলা করতে হয়েছে। এ সকল পরিস্থিতিতে ঈমানের উপরে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকার জন্যে আল্লাহ তাআলা বারাবর সবরের উপদেশ ও নির্দেশ জারি করেছেন। সকল বাধা-বিপত্তি মাড়িয়ে দ্বীনের পথে অটুট থাকতে কুরআন উৎসাহ যোগিয়েছে। কখনো সরাসরি সবরের নির্দেশনা দিয়ে, আবার কখনো অতীত মুসলমানদের লড়াই-সংগ্রামের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে সবর করতে নির্দেশ দিয়েছে। নানাভাবে এই সবরের নির্দেশনা এসেছে। কখনো সবরের কারণ, আবার কখনো সবরের ফলাফল বর্ণিত হয়েছে।

---

[১৬৮] বিলাল ইবনে রাবাহ ৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে হেজাজের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা রাবাহ ছিলেন একজন আরব দাস এবং তার মাতা হামামাহ ছিলেন একজন প্রাক্তন আবিসিনিয় রাজকুমারী, যাকে আমুল-ফিল এর ঘটনার সময় আটক করে দাসী করে রাখা হয়। দাস হিসেবে জন্মানেয়, বিলাল রা.কেও তার মনিব উমাইয়া ইবন খালাফ এর জন্য কাজ করতে হয়। কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন বলে বিলাল রা.একজন ভাল দাস হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং তার কাছেই আরবের পুতুলগুলোর ঘরের চাবি থাকতো। কিন্তু বর্ণবাদ এবং আরবের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে সেসময় তিনি সমাজের উচু স্তরে যেতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর আবু বকর রা. এর সহায়তায় দাসত্ব থেকে মুক্তি পান।

স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, জীবনে ভালো-মন্দ যাই হোক, কেবলমাত্র আল্লাহর অনুমতিক্রমেই সংঘটিত হয়ে থাকে।[১৬৯]

মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতার বিশালতার ধারণা মজবুত করা হয়েছে। আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। কাজেই বিপদ মোকাবেলা করতে, আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন হবে। কুরআন তাই বলছে,

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

অর্থ: জেনে রেখো, আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া মানুষের উপর কোনো বিপদ আসে না। এ ব্যাপারে যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে, কেবল তার অন্তরই সত্য খুঁজে পায়। মূলত আল্লাহ সবকিছুই জানেন। [১৭০]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে শরীক হওয়ার কারণে যে বা যারা জাগতিক নানা নির্যাতনের মুখে পড়েছে; কিন্তু এরপরেও দ্বীনের পথে অটুট থেকেছে, তাদের জন্যে উত্তম পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এভাবে একদিকে দ্বীনের পথে টিকে থাকার জন্যে দৃঢ়ভাবে লড়াই করতে বলা হচ্ছে, অপরদিকে ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় মুমিনদেরকে ঝালাই করে নেওয়া হচ্ছে।

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

অর্থ: আরো জেনে রেখো, আহত হওয়ার পরেও যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ডাকে পুনরায় সাড়া দিয়েছে, তারা সৎকাজ করলে এবং তাকওয়ার নীতিতে চললে, তাদের জন্যে বিরাট পুরস্কার অপেক্ষা করছে। [১৭১]

যখন চরম নির্যাতনে কিছু কিছু সাহাবী অস্থির হয়ে পড়লেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে বলে দোয়া করতে বললেন, তখন কুরআন তাদের জন্যে পূর্ববর্তী নবীদের ইতিহাস ও ঘটনা পেশ করেছে। ঐ সকল নবীগন ও তাদের উম্মতেরা যে নির্যাতনের মুখামুখি হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। ঐ সকল ঈমানদারেরা তাদের নবীদের সাথে সকল বাধা মোকাবেলা করে দ্বীনের পথে অটুট থেকেছেন। তারা দৃঢ়চিত্ত, ধৈর্যশীল ও

[১৬৯] সাইয়েদ কুতুব শহীদ, *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*, প্রাগুক্ত, খন্ড:২০, পৃ.২৪৮

[১৭০] আল কুরআন, ৬৪:১১

[১৭১] আল কুরআন, ৩:১৭২

কৃতজ্ঞই থেকেছেন। তারা অলস ও দুর্বল হননি এবং ঐ ধৈর্যের বিনিময়ে তারা আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা ক্রয় করে নিয়েছিলেন।[১৭২]

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

অর্থ: এর আগে বহু নবী আল্লাহর পথে লড়াই করেছে। তাদের সাথে বহু আল্লাহওলা বান্দারাও লড়েছে। এসব লোকেরা আল্লাহর পথে কোনো বিপর্যয়েই হতাশ হয়ে পড়েনি, দুর্বলতা দেখায়নি, এমনকি বাতিলের সামনে মাথা নত করেনি। আল্লাহ এ ধরনের ধৈর্যশীল লড়াকুদের খুবই ভালোবাসেন। [১৭৩]

লুকমান আলাইহিস সালাম[১৭৪] এর নসিহাতেও সবরের বয়ান পাওয়া যায়। তিনিও তার সন্তানকে সবরের নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু লুকমান আলাইহিস সালাম কে আরবের লোকেরা একজন বিজ্ঞ পন্ডিত মনে করতো, তাই তার কথার একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিলো।

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

অর্থ: হে আমার কলিজার টুকরা, (তিন) সদা-সর্বদা নামাজ কায়েম করো। (চার) সৎকাজের হুকুম জারি রাখো। (পাঁচ) খারাপ কাজে বাঁধা দাও এবং (ছয়) ধৈর্যের সাথে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করো। নিশ্চয় দৃঢ়চেতা প্রত্যয়ী ব্যক্তিরা এমনটাই করে থাকে। [১৭৫]

ঈমানদারদের গুণাবলীর মধ্যে ধৈর্য কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের মধ্যে ধৈর্যের গুন তৈরীর জন্য নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে নসিহত করেছেন।

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾

[১৭২] ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৪-৭, পৃ. ১৮০

[১৭৩] আল কুরআন, ৩:১৪৬

[১৭৪] লোকমান (এছাড়াও লোকমান হাকীম, লোকমান প্রজ্ঞাবান, এবং লুকমান, নামেও পরিচিত; আরবি: لقمان) ছিলেন একজন বিজ্ঞ লোক যার নামে আল কুরআনের একত্রিশতম সূরা, সূরা লুকমান (سورة لقمان) এর নামকরণ করা হয়। লোকমান (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দী) বর্তমান সুদানের নুবিয়ায় বসবাস করতেন বলে ধারণা করা হয়।

[১৭৫] আল কুরআন, ৩১:১৭

অর্থ: কেননা তারা তো এমনসব লোক, আল্লাহর নাম শোনামাত্রই যাদের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে ন্যায়পন্থায় খরচ করে।[১৭৬]

কখনো আবার যুক্তি-প্রামাণের ভিত্তিতে ধৈর্য্যের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করেছেন। কাফেরদের অতীত বিপদাপদের কথা স্মরণ করিয়ে মুমিনদের বলা হচ্ছে, তোমরা এখন যে আঘাত পেয়ে হতোদ্দ্যম হয়ে পড়ছো, এমন বিপদ তো ওরাও পেয়েছিলো। এভাবে মানসিকভাবে সবরের পথে টিকে থাকতে সহায়তা করা হয়েছে।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

অর্থ:. আর হ্যাঁ, তোমাদের বিরুদ্ধে কেউ যদি আক্রমণাত্মক আচরণ করে, তবে তোমরা তার সমুচিত জবাব দেবে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করো, তবে মনে রেখো, ধৈর্যশীলদের পরিণতিই শুভ হয়। [১৭৭]

ঈমানদার মুসলমানদের এই বলেও সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে জুলুম করবে, তাদের পরিণতি হবে খুবই খারাপ এবং ভয়াবহ। তাদেরকে কঠিন শাস্তির আওতায় আনা হবে। এই ঘোষণায় একদিকে মুমিনদের মনে ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে কাফেরদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়।

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿١٠﴾

অর্থ: অতএব যারা ঈমানদার নর-নারীর উপর জুলুম-নিপীড়ন চালিয়েছে, ওরা যদি তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে না আসে, তবে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে জাহান্নামের ভয়ানক আযাব, মাংসভেদী দহনযন্ত্রণা। [১৭৮]

আল্লাহ তার বান্দাদের সাথে সর্বদা সত্য ওয়াদা করে থাকেন। তিনি কখনোই তাঁর কথার খেলাপ করেন না। যতোই বাধা-বিপত্তি আসুক, দ্বীনের বিজয় অবশ্যই ঘটবে। অপশক্তির কোনো চেষ্টাই তাকে থামাতে পারবে না। কুরআনে মুমিনদের সবর করার নির্দেশনায় এই আশার বানী বেশ কাজে দিয়েছে। ঈমানদারেরা উৎসাহ পেয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতি মিশন সকল বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে সাহস পেয়েছে।

[১৭৬] আল কুরআন, ২২:৩৫
[১৭৭] আল কুরআন, ১৬:১২৬
[১৭৮] আল কুরআন, ৮৫:১০

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

অর্থ: অতএব হে নবী, সবর করো। আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। আর হ্যাঁ, বেঈমানেরা যেন তোমায় হতোদ্যম করতে না পারে।[১৭৯]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সামনে বারবার কুরআন পূর্ববর্তী নবী ও রসুলদের লড়াই সংগ্রামের কাহিনি উপস্থাপন করছে। ঐ সকল নবীরা ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।[১৮০] তীব্র বাধার মুখেও তারা যেভাবে সত্যের উপরে টিকে ছিলো, ত ছিল সত্যিই প্রেরণাদায়ক। কাফেরদের কোনো আঘাতই তাদের টলাতে পারতো না। ঐ সকল নবীদের জীবনের সংগ্রামী দিনগুলো স্মরণ করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীগন তাদের দাওয়াতি কাজের মিশন চালিয়ে যাবেন।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

অর্থ: অতএব হে নবী, পূর্ববতী দৃঢ়চেতা রসুলদের মতো প্রতিকূলতার মুখে ধৈর্য ধারণ করো। সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না। ওদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, যখন ওরা তা নিজ চোখে দেখবে, তখন ওদের মনে হবে, দুনিয়ায় যেন ওরা মাত্র কয়েক মুহূর্ত অবস্থান করে এসেছে। সত্যের বাণী ওদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এবার জেনে রাখুক, অবাধ্য পাপীদের ধ্বংস অনিবার্য। [১৮১]

ইউনুস আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর এক সম্মানিত বার্তাবাহক। তিনি তাঁর জনপদে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যখন হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তখন এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে চাইলেন। পথে তাকে সমুদ্রের মাছ গিলে ফেললো। কুরআন সেই ঘটনা শুনিয়ে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার মাধ্যমে উম্মতের দ্বায়ীদেরকে ধৈর্য ধারণ করার এক শক্তিশালী প্রমাণ দিলো।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾

অর্থ: অতএব হে নবী, ওদের ব্যাপারে তোমার রবের চূড়ান্ত ফয়সালা না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো। তুমি সে-ই মাছওয়ালা ইউনুসের মতো অধৈর্য হয়ো না, যে মাছের পেটে বিষণ্ন অবস্থায় আমায় ডেকেছিলো। [১৮২]

---

[১৭৯] আল কুরআন, ৩০:৬০

[১৮০] শাইখুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৩, পৃ.৩২০

[১৮১] আল কুরআন, ৪৬:৩৫

[১৮২] আল কুরআন, ৬৮:৪৮

দ্বীনের পথে টিকে থাকার জন্যে আপন দ্বীনি ভাই-বোনদের সাথেই সুসম্পর্ক রাখতে হবে। যারা দুনিয়া পুজারী হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে গেলে, আমাদের আখেরাত হারিয়ে যাবে। কুরআন এভাবে আমাদেরকে সবরের মাধ্যম বলে দিচ্ছে।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

অর্থ: আর হ্যাঁ! হে নবী, যারা প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় সকাল-সন্ধ্যা তাঁকে ডাকে, তুমি কেবল সে লোকদের সাথেই আত্মিক সম্পর্ক রেখে চলো। পর্থিব জাঁকজমকওলাদের কথা অনুযায়ী তাদেরকে কখনোই পরিত্যাগ করো না। সাবধন! যাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছি, তুমি কখনোই তাদের অনুসরণ করো না। কেননা ওরা কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশির গোলামী করে। এমনকি ওরা নৈতিক মানবিকতারও ধার ধারে না। [১৮৩]

৩.৩.২. আল্লাহর সাথে মিরাজের মাধ্যমে জ্ঞান ও সান্তনা প্রদান

মক্কার শেষদিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে নিজের দিদারে নিয়ে যান। এটা ছিলো একটা অলৌকিক ঘটনা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চারদিক দিয়ে এক ধরনের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এই উপহার আয়োজন করা হয়। অধিকাংশ সিরাত বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মিরাজের ঘটনা ঘটেছিলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হিজরতের এক বছর আগে রবিউর আউয়াল মাসে।[১৮৪]

এই সফর উপলক্ষ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্ষ পরিষ্কার করা হয়। এরপর তাকে বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মাকদাসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তিনি সাত আসমানের উপরে পাড়ি দেন। সাধারণ চোখে এ সবই অসম্ভব বলে মনে হলেও; আল্লাহর কুদরতে এগুলো সম্ভব বলেই ঈমানদারদের বিশ্বাস।

সফল নেতৃত্বের জন্যে চাক্ষুষ জ্ঞান ও মানসিক স্থিরতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। দ্বীনের নানা বিষয়ে হাতে-কলমে নবীজি এই সফরে শিখতে পেরেছেন। আল্লাহর কাছাকাছি উঠতে পেরেছেন। জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন। ঈমানদের উপর যে ৫ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়েছে, তাও এই সফরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেওয়া হয়েছে। এই কথা অনিস্বীকার্য যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু

[১৮৩] আল কুরআন, ১৮:২৮

[১৮৪] ড. সালমান আল আওদাহ, *মাআল মুস্তাফা*, (ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন, ২০২০) পৃ.৩৩

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশে মিরাজের একটি বড় ধরণের ভুমিকা ছিলো। আল্লাহর দিদারে নবীজি উজ্জিবীত হয়েছিলেন। সাহাবীগন আনন্দিত হয়েছিলেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

অর্থ: ১. আল্লাহ বড়ই পবিত্র ও মহামহিম। তিনি তাঁর বান্দা মুহাম্মাদকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্যে এক রাতের মধ্যে মসজিদুল হারাম থেকে বরকতময় পরিবেশপূর্ণ মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ এ ব্যাপারে তোমাদের সব কথা শোনেন এবং দেখেন। [১৮৫]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাতে যা কিছু দেখেছিলেন, তা একদিকে যেভাবে ঈমানদারদের জন্য আনন্দের সংবাদ ছিল, অপরদিকে কাফেরদের জন্য সেটা ছিল একটি পরীক্ষা। মক্কার কাফেররা কোনভাবেই একথা বিশ্বাস করতে চাইনি যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যি মিরাজ করে এসেছেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, মিরাজের ঘটনা তাদেরকে ইসলামের ব্যাপারে আরো সন্দীহান ও বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ করতে সহায়তা করেছে। দিনে দিনে তার আরও দ্বীন থেকে সরে গিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাদের এমন আচরণের জন্য তীব্র সমালোচনা করেছেন। এভাবেই মিরাজের কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃত্বে দাওয়াতি মিশন আরও শক্তিশালী হয়েছে।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِىٓ أَرَيْنَـٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلْقُرْءَانِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَـٰنًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

অর্থ: স্মরণ করো হে নবী, আমি তোমাকে বলেছিলাম, নিশ্চয়ই তোমার রব এসব অবাধ্য পাপীদেরকে চারদিক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। আর তোমাকে মেরাজে যেসব দৃশ্য দেখিয়েছি, তা ওদেরকে বড়ই পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে। ওদের জন্যে তো কুরআনে উল্লেখিত জাহান্নামের অভিশপ্ত সেই যাক্কুম গাছটি অপেক্ষা করছে। আমি ওদেরকে বারবার আমার আযাবের ভয় দেখিয়েছি; অথচ ওরা ক্রমাগত ঘোরতর বিদ্রোহে ডুবে রয়েছে। [১৮৬]

কুরআনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না থাকলেও, সংক্ষেপে কিছু চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মিরাজের রাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল আমীন কে আসল আকৃতিতে দেখেছেন। অন্যদিকে আল্লাহ তার নবীকে সাত আসমানের উপরে তুলে নিয়েছিলেন। সেখানে সিদরাতুল মুনতাহায় নবীজি গিয়েছেন, যার পাশেই ছিল জান্নাতুল মাওয়া।

[১৮৫] আল কুরআন, ১৭:১
[১৮৬] আল কুরআন, ১৭:৬০

নবীজি এ সময় সবকিছু খুব ভালোভাবেই অবলোকন করেছেন। নবীজির দুচোখ বিভ্রান্ত হয়নি। কিংবা প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়ে অন্য কোথাও তার চোখ ঘুরে বেড়ায় নাই। বস্তুত এই সফরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির অসংখ্য রহস্য অবলোকন করেছেন। এভাবেই তিনি নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করেছেন।

وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾

অর্থ: সে তো এ ফেরেশতাকে আরো একবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলো। বস্তুজগতের শেষ প্রান্তে বরই গাছের কাছে। যার পাশেই জান্নাতুল মাওয়া অবস্থিত রয়েছে। সে সময় বরই গাছটি এক বর্ণনাতীত সৌন্দর্যে সজ্জিত হয়েছিলো। না, সে সময় নবীর দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেনি; কিংবা তার দৃষ্টি আসল জিনিস ছেড়ে অন্যদিকেও ঘুরে বেড়ায়নি।[১৮৭]

৩.৩.৩. তায়েফে নবীর দাওয়াতি কাজ

মক্কার শেষ দিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ গমন করেন দাওয়াতের উদ্দেশ্যে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বুঝলেন যে, মক্কার লোকেরা তার প্রতি আর ঈমান আনছে না, তখন তিনি নতুন জায়গার সন্ধানে বের হলেন এবং সে ধারাবাহিকতায় তিনি সবার আগে তায়েফকে পছন্দ করলেন। যেহেতু তায়েফ ছিলো আরবের একটি শক্তিশালী জনপদ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পালক পুত্র হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে পায়ে হেটে তায়েফে গমন করলেন। প্রায় ১ মাস সময়ের দীর্ঘ ছিলো এই সফর।[১৮৮] সেখানে বিভিন্ন গোত্রপতির কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা কেউই নবীজির দাওয়াতে সাড়া দিলো না। বরং তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলো। এমনকি তাকে তায়েফ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে তার পিছনে লোকদের লেলিয়ে দিলো। সেদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তাক্ত হয়েছিলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে ফেরার পথে যখন যাত্রা বিরতি করেন, তখন একদল জ্বিন নবীজির কণ্ঠে কুরআন পাঠ শুনতে পায়। এবং তারা ঈমান আনে। কুরআনে সে কথা এভাবে বলা হয়েছে যে,

---

[১৮৭] আল কুরআন, ৫৩:১৩-১৭

[১৮৮] নঈম সিদ্দিকী, *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

অর্থ: হে নবী, সেই ঘটনা লোকদের শুনাও, যখন একদল জিনকে আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করলাম, যাতে তারা কুরআন শুনতে পায়। যখন তারা তোমার তিলাওয়াত শুনে কাছে এলো, তখন পরস্পরকে বললো, চুপ করো, মনযোগ দিয়ে শোনো। এভাবেই কুরআন শুনে তারা নিজ জাতির কাছে সতর্ককারী হিসাবে ফিরে গেলো। [১৮৯]

৩.৩.৪. মদিনায় ইসলাম ও বাইয়াতে আকাবা

মক্কার শেষের দিকে যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন যে, আর তেমন কেউ নতুন করে ঈমান আনার নেই, তখন তিনি নতুন এলাকা খুঁজতে লাগলেন। প্রথমে তিনি যদিও তায়েফ গেলেন, কিন্তু সেখান থেকেও খালি ফিরতে হলো। এমন সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্যে মদিনার দরজা খুলে দিলেন। সেখানের একদল মানুষের অন্তরে দ্বীনের আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

মদিনার আওস ও খাজরাজ গোত্রের একটি দল প্রথমে নবীজির কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা নবীজির সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়। তাদের সংখ্যা ছিলো **১২** জন।[১৯০] পরে তাদের হাত ধরে আরো বড় একটি দল ঈমান গ্রহণ করেন, যে দলে ৭৩ জন ছিলেন।[১৯১] এ সময় তারা নবীজির হাতে বায়াতবদ্ধ হন। এ বায়াত ছিলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদিনা স্থানান্তরের নিরাপত্তা গ্যারান্টি। কুরআনে মদিনার সাহাবীদেরকে বলা হয়েছে আনসার। এ সকল আনসারদের জন্যে কুরআন খুবই মর্যাদাপূর্ণ কথা বলেছে।

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

অর্থ: একইভাবে এ সম্পদে মদিনার আনসারদেরও অংশ রয়েছে, যারা মুহাজিরদের মন দিয়ে ভালোবাসে এবং তাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তার জন্যে ঈর্ষান্বিত হয় না। এমনকি

[১৮৯] আল কুরআন, ৪৬:২৯

[১৯০] আবু সলীম মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

[১৯১] ইবনে ইসহাক, *সীরাতে রাসুলুল্লাহ*, (ঢাকা: ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৩৭৭ বাং.), পৃ. ৪০০

নিজেদের অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও তারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। আসলে যাদের অন্তর সংকীর্ণতামুক্ত, কেবল তারাই সফলতা লাভ করে। [১৯২]

৩.৩.৫. হিজরতের নির্দেশনা

হিজরত ইসলামের ইতিহাসে এক মাইল ফলক অধ্যায়। নবী জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছে এই হিজরত থেকে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে নতুনত্ব যোগ হয়েছে হিজরতের পর থেকে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা অন্যান্য নবীদের মাতোই আমাদের নবীকেও নিজ বসতবাড়ি ছেড়ে অচেনা-অজানা এক নতুন এলাকায় স্থায়ীভাবে চলে আসতে হয়েছে। আপন সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে এই নতুন অধ্যায় রচনায় ছিলো তাঁর নেতৃত্বের এক কঠিন পরীক্ষা।

আকাবার বড় বায়াতের পরে যখন একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, মদিনা হচ্ছে মুসলমানদের জন্যে নিরাপদ আশ্রয় এবং সহায়। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে ধীরে ধীরে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। ফলে অসংখ্য সাহাবী আস্তে আস্তে মদিনায় হিজরত করলো। নিজেদের আপন ঘর বাড়ি ছেড়ে মহান মাবুদের সন্তুষ্টি লাভের আশায় মদিনার বুকে তারা পাড়ি জমালেন। কুরআন তাদের সেই হিজরতের ফজিলত এভাবে বর্ণনা করছে যে,

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

অর্থ: যারা আল্লাহর পথে থাকায় নির্যাতনের শিকার হয়ে নিজ বাড়ি-ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে এ দুনিয়ায় আরো ভালোভাবে থাকা-পড়ার ব্যাবস্থা করে দেবো। আর পরকালে তো তাদের জন্যে অনেক বড় পুরস্কার থাকছেই। হায়! যালেমেরা যদি এ কথা জানতে পারতো। [১৯৩]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার বন্ধু হযরত আবু বকর রদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ে একসাথে মদিনার পথে রওনা হয়েছিলেন।[১৯৪] তাদের সেই যাত্রাপথ ছিলো খুবই ভয়ংকর। তাদের গ্রেফতারের জন্যে মক্কার কাফের নেতারা নানা চেষ্টা তদবির করেছিলো। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তারা সফল হয়নি। কুরআনে সে সময়ের ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে। নবীজির সাহসিকতা ও আল্লাহর উপর ভরসার বয়ান রয়েছে কুরআনের পাতায়। একজন যোগ্য নেতা যেভাবে সহসিকতার সাথে আপন

[১৯২] আল কুরআন, ৫৯:৯

[১৯৩] আল কুরআন, ১৬:৪১

[১৯৪] ইকবাল কবির মোহন, *ছোটদের মহানবী*, (ঢাকা: শিশুকানন, ২০১১), পৃ. ৪০

সঙ্গী-সাথীদের অভয় দেয়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেভাবেই তার সাহাবীকে শক্তি যুগিয়েছেন। কুরআন সে কথা বলছে এভাবে,

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

অর্থ: শোনো! তোমরা যদি নবীর সাহায্যে এগিয়ে না আসো তবে পরোয়া নেই। আল্লাহ এর আগেও তাঁর নবীকে সাহায্য করেছেন। মনে করে দেখো, যখন মক্কার কাফেরেরা তাকে বাড়ি-ঘর ছাড়া করে হত্যা করার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, তখন সে তার এক বন্ধুকে নিয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলো। এক পর্যায়ে তার বন্ধু শত্রুদের দেখে ভয় পেয়ে গেলো। তখন নবী তাকে বললো, ভয় পেও না। আমাদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন। এরপর আল্লাহ তাদেরকে মানসিক প্রশান্তি দান করলেন এবং এমন সেনাদল পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। এভাবেই আল্লাহ কাফেরদের সব হুমকি-ধামকি মাটির সাথে মিশিয়ে দেন এবং নিজের বাণীকে সুউচ্চ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বস্তুত আল্লাহ যথার্থ পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়। [১৯৫]

মক্কায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র হয়েছে। নানা ভাবে তাকে আঘাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কাফেরেরা কখনো তাকে কারাবন্দী করতে চেয়েছে, আবার কখনো তাকে হত্যা করে ফেলতে চেয়েছে। আবার কখনো দেশছাড়া করতে চেয়েছে। তবে এর কোনোটাই করতে তারা সক্ষম হয়নি। মহান আল্লাহ ওদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বকে শক্তিশালী করেছেন। পথ প্রদর্শন করেছেন। কুরআন সে কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে এভাবে,

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾

অর্থ: হে নবী, সেই মুহূর্তগুলো স্মরণ করে দেখো, যখন কাফেরেরা খোদ্ তোমার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র আঁটছিলো। ওরা একবার বলে তোমাকে কারাবন্দী করবে, আবার বলে হত্যা করবে, আরেকবার বলে তোমাকে দেশছাড়া করবে। আসলে ওরা তোমার বিরুদ্ধে নানা ধরনের কূট-

[১৯৫] আল কুরআন, ৯:৪০

কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিলো। অন্যদিকে আল্লাহ নিজেই ওদের বিরুদ্ধে কৌশল প্রয়োগ করছিলেন। আর এটাতো পরিষ্কার যে, আল্লাহই সবচেয়ে ভালো কৌশল অবলম্বনকারী। [১৯৬]

বস্তুত ইসলাম তার অনুসারীদেরকে কোনো জালেম জনপদে আটকে থাকতে উৎসাহিত করে না। আল্লাহ তার বান্দাদের যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তা কেউ আটকে দিক, তিনি এমনটা পছন্দ করেন না। এ জন্যে মুসলমানদের জিহাদ করতে বলা হয়েছে, যাতে আটকে পড়া অন্যান্য মাজলুম মুসলমানেরা হিজরত করে আসতে পারে। ইসলামি নেতৃত্বে এর গুরুত্ব অপরিসীম। হিজরত দ্বীন পালন ও প্রতিষ্ঠার এক দারুন পদক্ষেপ। আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই এই হিজরতের সকল রোড ম্যাপ তৈরি হয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পুরো কাজের নেতৃত্ব মহান আল্লাহর দেওয়া পরিকল্পনার ছক অনুযায়ী সম্পন্ন করেছেন। এমনকি এ কথাও বলা যায় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুদিন আগেও তায়েফে গিয়েছিলেন নতুন আবাস গড়ার জন্যে; অথচ আল্লাহ তাঁর জন্যে মদিনাকে নির্বাচিত করে দিলেন। মদিনার এই আগমন ছিলো স্বয়ং মদিনাবাসীদের পক্ষ থেকে। সেখানে এর আগে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত নিয়ে কোনো সাহাবীও যায়নি।

কুরআন আটকে পড়া অসহায় সাহাবীদের হিজরতের ব্যাপারে নির্দেশনা দিচ্ছে এভাবে,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

অর্থ: হে মুসলমানেরা, তোমাদের কি হলো, তোমরা কি আল্লাহর পথে এসব অসহায় মযলুম নারী-পুরুষ ও শিশুদের মুক্তির জন্যে লড়বে না? অথচ তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের রব, এসব জালেমদের জুলুমের এলাকা থেকে আমাদের উদ্ধার করো। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে অভিভাবক পাঠাও, আমাদের জন্যে সাহায্যকারী পাঠাও। [১৯৭]

[১৯৬] আল কুরআন, ৮:৩০

[১৯৭] আল কুরআন, ৪:৭৫

অধ্যায়ঃ ৪

মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সা এর মাদানী জীবনের উজ্জ্বল নেতৃত্বে আল কুরআনের ধারাবাহিক সহায়তা ও নির্দেশনার পর্যালোচনা।

৪.১. মদিনার শুরুর দিনগুলোতে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব

৪.১.১. মদিনাবাসীর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি

মদিনা, আরবের একটি মরুদ্যান এর নাম, যার দুই পাশে দুই পাহাড়। উত্তরে ওহুদ এবং দক্ষিণে আইর।[১৯৮] নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে এই মদিনায় এলেন। ইতিমধ্যে তাঁর অনেক সাহাবীগনও হিজরত করে মদিনায় এসেছেন। মক্কা থেকে যে সকল সাহাবীগন মদিনায় এসেছেন, তাদের বলা হলো মুহাজির। আর মদিনার যে সকল সাহাবীগন তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাদের বলা হলো আনসার। এভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের দুভাগে ভাগ করে নেওয়া হলো। এই ভাগটি ছিলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফল নেতৃত্বের একটি দিক। এভাবে তিনি প্রত্যেক সাহাবীকে তাদের স্ব স্ব সম্মান ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিতে পেরেছেন।

মদিনায় এসে নবীজির সামনে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো, মুহাজির সাহাবীদের পুনর্বাসন করা। মুহাজিরদের কেউ কেউ পরিবার-পরিজনসহ এসেছেন, আবার কেউ হয়তো একাই হিজরত করে চলে এসেছেন। এ সকল সাহাবীদের থাকা, খাওয়া, আয়-রোজগার করা– এ সবের ব্যবস্থা করা ছিলো নবীজির জন্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আল্লাহর নির্দেশনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সমস্যাটি খুব সহজেই সমাধান করে ফেললেন। তিনি একজন আনসার সাহাবীর সাথে একজন মুহাজির সাহাবীকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন এবং ঐ আনসার সাহাবীকে দায়িত্ব দিলেন মুহাজির সাহাবীকে ভাইয়ের মতো রাখতে। এমনকি খোদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও একজন আনসার সাহাবীর সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ হলেন।

এভাবে সকল মুহাজির সাহাবীগন থাকার ব্যবস্থা পেলেন। কেউ কেউ খেত-খামারে কাজের সুযোগ পেলেন। ব্যবসায়ী সাহাবীগন ব্যবসা করা আরম্ভ করলেন। কেউ বা শ্রমজীবী হয়ে উঠলেন। এককথায় সকল মুহাজির সাহাবীগনই তাদের নিজেদের মতো করে মদিনায় আবাসন গড়ে নিলেন। অনেক মুহাজির সাহাবীদের বিয়ের ব্যবস্থাও আনসার সাহাবীগন করে দিলেন। এভাবেই নবীজির সকল সাথীরা ভাই ভাই হয়ে এক সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চারপাশে দাঁড়িয়ে গেলো সময়ের কয়েকদিনের ব্যবধানে।

---

[১৯৮] ড. হিশাম আল আওয়াদি, *বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মদ*, (ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ২০১৭), পৃ. ১১৮

কুরআনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই ভ্রাতৃত্বের ধারণা দিয়েছে। কুরআনে স্পষ্টাক্ষরে লেখা হয়েছে যে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

অর্থ: আসলে ঈমানদারেরা তো পরস্পরে ভাই-ভাই। কাজেই কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত হলে তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক পুনরায় জোড়া লাগিয়ে দাও। সাবধান! এ ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমানি করা থেকে বেঁচে থাকো। এভাবেই তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করবে।[১৯৯]

আনসার সাহাবীদের ব্যাপারে কুরআনে অসংখ্য গুনবাচক ও প্রশংসা সূচক বয়ান রয়েছে। আনসার সাহাবীদের তাকওয়া, ত্যাগ-কুরবানি এবং দ্বীনের পথে তাদের সংগ্রামের কথা কুরআন ও হাদিসে বারবার উল্লেখিত হয়েছে। এভাবে তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ায় তারা আরো বেশি উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং দ্বীনের পথে বড় বড় অবদান রাখতে পেরেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বের এটি একটি চমৎকার গুণ ছিলো যে, তিনি তাঁর সাহাবীদের গুণ ও অবদানের সামাজিক স্বীকৃতি দিতেন। তাদেরকে পুরস্কৃত করতেন। এমনকি তাদেরকে নানা উপধিতে ভুষিত করতেন, যে উপধিতে ঐ সকল সাহাবীগন পরবর্তীতে পরিচিতি লাভ করতেন এবং সম্মানিত বোধ করতেন।

আনসার সাহাবীদের ঈমান ও তাকওয়ার প্রমাণে কুরআনে আয়াত রয়েছে। মুনাফিকদের আয়োজিত মসজিদে জেরার[২০০]-এ নামাজ পড়ার চেয়ে আনসার সাহাবীদের প্রতিষ্ঠিত মসজিদে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিটি কাজ ও কর্মসূচী স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্দেশিত ছিলো। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব অনেকটা কুরআনের নির্দেশনার উপরই ছিলো নির্ভরশীল।

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

অর্থ: অতএব হে নবী, তুমি কখনোই এ ধরনের মসজিদে নামাজে দাঁড়াবে না। প্রথম থেকেই যে মসজিদ তাকওয়ার ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটাই তোমার দাঁড়ানোর উপযুক্ত জায়গা। কেননা সেখানেই কেবল পবিত্র চিত্তের মানুষের সাক্ষাত পাবে। আর আল্লাহ এ ধরনের পবিত্র-পরিশুদ্ধ লোকদের বড়ই ভালোবাসেন। [২০১]

আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কুরআনে আরো বলা হচ্ছে,

---

[১৯৯] আল কুরআন, ৪৯:১০

[২০০] মুহাম্মদ জালালুদ্দিন, *শানে নুযুল*, (ঢাকা: মাহমুদিয়া লাইব্রেরী, ২০১২), পৃ.২৩৬

[২০১] আল কুরআন, ৯:১০৮

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

অর্থ: শোনো! যেসব মুহাজির এবং আনসারেরা প্রথমদিকের দুর্দিনে ঈমানের পথে দাঁড়িয়েছিলো এবং পরবর্তী সুদিনগুলোতেও যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সবার উপরেই সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহকে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্যে জান্নাত সাজিয়ে রেখেছেন, যার পাদদেশে রয়েছে প্রবাহমান জলধারা। চিরকালের জন্যেই তারা সে সুখ উপভোগ করবে। আর এটাকেই বলে মহাসাফল্য। [২০২]

কুরআন সকল ঈমানদারদের নবীর দলভুক্ত করে দিয়েছে। যারা ঈমান এনেছে এবং এর কারণে বসত ভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে; অথচ এরপরেও আল্লাহর দ্বীনের জন্যে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে গেছে- তারা সকলেই আল্লাহর দৃষ্টিতে নবীর দলভুক্ত। অনেকটা পরিবারের মতো। কুরআনের এই নির্দেশনার ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সাহাবীদের দলটি বাস্তবিকই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কেননা তখন সকল সাহাবীই নিজেদেরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যদাবান অনুভব করতে পারেন।

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

অর্থ: আর যারা যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ঈমান এনেছে ও হিজরত করে তোমাদের কাছে এসেছে এবং তোমাদের সাথে মিলে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে– তারাও তোমাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। তবে আল্লাহর বিধান অনুসারে অধিকারের ব্যাপারে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়রা তাদের চেয়ে বেশি এগিয়ে। সন্দেহ নেই, আল্লাহ তোমাদের সব বিষয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন। [২০৩]

কুরআনে বিভিন্নভাবে আনসার ও মুহাজির সাহাবীদেরকে নানাভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পরিষ্কার করা হয়েছে। কখনো কখনো তাদেরকে একসাথে একই আহ্বানে উল্লেখ করেছে, আবার কখনো তাদের উভয়ের নাম আলাদা আলাদা ভাবে উল্লেখ করেছে। বস্তুত আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের আভ্যান্তরিন মিল মহব্বত কুরআনের পাতায় মজবুতভাবে ফুটে উঠেছে, যা নবীজির নেতৃত্বের সফলতার এক শক্তিশালী দলিল। এ কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য যে, যদি আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের গভীর সম্পর্ক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরি করতে না

[২০২] আল কুরআন, ৯:১০০

[২০৩] আল কুরআন, ৮:৭৫

পারতেন, তবে ইসলামের বিজয় এত সহজে কখনোই সম্ভব হতো না। এমনকি দ্বীন ইসলামের এই চমৎকার শিক্ষা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েও পড়তো না। কাজেই কুরআনের নির্দেশনার আলোকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের যে চর্চা অব্যাহত রেখেছেন, তাই তাকে সফল নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সরাসরি সাহায্য করেছে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

অর্থ: শুনে রেখো, যারা ঈমান এনেছে, এর জন্যে নিজেদের ঘর-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে এবং আল্লাহর পথে লড়াই-সংগ্রাম করেছে, আর যারা এসব লোকদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে– তারা উভয়েই নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে শতভাগ খাঁটি বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমার ঘোষণা এবং সম্মানজন জীবিকার ব্যবস্থা। [২০৪]

৪.১.২. মদিনা সনদ প্রণয়ণ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আসলেন, তখন সেখানে আওস, খাজরাজ এর পাশাপাশি তিনটি বড় বড় ইহুদি গোত্র বাস করতো। বনি কুরাইজা, বনি নাজির এবং বনি কাইনুকা। তাছাড়া আরো ছোট ছোট কয়েকটা গোত্র ও লোকজন মদিনায় বসবাস করতো। নতুনকরে এদের সাথে মুহাজির মুসলমানগন যুক্ত হয়েছেন। ফলে মদিনা এমন একটি শহর হয়েছে যেখানে নানা আকিদা-বিশ্বাসের লোকজন জড়ো হয়েছে।

এমন একটি জনপদে শৃংখলা বজায় রাখতে প্রয়োজন ছিলো একটি শক্তিশালী বিশ্বাস ও আস্থাযোগ্য শাসন ব্যবস্থা, যেখানে প্রত্যেক মতাদর্শের লোকেরা নিজ নিজ চিন্তা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন চালাতে পারবে। সকলের মাঝে শান্তি ও সহযোগিতাপূর্ণ অবস্থান তৈরির জন্যে ঐক্যমতের সরকার প্রতিষ্ঠা ছিলো ঐ সময় ও পরিস্থিতির দাবী।

ইতিহাস স্বীকৃত যে, বহু কাল ধরে মদিনার আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে দা-কুমড়া'র সম্পর্ক অব্যাহত ছিলো। কেউ কাউকে মানতো না। অপরদিকে ইহুদি গোত্রগুলো ছিলো অন্তকোন্দল ও দুর্নীতিগ্রস্থ একটি গোষ্ঠী। ফলে এখানে এমন এক নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিলো, যে সকলকে নিয়ে কাজ করতে পারবে। যার প্রতি সকল গোত্র ও লোকজন আস্থাশীল হবে। আর সেই প্রয়োজন পূরণ করতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমন ঘটে মদিনায়।

[২০৪] আল কুরআন, ৮:৭৩

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে মদিনায় সকল গোত্র ও লোকদের নিয়ে একটি লিখিত চুক্তিনামা [২০৫] করলেন, যেটাকে মদিনার সংবিধান বা গঠনতন্ত্রও বলা যায়। মানব ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম লিখিত কোনো নগর সংবিধান বলে গন্য হচ্ছে।

এই সংবিধানের মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন। বিচারিক ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসুলের হাতে আসলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ও অধিকার ভাগ করলেও, সম্পূর্ণ মদিনার রাষ্ট্রীয় ফয়সালার দায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে রাখা হয়। এভাবে তিনি একটি আদর্শ নগর পত্তন করলেন।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, কুরআনের বলে দেওয়া প্রতিটি নির্দেশই নবীজি মদিনায় বাস্তবায়ন করলেন। প্রতিটি মামলা ও সিদ্ধান্ত তিনি কুরআনের বয়ানের আলোকে নিলেন। ফলে তিনি সত্য ও সঠিক ফয়সালার উপরে টিকে রইলেন। কুরআন অসংখ্যবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিচার ফয়সালার মূলনীতি শিখিয়েছে। কুরআন বলছে,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

> অর্থ: মুসলমানেরা, সাবধান থেকো! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন, সব ধরনের আমানত তার যথাযথ পাওনাদারের কাছে পৌঁছে দেবে। আর যখন লোকদের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে, তখন অবশ্যই ন্যায় বিচার করবে। আল্লাহ সবসময় তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দিয়ে থাকেন। নিশ্চই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। [২০৬]

এই নগর রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অন্যান্য মুমিনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কুরআন পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, তারা রাষ্ট্রের কর্তা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা শোনা মাত্রই আনুগত্য করবে। আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কথাই সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ। এরপরে আর কারো কোনো কথা চলবে না। এই বিশেষ ও সর্বময় ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসীম নেতৃত্বে আসীন হলেন। বলা যায় যে, কুরআনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই মহান নেতৃত্ব উপহার দিলো। এতো সর্বময় ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো শাসকের জন্যে বৈধ ছিলো না।

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

---

[২০৫] তারিক রমাদান, *রাসূলুল্লাহ এর পদাঙ্ক অনুসরণ*, (ঢাকা: মাকতাবাতুল ফুরকান, ২০১৬), পৃ.১২৯

[২০৬] আল কুরআন, ৪:৫৮

অর্থ: অথচ ঈমানদারদেরকে যখন তাদের মধ্যকার বিবাদমান কোনো বিষয়ের ফয়সালা করে দেওয়ার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা সব সময় বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। সত্য হলো, এরাই সফলকাম। ৫২. কেননা যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে চলে, আল্লাহর ব্যাপারে সর্বদা ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী করা থেকে বিরত থাকে, কেবল তারাই সফল হতে পারে। [২০৭]

বিচারিক আদালতেও কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করেছে। ফলে তাঁর নেতৃত্ব সকলে মেনে নিতে অনেকটা বাধ্য হয়েছে। কুরআন বলছে,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

অর্থ: মনে রেখো, আল্লাহ ও তাঁর রসুল কোনো ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা শুনিয়ে দিলে, সে ব্যপারে কোনো ঈমানদার পুরুষ কিংবা নারীর ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার নেই। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের হুকুম অমান্য করে, তবে সে নিশ্চিত পথভ্রষ্ট।[২০৮]

৪.১.৩. গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ অবসান

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসলেন, তখন সেখানে আওস ও খাজরাজ বংশের মধ্যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ বিরাজ করছিলো। বছরের পর বছর ধরে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেছে। ফলে পুরো মদিনাতেই এক ধরনের অরাজগতা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা এসে সর্বপ্রথম এই দুই গোত্রের মধ্যকার বিরোধ মিটমাট করলেন। নবীজির দাওয়াতে উভয় গোত্রের লোকেরা সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হল। এভাবে বছরের পর বছর চলতে থাকা একটি বিরোধপূর্ণ পরিবেশকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নেতৃত্বের মাধ্যমে শান্তির পরিবেশ পরিণত করলেন।

আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বড়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও কঠিন শত্রুতা ছিলো। অতঃপর এই দুই গোত্র ইসলামে দাখিল হলে আল্লাহর অনুগ্রহে তারা পূর্বের সব কিছু ভুলে গিয়ে এক হয়ে যায়। হিংসা বিদ্বেষ বিদায় নেয় এবং তারা পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যায়।[২০৯] এভাবে দুই গোত্রসহ পুরো মদিনাবাসীকে একত্রিত করার জন্য মহান আল্লাহ কুরআনুল কারিমে অসংখ্য নির্দেশনা নাযিল করেছেন। ঈমানদার

[২০৭] আল কুরআন, ২৪:৫১

[২০৮] আল কুরআন, ৩৩:৩৬

[২০৯] ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৪-৭, পৃ. ১৩২

সাহাবীদের মধ্যে আন্তরিক মিল মহব্বত তিনি তৈরি করেছেন, অন্যথায় এই বিরোধের কোন সমাধান তৈরি হতো না। সেই বিরোধের কথা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

অর্থ: আর তোমরা সবাই মিলে মজবুতভাবে আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরো। দ্বীনের ব্যাপারে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করে দেখো, তোমরা ছিলে একে অপরের চরম শত্রু। এরপর তিনিই তোমাদের মধ্যে আন্তরিক মিল-মহব্বত তৈরি করে দিলেন, ফলে তোমরা আল্লাহর মেহেরবানিতে ভাই-ভাই হয়ে গেলে। অথচ তোমরা এর আগে ভয়ানক অগ্নিকুণ্ডের কিনারে দাঁড়িয়েছিলে। আল্লাহই তোমাদের বুঝার জন্যে তাঁর নিদর্শনাবলী খুলে খুলে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সত্য-সঠিক পথে চলতে পারো। [২১০]

কুরআন শুধুমাত্র পূর্ববর্তী বিরোধের মীমাংসা করেই শান্ত হয়নি ; বরং ভবিষ্যতে যদি আবার কোন বিরোধ কিংবা কোন সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধান বলে দিয়েছে। ঈমানদার সাহাবীদেরকে এই কথা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মমিনেরা পরস্পর ভাই ভাই। তাদের মধ্যে কখনোই কোন ধরনের ঝগড়া-বিবাদ হওয়া উচিত নয়। তার পরেও যদি কখনো কোন সমস্যা দেখা দেয়, তবে অন্যরা সবাই মিলে সেই সমস্যার মীমাংসা করে দিবে। এভাবে যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঝগড়া-বিবাদে সকল রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো।

একথা সবাই স্বীকার করে যে, কোন একটি দলের সদস্যদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ মনোমালিন্য ও কোন্দোল থাকলে, সে কখনোই সফলতা পায় না। যেহেতু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বব্যাপী একটি দাওয়াত নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করেছেন, তাই তাঁর এমন একদল সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল, যারা নিজেদের মধ্যে সীসা ঢালা প্রাচীরের মত মজবুত ও শক্তিশালী বাহিনী হবে।

মহান আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা দিলেন, যাতে তার সাথীরা ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বীনের পথে অটল ও অবিচল থেকেছেন। বলাবাহুল্য, একমাত্র কুরআনের সাহায্যেই এই বন্ধন ও মজবুত ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। কাজেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তার পিছনে সিংহভাগ অবদান স্বয়ং আল্লাহ তাআলার।

[২১০] আল কুরআন, ৩:১০৩

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

অর্থ: আর ঈমানদারদের দুটি দল কখনো নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়লে, তোমরা তাদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করে দাও। কিন্তু এরপরেও যদি তাদের একদল অন্যদলের উপর বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করে, তবে এসব সীমালংঘনকারীরা আল্লাহর নির্দেশের কাছে মথানত না করা পর্যন্ত তোমরা সম্মিলিতভাবে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। হ্যাঁ, অতঃপর তারা আল্লাহর পথে ফিরে এলে তাদের উভয় দলের মধ্যে ন্যায়-ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দাও। মনে রেখো, আল্লাহ কেবল সুবিচারকারীদেরই ভালোবাসেন। [২১১]

৪.১.৪. সকলের মিলনগৃহ হিসেবে মসজিদ নির্মাণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করার পর, জরুরী ভিত্তিতে তাঁর একটি সভা কেন্দ্রের প্রয়োজন দেখা দিল। যেখানে তিনি তার দাপ্তরিক কাজ গুলো সম্পন্ন করতে পারবেন। তার সঙ্গী সাথীদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন। যেখানে বসে তিনি সম্পূর্ণ মদিনার রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়গুলোও তদারকি করতে পারবেন। সর্বোপরি যেখানে মদিনার সকল ঈমানদার লোকেরা নিয়মিত জমায়েত হবে এবং তারা মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশে নিয়মিত নামাজ আদায় করবে।

এই প্রয়োজনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করে সর্বপ্রথম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন কুবায়। মদিনা শহর থেকে ৩ মাইল দূরে এটি অবস্থিত।[২১২] এরপর মদিনা শহরে প্রধান কার্যালয় হিসেবে নতুন মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগে মদিনার আনসার সাহাবীগন আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসে। তারা মসজিদ এর জন্য জমি দান করেন এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে নবীজির পাশে দাঁড়ান। পাশাপাশি মুহাজির সাহাবীগন কায়িক পরিশ্রম দিয়ে এই মসজিদ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেন। এভাবে আনসার এবং মুহাজির সাহাবীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় খুব অল্প সময়ে মসজিদ তৈরি হয়। ইতিহাসে মসজিদটি মসজিদে নববী নামে পরিচিত।

---

[২১১] আল কুরআন, ৪৯:৯

[২১২] সাইয়েদ অবুল হাসান আলী নদভী, *সীরাতে রাসুলে আকরাম সা.* (ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০১২), পৃ. ৮৭

পবিত্র কুরআনে একটি মসজিদ কারা পরিচালনা করবে এবং মসজিদে কোন কোন কর্মসূচি পালন করা হবে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

অর্থ: অতএব জেনে রেখো, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের জীবনে ঈমন রাখে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে চলে না–কেবল তারাই হবে আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাদের ব্যাপারে আশা করা যায় যে, তারা সঠিকভাবে চলবে ও চালাবে। [২১৩]

এমনকি যে সকল মসজিদ তাকওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, কেবল সে সকল মসজিদে ঈমানদারদের নামাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যে মসজিদ গুলো হিংসা বিদ্বেষ ও মুনাফিকের দপ্তর হিসাবে তৈরি করা হয়, সেখানে কোনো ঈমানদার ব্যক্তি অংশ নিতে পারে না। কুরআনের এই নির্দেশনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব অধিকতর শক্তিশালী ও মজবুত হয়েছে। মুনাফিকরা নবীজির দাওয়াতের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করছিলো, তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এসবের পিছনে কুরআনের সরাসরি ভূমিকা দৃশ্যমান।

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾

অর্থ: অতএব হে নবী, তুমি কখনোই এ ধরনের মসজিদে নামাজে দাঁড়াবে না। প্রথম থেকেই যে মসজিদ তাকওয়ার ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেটাই তোমার দাঁড়ানোর উপযুক্ত জায়গা। কেননা সেখানেই কেবল পবিত্র চিত্তের মানুষের সাক্ষাত পাবে। আর আল্লাহ এ ধরনের পবিত্র-পরিশুদ্ধ লোকদের বড়ই ভালোবাসেন। [২১৪]

[২১৩] আল কুরআন, ৯:১৮

[২১৪] আল কুরআন, ৯:১০৮

৪.১.৫. মুসলমানদেরকে জিহাদের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ ১৩ বছর মক্কায় দাওয়াতি কাজ করার পর, যখন মক্কার কাফেরদের নির্যাতনে মদিনায় হিজরত করে এলেন এবং মদিনায় সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে আক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা প্রকাশ পেল। বিশেষ করে মক্কাবাসী কাফের নেতৃবৃন্দ তাদের ব্যবসায়িক ক্ষতির আশঙ্কা করলেন, যে আশঙ্কা ছিল বাস্তব সম্মত। কেননা তাদের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলো মদিনার পাশ ঘেঁষে যাতায়াত করতো। ফলে তাদের আশঙ্কা হলো যদি মুসলমানেরা মদিনায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তবে তাদের ব্যবসায়িক ওই পথটি বিপদজনক হয়ে উঠবে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করার পর তিনি মুহাজির সাহাবীদের কে নিয়ে ছোট ছোট বাহিনী তৈরি করলেন, যাতে করে মদিনার উপরে যদি কোনো আঘাত আসে, তবে তা প্রতিরোধ করা যাবে। এই সময় কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিল, সকল সাহাবীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার। বছরের পর বছর ধরে মক্কায় যাদেরকে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত-অপমানিত করা হয়েছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে প্রতিশোধ নেওয়ার। শুধু এটুকুই নয়, যথারীতি আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন সকলকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে, যাতে করে আল্লাহর দুশমনদের কঠিন শাস্তি দেওয়া যায়। এভাবেই পৃথিবী থেকে জালেমেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বিশ্বব্যাপী ইসলাম ছড়িয়ে দেওয়ার যে মিশনারি দায়িত্ব নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেছিলেন, তা সম্পন্ন করতে কুরআন সহযোগিতা করল। এই সাহসী নেতৃত্বের পেছনে কুরআনের অবদান সুস্পষ্ট। সময়ে সময়ে নবীজির নেতৃত্বের বিকাশে যেসব উদাহরণ তৈরি হয়েছে, তার পিছনে কুরআনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রয়েছে। কুরআনের বাণী শুনে নবীজির সঙ্গী-সাথীগন নিজেদেরকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেছেন।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

অর্থ: হে নবী, মুমিন-মুসলমানদেরকে সর্বদা যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করো। তাদেরকে বলো, তোমাদের মাত্র বিশজনও সাহসিকাতর সাথে দৃঢ়ভাবে শত্রুর মোকবেলা করলে, যুদ্ধে দুই'শ শত্রুর উপর বিজয়ী হবে। আর যদি এ রকম দৃঢ় সাহসী একশ সৈন্যের দল হয়, তবে তারা সত্য অস্বীকারকারীদের এক হাজার সৈন্যদলের উপর জয়ী হবে। কেননা এ কাফেরদের যুদ্ধে লড়ার যথার্থ চেতনাবোধ নেই। [২১৫]

[২১৫] আল কুরআন, ৮:৬৫

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾

অর্থ: কাজেই হে নবী, আল্লাহর পথে যুদ্ধে নামো। তুমি শুধু তোমার নিজের জন্যেই দায়ী থাকবে। তবে অবশ্যই ঈমানদারদেরকে যুদ্ধে লড়তে উদ্বুদ্ধ করবে। হয়ত আল্লাহ শীঘ্রই কাফেরদের শক্তি খর্ব করে দেবেন। আসলে আল্লাহ প্রবল শক্তির অধিকারী এবং শাস্তিদানে ভয়ানক কঠোর। [২১৬]

৪.১.৬. মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ককরণ

মদিনায় কিছু কপট মুনাফেক লোক ছিল, যারা মুখে মুখে ঈমানের কথা বলতো; কিন্তু অন্তরে কুফরি ধারণ করতো। মদিনার সম্ভ্রান্ত কিছু মানুষ এর পাশাপাশি কিছু বেদুইনও ছিল এই দলে। তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীদের সকল তৎপরতার বিরুদ্ধে নানাভাবে ষড়যন্ত্র করতো। একদিকে তারা মদিনার আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোতে গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করতো, ঈমানদারদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করতো, আল্লাহর দ্বীনের নানা বিষয় হাসি-ঠাট্টার পাত্র বানাতো, অপরদিকে ইসলামের দুশমনদের সাথে গোপনে হাত মিলিয়ে তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদক্ষেপ এর ব্যাপারে কাফেরদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতো।

এ সকল মুনাফিকরা সব সময় ঈমানদারদেরকে বিপদে ফেলার জন্য সচেষ্ট থাকতো। এমন কোন ছোট ছোট সুযোগও হাতছাড়া করতো না, যেখানে ঈমানদারদেরকে সামান্য হলেও কষ্ট দেওয়া যায়। এ সকল মুনাফেকরা দ্বীনের পথে নিজেদের অর্থ ও সম্পদের কোন অংশই স্বেচ্ছায় আনন্দের সাথে প্রদান করতো না। এমনকি এরা যথাযথ আন্তরিকতার সাথে নামাজে শরিক হতো না। এদের অধিকাংশই লোক দেখানো ইবাদত করতো। যখন কোন কঠিন পরিস্থিতি আসত, এরা তখন সরে যেত এবং নিজেদের লোকদের কে নবীজির দল থেকে সরে আসার জন্য প্ররোচনা দিত।

আল্লাহ তাআলা এই সকল মুনাফিকদের বিরুদ্ধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবীদেরকে শক্ত হয়ে লড়াই করতে বললেন। ওদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই পাকড়াও করতে নির্দেশ দিলেন। কুরআনের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ এর কারণে মদিনা থেকে মুনাফিকরা নির্মূল হয়ে গেল। আমরা একথা খুব সহজেই বুঝতে পারছি যে, মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যদি আল্লাহ তাআলা শক্ত হাতে ব্যবস্থা নিতে না বলতেন, তাহলে তারা আরো অনেক দিন মদিনায় ফিতনা-ফাসাদ তৈরি

[২১৬] আল কুরআন, ৪:৮৪

করার সুযোগ পেত। কাজেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল নেতৃত্ব দিয়েছেন, তার পরতে পরতে কুরআনের সরাসরি অবদান রয়েছে।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾

অর্থ: হে মুসলমানেরা, সতর্ক থেকো, তোমাদের আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা বেদুঈন ও খোদ্ মদিনাবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ কৌশলে চরম মুনাফিকি করছে। ওদেরকে তোমরা সহজে ধরতে পারবে না; কিন্তু আমি ওদের প্রতিটি কূটচাল সম্পর্কে সজাগ রয়েছি। আমি অচিরেই ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেবো। তারপর জাহান্নামের কঠিন শাস্তির দিকে ওদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাবো। [২১৭]

কুরআন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের সাথে সাথেই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ জারি করছে। মদিনায় মুনাফিকদের উপরে কঠোর হওয়ার জন্য আসমানী হুকুম জারি করছে। পাশাপাশি মুনাফিকদেরকে এই বলে সতর্ক করছে যে, এ সকল অপরাধের পরিণতি খুবই ভয়ংকর হবে। কুরআনের ভাষায়,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾

অর্থ: হে নবী, এখন থেকে কাফের ও মুনাফিক– উভয়ের মোকাবেলায় পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করো। ওদেরকে আর একচুল ছাড়ও দিও না। শেষ পর্যন্ত ওদের আবাস হবে জাহান্নাম। হায়! সেটা কতই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল। [২১৮]

মুনাফিকরা শুধুমাত্র আল্লাহর রসুলের প্রতি অবিশ্বাসই পোষণ করতো না, তারা মদিনার সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশকেও অমান্য করতো। যখন কোনো বিচারের কাজে তাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের দিকে আসতে বলা হতো, তখন তারা সেখান থেকে সরে যেত। তারা চাইতো নবীজির পরিবর্তে অন্য কেউ তাদের বিচার ফায়সালা করুক। এমনকি এই কাজে তারা মুসলমানদের পরিবর্তে ইহুদিদেরকে পর্যন্ত বিচারক মানতে রাজি হতো। কুরআন তাদের চারিত্রিক দিক গুলো এভাবে বর্ণনা করছে যে,

[২১৭] আল কুরআন, ৯:১০১

[২১৮] আল কুরআন, ৯:৭৩

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾

৬১. হে নবী, মুনাফিকদের আচরণ দেখো, যখন ওদের বলা হয় বিচার ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহর নাযিল করা বিধি-বিধান ও রসুলের কাছে আসো, তখন ওরা তোমাকে চুপিচুপি পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়। [২১৯]

বাস্তবে মুনাফিকরা ভাবতো, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে ফাঁকি দিচ্ছে। এ কারণেই তারা মিছামিছি নামাজ পড়তো। তাদের নামাজে কোনো প্রাণ ছিল না। তারা যখন দ্বীনি কোনো মজলিসে আসতো, তখন কাঠের খুঁটির মত নিষ্প্রাণ হয়ে বসে থাকতো। বস্তুত তাদের ভিতর আল্লাহর স্মরণ একেবারেই ছিল না। একদিকে কুরআন এইসকল মুনাফিকদের চেহারা উন্মোচন করার পাশাপাশি তাদের নৈতিক অধঃপতন ও মানসিক দৈন্যতা কে প্রকাশ করেছে, অপরদিকে ঈমানদারদেরকে এ সকল মুনাফিকদের বিরুদ্ধে শক্ত ভূমিকা নেওয়ার হুকুম জারি করেছে। কুরআনের এই উভয়মুখী নীতির কারণে খুব সহজে মদিনা থেকে মুনাফিকদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

অর্থ: এসব মুনাফিকেরা ভাবে, ওরা আল্লাহকে ধোঁকা দিয়ে চলছে। অথচ সত্য হলো, স্বয়ং আল্লাহই ওদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। ওদের নামাজের অবস্থা দেখো, আন্তরিকতার ছিটে-ফোঁটাও নেই। কেবল লোক দেখানো দায়সারা নামাজে দাঁড়ায়। আসলে ওরা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে। [২২০]

[২১৯] আল কুরআন, ৪:৬১

[২২০] আল কুরআন, ৪:১৪২

৪.২. যুদ্ধ সংগ্রামের দিনগুলোতে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব

৪.২.১. যুদ্ধের অনুমোদন দান

মক্কায় দিনের পর দিন নির্যাতিত হওয়ার পর মুসলমানেরা যখন মদীনায় নিজেদের রাষ্ট্রীয় আবাস গড়লেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের নিজেদের নিরাপত্তা ও অধিকারের জন্য সশস্ত্র প্রতিরোধের অনুমতি প্রদান করলেন। মক্কায় থাকাকালীন কোন ধরনের সশস্ত্র কার্যক্রমের অনুমতি আল্লাহ তাআলা দেন নাই। কিন্তু যখন মুসলমানেরা মদিনায় নিজেদের অবস্থান শক্ত করল, তখন তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল। এভাবে নির্যাতিত মুসলমান তাদের প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেল, এবং একই সাথে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন বিজয় হওয়ার রাস্তা উন্মোচিত হলো।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

> অর্থ: এতোদিন ধরে যারা অন্যায়ভাবে আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হয়েছে, আজ তাদেরকে সেসব যালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো। আল্লাহ অবশ্যই এসব মাজলুমদের সাহায্য করতে পূর্ণ সক্ষম। [২২১]

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র যুদ্ধের অনুমতি দেন নাই; বরং তিনি তাদেরকে যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করাকেও আল্লাহ পছন্দ করেন।[২২২] ইসলামের সবচেয়ে ভালো কাজের তালিকায় জিহাদকে উল্লেখ করা হয়েছে।[২২৩] কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নির্দেশ দিয়েছে যে, তুমি ঈমানদারদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো। কুরআনে আল্লাহর পথে এই যুদ্ধে যারা মারা যাবে তাদের কে শহীদ বলে সম্মানিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত জীবনের মহাপুরস্কার। এভাবেই ঈমানদারদেরকে সৎ সাহসের সাথে সসম্মানে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার পথ কুরআন দেখিয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

---

[২২১] আল কুরআন, ২২:৩৯

[২২২] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস সিজিস্তানী, *আবু দাউদ শরীফ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০), অনুচ্ছেদ ৮, হাদিস নং ২৬৫০, খন্ড: ৪, পৃ. ৯

[২২৩] ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮), অধ্যায় ১১, হাদিস নং ১২৮৬, পৃ. ৫৮৩

অর্থ: হে নবী, মুমিন-মুসলমানদেরকে সর্বদা যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করো। তাদেরকে বলো, তোমাদের মাত্র বিশজনও সাহসিকাতর সাথে দৃঢ়ভাবে শত্রুর মোকবেলা করলে, যুদ্ধে দুই'শ শত্রুর উপর বিজয়ী হবে। আর যদি এ রকম দৃঢ় সাহসী একশ সৈন্যের দল হয়, তবে তারা সত্য অস্বীকারকারীদের এক হাজার সৈন্যদলের উপর জয়ী হবে। কেননা এ কাফেরদের যুদ্ধে লড়ার যথার্থ চেতনাবোধ নেই। [২২৪]

৪.২.২. বদরের রনাঙ্গণে নবীজির নেতৃত্ব

বদর, মদিনা থেকে ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি কুপের নাম।[২২৫] ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার নাম বদরের যুদ্ধ। বদর এর আগে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট ছোট কিছু অভিযান পরিচালনা করেছেন। বদরের যুদ্ধ ছিল প্রথম সামরিক বৃহৎ এক অভিযান। ইসলামের ইতিহাসে হিজরী ২য় সালে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কার কুরাইশ কাফেরদের সাথে মুসলমানদের এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ও রসদ সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। কাফেরদের বিরুদ্ধে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য ও রসদ নিয়ে[২২৬] মুসলমানেরা যে বিজয় লাভ করেছিলেন, তা ছিলো একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার অপার করুণা ও সহযোগিতার ফল। এই যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন। এই সাহায্যের ধরন ও প্রকরণ ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। একদিকে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত চৌকস ও কৌশলী নেতৃত্বের পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন, অপরদিকে তিনি মুসলিম সৈন্য বাহিনীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও প্রতিশোধ স্পৃহা তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদেরকে সংখ্যাধিক্যের উপরে নয়; বরং ঈমানের শক্তির উপরে নির্ভর করার জন্য কুরআন বারবার আহ্বান করেছে।

বদরের যুদ্ধের সার্বিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি একান্তই আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে তৈরি করে দিয়েছিলেন। যে কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসে এরকম যুদ্ধে জয়লাভ করা একটি বিরল ঘটনা ও কৃতিত্ব, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের প্রথম যুদ্ধে যা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ সক্ষমতার পিছনে পরিকল্পনা, যুদ্ধের নকশা, সৈন্য বাহিনীর দায়িত্ব বন্টন, বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তেজস্বিতা তৈরি এবং সর্বোপরি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করার যে শক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্জন করেছিলেন, মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশনার আলোকেই হয়েছে।

---

[২২৪] আল কুরআন, ৮:৬৫

[২২৫] মাওলানা মুহাম্মদ শফি, *সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া*, (ঢাকা: নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, ১৩৩৮ হি.), পৃ. ৬৭

[২২৬] মুসা আল হাফিজ, *রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)*, (ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০২১), খন্ড. প্রথম, পৃ. ৫৮

এ কথা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, যে ব্যক্তি দীর্ঘ ৫০ বছরেও কখনো কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ অংশগ্রহণ পর্যন্ত করেননি, তার পক্ষে হঠাৎ করে একটি সশস্ত্র প্রশিক্ষিত যুদ্ধবাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য বাহিনী নিয়ে জয়লাভ করা মোটেই সহজ কথা নয়। নিশ্চয়ই এই বিজয়ের পিছনে অন্য কোন শক্তির ভূমিকা রয়েছে। কুরআনই সেই শক্তি, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

অর্থ: এর আগে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন; অথচ তখন তোমরা ছিলে অনেক দুর্বল। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকো। আশা রাখা যায়, তোমরা আমার সাহায্যের বিনিময়ে কৃতজ্ঞ থাকবে। [২২৭]

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়েছে। যেহেতু এই যুদ্ধের পরিকল্পনা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাই সাধারণত মানবিক দুর্বলতার কারণে কোন কোন মুসলিম সৈনিকের মধ্যে কিছুটা দ্বিধা দ্বন্দ বিরাজ করছিল। তাদের কেউ কেউ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছে। যদিও পরবর্তীতে তারা যুদ্ধের ময়দানে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এছাড়াও মদিনার কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি, যাদের মধ্যে মোনাফেকির কিছুটা আলামত হয়েছিল, তারাও নবীজির বিরুদ্ধে নানা কথা বলেছে। বাস্তবে এতো অল্প সৈন্য সংখ্যা নিয়ে, যাদের অধিকাংশই যুবক শ্রেণির, যুদ্ধের তেমন কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিলো না–[২২৮] কাফেরদের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সত্যি অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৎকালীন গৃহীত সকল সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কুরআন নির্দেশনা দিয়েছে। কুরআনের নির্দেশনার আলোকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহসিকতার সাথে তাঁর সাহাবাদের কে নিয়ে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কুরআন বলছে,

كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَـٰرِهُونَ ﴿٥﴾ يُجَـٰدِلُونَكَ فِى ٱلْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٦﴾

অর্থ: হায় আফসোস! এখন মুমিনদের একদল গনিমতের মাল নিয়ে বিতর্ক করছে। অথচ যখন তোমার রব সত্য সহকারে তোমাকে যুদ্ধের জন্যে ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন, তখন এদেরই কেউ কেউ এ অভিযানে আসাকে ভালো চোখে দেখেনি। তারা তোমার সাথে সত্যের

[২২৭] আল কুরআন, ৩:১২৩

[২২৮] ড. আবদুল্লাহ আযযাম, *সীরাত থেকে শিক্ষা*, (ঢাকা: মাকতাবাতুল ইসলাম, ২০১৪), পৃ. ৫৯

ব্যাপারে ঝগড়াও করছিলো। অথচ তা দিনের আলোর মতোই একেবারে পরিষ্কার হয়ে ভেসে উঠেছিলো। আসলে তাদের অবস্থা এমন হয়েছিলো, যেন তারা দেখছিলো তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হচ্ছে। [২২৯]

বদরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল মূলত কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী কাফেলাকে আক্রমণ করাকে কেন্দ্র করে। মক্কার কুরাইশদের একটি ব্যবসায়ী কাফেলা, যেটি আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বিশাল অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র নিয়ে মক্কায় ফিরছিল।[২৩০] মুসলমানদের কাছে এই কাফেলার সংবাদ যখন পৌছালো, তখন তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, এই কাফেলাটিকে তারা দখল করবেন। যেহেতু মক্কায় রেখে আসা তাদের অসংখ্য সম্পত্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে মক্কার কাফেররা এই ব্যবসা তৈরি করেছে, তাই এই কাফেলার উপরে মুসলমানদের নৈতিক অধিকার রয়েছে। সেই লক্ষ্যে মুসলমানেরা স্বল্প সৈন্যসংখ্যা নিয়ে কাফেলার উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে বের হয়েছিলেন।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা ভিন্ন পরিকল্পনা করলেন। তিনি চাইলেন যাতে মক্কার শীর্ষস্থানীয় কাফের নেতাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া যায়। তার সেই পরিকল্পনা আলোকেই মুসলমানেরা বদর যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা খুব সহজেই এই অনুসিদ্ধান্ত পৌছাতে পারি যে, বদর যুদ্ধের মূল পরিকল্পনা করেছেন মহান আল্লাহ তাআলা। কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে দিবালোকের মত তা স্পষ্ট হয়ে যায়। কুরআনে সেই ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

অর্থ: সে সময়ের অবস্থা মনে করে দেখো, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্বস্ত করলেন যে, শত্রুপক্ষের দুটি দলের একটি তোমাদের হাতে ধরাশয়ী হবে, তখন তোমরা চাচ্ছিলে নিরস্ত্র ব্যবসায়ী দলটিকে করায়ত্ব করতে। অথচ আল্লাহ চাচ্ছিলেন নিজের বাণীসমূহের সাহায্যে সত্যকে সবকিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিতে এবং একইসাথে কাফেরদের বড় বড় শিকড়গুলোকে উপড়ে ফেলতে। তিনি এটা চেয়েছিলেন যাতে, সত্য সত্য হিসাবে আর বাতিল বাতিল হিসাবে খোলামেলাভাবে সবার সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়। এর পরিণাম দেখে অপরাধীরা যতোই কষ্ট পাক– তাতে কিছুই যায় আসে না। [২৩১]

---

[২২৯] আল কুরআন, ৮:৫-৬

[২৩০] গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৬) পৃ. ১৫৭

[২৩১] আল কুরআন, ৮:৭-৮

এই অসম যুদ্ধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যুদ্ধের শুরুতে সাহাবী আজমাইনদের সকলেই আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে সাহায্য প্রত্যাশা করলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাদেরকে সার্বিক সাহায্য করার জন্য ওয়াদাবদ্ধ হলেন। হাজারো ফেরেশতা পাঠিয়ে এই যুদ্ধে আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয় দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। মুসলমানেরা আল্লাহ তাআলার এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে আনন্দিত হয়েছেন এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

এই যুদ্ধের মাধ্যমে একদিকে মুসলমানদের ঈমানের প্রমাণ হয়েছে, অন্যদিকে মক্কার জালেমদের পতন ঘটেছে। পাশাপাশি সমস্ত আরব এ কথা ভালো করে বুঝে গিয়েছিলো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে মুসলমানদের যে কাফেলা তৈরি হয়েছে , তা অবশ্যই এই পৃথিবীকে জয় করতে সক্ষম হবে। বদরের যুদ্ধের পরিকল্পনা ও কর্মসূচি যে মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রণীত তার একটি প্রমাণ হলো এই যুদ্ধে ফেরেশতাদের আগমন। কাজেই এই কথা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে, আল্লাহর পয়গম্বর হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নির্দেশনার আলোকে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। কুরআন বলছে,

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

অর্থ: স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে যুদ্ধের জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে এবং তিনি তা কবুল করে বলেছিলেন, তোমাদেরকে সাহায্য করার জন্যে আমি এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি, যারা একের পর এক তোমাদের কাছে হাজির হবে। আল্লাহ এ ঘোষণা কেবল এ কারণেই তোমাদেরকে জানিয়ে দিলেন, যাতে তোমরা সুসংবাদ পাও এবং তোমাদের মনে বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা আসে। আর তোমরা তো জানোই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউই সাহয্য করার সামর্থ্য রাখে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপরে মহা পরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। [২৩২]

এই যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে আরো অনেক ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানদেরকে প্রশান্তির ঘুম দিয়েছিলেন। মুসলমানদের জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করেছিলেন। পবিত্রতা অর্জনের উপায় উপকরণ সরবরাহ করেছেন। শয়তান মুসলমানদের মধ্যে যে সকল ফেতনা ছড়িয়ে ছিল, তা থেকে মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা করেছিলেন। মহান আল্লাহর এই সাহায্য মুসলমানদের জন্যে বিজয়কে সহজ করে দিয়েছিল। কুরআন সেই ঘটনা বলছে এভাবে,

[২৩২] আল কুরআন, ৮:৯-১০

إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَـٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

অর্থ: যুদ্ধের আগ মুহূর্তের কথাগুলো মনে করে দেখো, তিনি তোমাদের মনের ভিতরে প্রশান্তি ও নির্ভীকতা সৃষ্টি করলেন, ফলে তোমরা নিশ্চিন্তে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বৃষ্টি দিলেন, ফলে তোমরা পবিত্রতা অর্জন করতে পারলে, শয়তানের সব ধরনের সৃষ্ট নাপাকী থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারলে। আর এভাবেই তোমাদের মনোবল শক্ত হলো এবং তোমাদের পদক্ষেপগুলো যথার্থ দৃঢ় হলো।[২৩৩]

এই যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন। ফেরেশতাগন মুসলিম সৈন্যদের মনোবল দৃঢ় ও মজবুত করেছিলেন। কুরআনে তাদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে

إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ سَأُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٣﴾

অর্থ: তোমরা ভুলে যেও না, সে সময় আল্লাহ নিজে ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, যাও, তোমরা ঈমানদারদের মনোবলকে দৃঢ় ও অবিচল করে রাখো। আমি তোমাদের সাথে আছি। আর শোনো! অচিরেই আমি কাফেরদের মনে ভয়ানক আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিচ্ছি। কাজেই যুদ্ধের ময়দানে এসব কাফেরদের গর্দান উড়িয়ে দাও এবং ওদের দেহের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হানো। ১৩. ওদের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানো। কেননা ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। জেনে রাখা উচিত, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, আল্লাহ তাকে ভয়ানক শাস্তি দিয়ে থাকেন। [২৩৪]

যুদ্ধ শেষে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দি কুরাইশদের ব্যাপারে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাহাবীদের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে তিনি মুক্তিপণের মাধ্যমে কাফের বন্দিদের মুক্তি দেন। যদিও কুরআন নবীজির এই সিদ্ধান্তে কোনো বাঁধা দেয়নি; তবে ভিন্ন মত ও সাবধান বাণী উপস্থাপন করেছে।[২৩৫]

---

[২৩৩] আল কুরআন, ৮:১১

[২৩৪] আল কুরআন, ৮:১২-১৩

[২৩৫] ড. সালমান আল আওদাহ, *মাআল মুস্তাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩

৪.২.৩. ওহুদের প্রান্তরে নবীজির নেতৃত্ব

বদরের যুদ্ধের রেশ শেষ হতে না হতেই ওহুদের যুদ্ধ এসে পড়ে। মক্কার কাফেররা বদরের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আরো বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ওহুদের ময়দানে সমবেত হয়। এ সময় তারা তিন হাজার যোদ্ধা, তিন হাজার উট এবং দুইশ ঘোড়া'র[২৩৬] বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য মদিনা আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে আগমন করেন।

কাফিরদের এই বিরাট রণ প্রস্তুতি প্রতিরোধে মুসলমানেরা এক হাজারের মতো সৈন্য সংখ্যা নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। শুরুর দিকে মুসলমানেরা মদিনার অভ্যন্তরে থেকেই প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু পরে অধিকাংশ সাহাবীর আগ্রহ এবং উদ্যোগে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রাথমিক পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এবং ওহুদের ময়দানে যুদ্ধে জড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে মুহাজির সাহাবীদের পাশাপাশি অনেক আনসার সাহাবীগন অংশগ্রহণ করেন।

মুসলিম সৈন্য বাহিনীর মধ্যে অনেক কিশোর ও যুবক বয়সের সাহাবীগন ছিলেন। এমনকি মদিনার দুর্বল ঈমানদার ও মুনাফিক মুসলমানেরাও এই যুদ্ধে প্রথমদিকে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর নেতৃত্বে তিন শতাধিক সৈনিক যুদ্ধের ময়দান থেকে চলে যায়। যার ফলে মুসলমানদের শক্তি কমে যায় এবং তাদের অনেকে এই ঘটনায় হতাশ হয়ে পড়েন। বিশেষ করে দুর্বল ঈমানদারদের কেউ কেউ সৈন্য সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে যুদ্ধের ময়দানে ভীত হয়ে নানা ধরনের কথার ছড়াছড়ি করেন। আল্লাহ তাআলা এসময় মুসলমানদেরকে মানসিক স্থিরতা ও শক্তি যোগান। কুরআনের কথা গুলো এভাবে বলা হয়েছে যে,

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَـٰعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

অর্থ: হে নবী, এবার লোকদের ওহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনা শুনাও। সেদিন খুব সকালেই তুমি ঘর থেকে বের হয়েছিলে। এরপর মুমিন সৈন্যদের যুদ্ধের জন্যে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করাচ্ছিলে। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের সব শোনেন, সব জানেন। মনে করে দেখো, এ সময় তোমাদের মধ্যের দুটি দল নিজেদের সাহস প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলো; অথচ আল্লাহ নিজেই তাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আসলে আল্লাহর উপর ভরসা করাই মুমিনদের কাজ।[২৩৭]

যুদ্ধের শুরুতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অতীতের অনেক ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের কে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সাহায্য প্রদান করা

[২৩৬] ড. হিশাম আল আওয়াদি, *বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

[২৩৭] আল কুরআন, ৩:১২১-১২২

হয়েছিল তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলছেন, বদরের যুদ্ধে তোমাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক কম; কিন্তু তারপরেও তোমরা জয়লাভ করেছিলে। কারণ আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। কাজেই যে আল্লাহ বদরে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পেরেছিলেন, সেই আল্লাহ তোমাদেরকে ওহুদেও সাহায্য করবেন। এভাবে যুদ্ধের শুরুতেই ভেঙে পড়া ও মনোবল চাঙ্গা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা অনেক উৎসাহমূলক কথা বলেছেন।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

অর্থ: এর আগে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন; অথচ তখন তোমরা ছিলে অনেক দুর্বল। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকো। আশা রাখা যায়, তোমরা আমার সাহায্যের বিনিময়ে কৃতজ্ঞ থাকবে।[২৩৮]

যুদ্ধের শুরুতেই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করার ঘোষণা দিয়েছেন। যদি মুসলমানেরা যুদ্ধের ময়দানে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে, তাহলে তাদেরকে একের পর এক হাজার হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করা হবে। এ সাহায্য করার পদ্ধতিটা কিছুটা শর্তসাপেক্ষ ছিল। যদি মুসলমানেরা ধৈর্য এবং দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করতে পারে তবেই তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সাহায্য লাভ করবে।

এই যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা পাঁচ হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করার ঘোষণাও দিয়েছিলেন। বলা যায়, এই ঘোষণার মাধ্যমে সাহাবীদের ভেঙে পড়া মন আবারও পুনর্জীবিত হয়েছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সহজেই তার সাহাবীদের এই বিশাল বাহিনী কে শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নবীজির এই সফলতার পিছনে কুরআনের ঘোষণা অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে।

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَٰثَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰٓ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَٰفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

অর্থ: স্মরণ করো, যখন তুমি মুমিনদের বলেছিলে, তোমাদের রব তাঁর তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন– এটা কি তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নয়? তবে হ্যাঁ, তোমরা যদি ময়দানে দৃঢ় থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করে লড়ে যাও, তবে শত্রুবাহিনী যে

[২৩৮] আল কুরআন, ৩:১২৩

মুহূর্তে তোমাদের উপর চড়াও হবে, ঠিক তখনই তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন।[২৩৯]

এভাবে যুদ্ধের আগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য বিজয় আসার যে ঘোষণা দেওয়া হয় এতে মুসলমানেরা, যুদ্ধের জন্য অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ এবং সাহসী অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। যে কোন যুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ের মনোভাব এবং সাহসিকতার গুরুত্ব অপরিসীম। সেনাবাহিনী সদস্যদের মধ্যে যদি দৃঢ় মনোবল ও প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তি না থাকে, তবে তাদের জয়লাভ করা অনেকাংশেই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সে কারণেই আল্লাহ তাআলা নবীজির মাধ্যমে সাহাবীদেরকে দৃঢ় মনোবল এবং লড়াইয়ের মানসিকতা তৈরি করিয়েছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা একদিকে মুসলমানদেরকে যেভাবে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন, অপরদিকে আল্লাহদ্রোহী জালেম শক্তির বিনাশ সাধন করতে চেয়েছেন। যুগ যুগ ধরে আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের হাতে জালেমদের এমনই কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। কুরআনের সেকথাই এভাবে বলা হচ্ছে যে,

وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِۦ ۗ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا۟ خَآئِبِينَ ﴿١٢٧﴾

অর্থ: তোমাদের আশ্বস্ত করার জন্যেই আল্লাহ আগেভাগে এ সুসংবাদ দিলেন। এতে তোমাদের মনে প্রশান্তি আসবে। প্রকৃতার্থে বিজয়-সাহায্য প্রবল পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আসলে আল্লাহ তোমাদের মাধ্যমে কাফেরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করতে চান। অথবা এমনভাবে লাঞ্ছিত করতে চান, যাতে ওরা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। [২৪০]

ওহুদের যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলমানরা বিজয় লাভ করলেও, শেষ পর্যন্ত তারা সে বিজয় ধরে রাখতে পারেননি। নিজেদের ভুল ও ব্যর্থতার কারণে একটা পর্যায়ে মুসলমানেরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে মুসলমানদের ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। অসংখ্য সাহাবী আহত হন। এমনকি খোদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও এই যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন।

যুদ্ধ শেষে মুসলমানেরা যখন দারুণভাবে মর্মাহত, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। যুদ্ধে পরাজয় কে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখার জন্য মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা যদি ঈমানের পথে টিকে থাকতে পারো, তাহলে ভবিষ্যতে তোমরাই জয়লাভ করবে। এ পরাজয় সাময়িক এবং এটি সময়ের একটি পালাবদল মাত্র। ভবিষ্যতে তোমাদেরকে আরও

[২৩৯] আল কুরআন, ৩:১২৪-১২৫
[২৪০] আল কুরআন, ৩:১২৬-১২৭

অনেক লড়াই-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই পরাজয়কে বুকে ধারণ করে আগামী দিনের বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্য পরিকল্পনা ও মনোবল তৈরি করার কাজেই তোমরা মনোনিবেশ কর।

ওহুদের যুদ্ধের পরাজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী ও পরিগঠিত করতে চেয়েছেন, পাশাপাশি মুসলমানদের মধ্যে থেকে একদল লোকদেরকে শাহাদাতের মর্যাদায় আসীন করতে চেয়েছেন। এভাবে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি সেনাবাহিনীকে আল্লাহ তাআলা পুনর্জীবন দিলেন খুব সহজেই। আর এই পুরো কথা গুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ওহী আকারে নাযিল করার কারণে সাহাবীদের কাছে নবীর মর্যাদা অনেক বেশি বেড়ে গেল। এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরআনের পক্ষ থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বেশি সহযোগিতা পেলেন। কুরআন এর বর্ণনায় সে কথাগুলো এমন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ
فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٤٠﴾

অর্থ: আর হ্যাঁ, তোমরা মনমরা বা হতাশ হয়ো না এবং দুশ্চিন্তাও করো না। যদি তোমরা ঈমানের পথে সত্যিকারে টিকে থাকতে পারো, তবে বিজয় তোমাদের আসবেই। ১৪০. আজ যদি তোমাদের গায়ে কোনো আঘাত লেগে থাকে, তবে এর আগে ঠিক একই ধরনের আঘাততো তোমাদের বিরোধী পক্ষের গায়েও লেগেছিলো। আসলে আমিই মানুষের মধ্যে জয়-পরাজয়ের দিনগুলোর পালাবদল করাই। এভাবে আমি বাছাই করে নেই, কারা খাঁটিভাবে ঈমান এনেছে এবং এর জন্যে জীবন দিয়েও সাক্ষী হতে প্রস্তুত রয়েছে। জেনে রেখো, জালেম শ্রেণী কখনোই আল্লাহর ভালোবাসা পাবে না। [২৪১]

যুদ্ধের এই বিপর্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে আরো বেশি পরিশুদ্ধ করে তুলতে চান। একইসাথে কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান। আল্লাহ তাআলার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নতুন নতুন কর্মকৌশল ও পদক্ষেপ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ

অর্থ: এ পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ ঈমানদারদের আরো পরিশুদ্ধ করে গড়তে চান এবং একইসাথে কাফেরদের নিশ্চিহ্ন করতে চান।[২৪২]

[২৪১] আল কুরআন, ৩:১৩৯-১৪০
[২৪২] আল কুরআন, ৩:১৪১

যুদ্ধে পরাজিত মুসলমানদের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনাও করা হয়েছে। যুদ্ধের আগে মুসলমানদের অনেকের মধ্যে যে আবেগ ও শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্খা ছিল, যুদ্ধের ময়দানে তা অনেকের মধ্যে পাওয়া যায়নি। যে আবেগের কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তন করেছিলেন, সেই আবেগ তাদের ক্ষতি করেছে। এ কারণে যুদ্ধপরবর্তী পর্যালোচনায় সবার আগে সে কথাগুলো উঠে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্য যে কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছিলেন তা গ্রহণ করাই ঈমানদারদের উচিত ছিল। এখানে একদিকে নবীজির নেতৃত্বকে নির্ভুল প্রমাণ করা হচ্ছে, অপরদিকে ঈমানদারদেরকে এ কথা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, নবীজির প্রণীত প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও কর্মকৌশল মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুমোদিত।

وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿١٤٣﴾

অর্থ: তোমরা তো মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার আগে আল্লাহর জন্যে শহীদ হতে চাইতে। আর যখন সে মুহূর্ত তোমাদের সামনে এলো, তখনতো নিজেরাই দেখলে– তোমরা কী আচরণ করে বসলে। [২৪৩]

এই যুদ্ধের এক পর্যায়ে কাফেরেরা গুজব ছড়িয়ে দিলো যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গিয়েছেন। এই সংবাদ শুনে অনেক সাহাবী হতোদ্যম হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ যুদ্ধের ময়দান থেকে চলে যেতে চাইলেন। এই কারণে যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় খুব দ্রুতই হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এমন আচরণ করার জন্য তীব্র সমালোচনা করলেন। এইসব আলোচনার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে শেখানো হলো ঈমান কি জিনিস? আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের সীমারেখা কতটুকু? রসুলের অবর্তমানে ঈমানের দায়িত্ব কি হবে, তাও বোঝানো হলো। এর মাধ্যমে মুসলমানদের চিন্তা ও বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করা হলো।

রসুলের শাহাদাত বা মৃত্যু এমন কিছু নয় যে, এর জন্যে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরে যেতে হবে। এভাবে যে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যে আনুগত্যের উপর টিকে থাকবে, আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন। [২৪৪] পাশাপাশি মুসলমানদের মধ্যে নতুন নেতৃত্ব তৈরীর আহবান জানানো হলো। মুসলমানদেরকে বুঝানো হল, নবীজির বিদায়ের পর ইসলামের ঝান্ডা চারদিকে উঁচু করে রাখার দায়িত্ব তোমাদের। তার জন্য মুসলমানদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এভাবে এই যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তাআলা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিলেন। একটু চিন্তা করে আমরা বুঝতে পারি যে, ওহুদের যুদ্ধে জয়ের চেয়ে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানেরা বেশি কিছু অর্জন করতে পেরেছে। কুরআন সেই আশার দিকগুলোই আমাদেরকে দেখাচ্ছে,

[২৪৩] আল কুরআন, ৩:১৪৩

[২৪৪] ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৪-৭, পৃ. ১৭৯

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِى ن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

অর্থ: ভালোকরে জেনে রেখো, মুহাম্মদ তোমদের কাছে একজন রসুল ছাড়া আর কিছুই নন। এরকম বহু রসুল তার আগে পৃথিবীতে এসেছে এবং গত হয়ে গেছে। কাজেই এখন যদি মুহাম্মদ মারা যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা আমার দ্বীন ত্যাগ করে আগের অবস্থানে ফিরে যাবে? মনে রেখো, কেউ যদি দ্বীন ত্যাগ করে আগের অবস্থানে ফিরে যায়, তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই। তবে যারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, তাদেরকে তিনি অচিরেই পুরস্কৃত করবেন।[২৪৫]

এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের অন্যতম বা দৃশ্যমান কারণ জাগতিক সম্পদের প্রতি কিছু কিছু সৈনিক-এর লোভ তৈরি হওয়া। কিছু সৈনিককে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তারা সে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে গনিমতের মাল লাভের আশায়। যুদ্ধপরবর্তী পর্যালোচনায় কুরআন এই জায়গাটি খুব শক্ত করে বর্ণনা করেছে। কুরআনের ভাষায়,

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَـٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

অর্থ: আর এ যুদ্ধে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। শুরুর দিকে তোমরা তাঁর হুকুমেই ওদেরকে প্রায় শেষ করে দিয়েছিলে। কিন্তু এরপরই তোমরা দুর্বলতা দেখালে। তোমাদের চোখ পড়লো তোমাদের কাঙ্খিত বস্তু– গনিমতের মালের উপর। ফলে তোমরা নেতার আদেশ লংঘন করলে এবং কাজের ব্যাপারে নিজেরাই মতভেদে জড়ালে। আসলে তোমাদের কিছু লোক দুনিয়াবী লোভে পড়ে গিয়েছিলো। অবশ্য কিছু লোক তখনও আখেরাতকেই চাচ্ছিলে। তখনই আল্লাহ কাফেরদের মোকাবেলায় তোমাদের পিছিয়ে দিলেন, যাতে তোমাদের থেকে এক কঠিন পরীক্ষা নেয়া যায়। এসব কিছুর পরেও আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেছেন। আসলে আল্লাহ মুমিনদের বড়ই করুণার নজরে দেখেন।[২৪৬]

[২৪৫] আল কুরআন, ৩:১৪৪

[২৪৬] আল কুরআন, ৩:১৫২

যুদ্ধে যখন মুসলমানদের প্রাথমিক বিপর্যয় নেমে এলো, তখন তাদের অনেকেই জীবন বাঁচানোর জন্য ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে লাগলো। কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাদের সেই পালানোর চিত্র এভাবে বর্ণনা করছেন যে, তারা পিছনে কে ছিল- তার দিকে তাকানোর সময় পেল না; অথচ রসুল এবং নেতৃস্থানীয় সাহাবীগন তাদেরকে ডেকে যাচ্ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে আসার জন্য। আল্লাহ তাআলা পলায়নপর ঐ সকল সাহাবীদের সমালোচনা করেছেন। কুরআনের ভাষায়,

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَـٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَـٰبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

অর্থ: তোমাদের সে দৃশ্য মনে করে দেখো, তখন তোমরা পালাবার জন্যে পাহাড়ের দিকে এমনভাবে ছুটছিলে যে, কারও দিকে ফিরে তাকানোর হুঁশও ছিলো না। অথচ স্বয়ং রসুল পিছন দিক থেকে তোমাদের ডাকছিলেন। এ আচরণের কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ দিলেন। এ পথে তোমরা ভবিষ্যতের শিক্ষা পাবে যে, কোনো কিছু হাতছাড়া হয়ে গেলে কিংবা যে কোনো বিপদই আসুক না কেন, তাতে ভেঙ্গে পড়তে নেই। বস্তত আল্লাহ তোমাদের সব কাজকর্মের খবর রাখেন।[২৪৭]

যুদ্ধের পর স্বাভাবিকভাবেই সাহাবাগন ছিলেন বেশ ক্লান্ত এবং পরিশ্রান্ত। আল্লাহ তাআলা তাদের চোখে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। অধিকাংশ সাহাবী তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। এভাবে তাদের ক্লান্তি ভাবটা কেটে গেল এবং যুদ্ধের পরাজয়ের কষ্ট কিছুটা কমে এলো। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রহমত ছিল। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ তখনো নানা ধরনের বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলছিলো।

এদের কেউ কেউ এই পরাজয়ের জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম কে দায়ী করছিল। এরা বলতে চেয়েছিল, যুদ্ধের নেতৃত্ব তাদের হাতে থাকলে, মুসলমানেরা পরাজয় বরণ করতো না। আসলে এরা ছিল মুনাফিকদের একটা অংশ। আল্লাহ তাআলা তাদের এমন চিন্তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। আল্লাহর বয়ানে একথা পরিষ্কার হয়েছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্ব ছিল সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং সঠিক। পরাজয়ের পেছনে সাহাবীদের মানবিক দুর্বলতা অন্যতম কারণ ছিল।

কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বকে সাহাবাগণের সামনে নির্ভুল ও যথার্থ বলে প্রমাণ করেছে। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ধরনের বিরূপ পরিবেশের মুখোমুখি না হয়ে, তার নেতৃত্ব অব্যাহত রাখতে পেরেছেন। এই সকল ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সময়ে সময়ে কুরআনই নবীজির নেতৃত্ব গঠন ও বিকাশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রেখেছে।

[২৪৭] আল কুরআন, ৩:১৫৩

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمْ ۖ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِىٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَـٰهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِىَ ٱللَّهُ مَا فِى صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

অর্থ: এ দুঃখ-বিপর্যয়ের পর আল্লাহ প্রশান্তি নাযিল করলেন। ফলে তোমাদের একদল তাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলে। কিন্তু তখনও কিছুলোক নিজেদের ব্যাপারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় বিচলিত ছিলো। ওরা তখন আল্লাহ সম্পর্কে নানা জাহিলি কথাবার্তা বলছিলো, যা মোটেই সত্য নয়। ওরা বলছিলো, এসব বিষয়ে নেতৃত্বের জন্যে কি আমাদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো? হে নবী, তুমি ওদের বলো, এসব ব্যাপারে নেতৃত্ব কেবল আল্লাহর হাতে। আসলে ওরা মনের কথা তোমাদের সরাসরি বলার সাহস পাচ্ছে না। ওরা মূলত বলতে চায়, এ যুদ্ধে আমরা নেতৃত্ব দিলে এখানে আজ মারা পড়তাম না। তুমি ওদের শক্তভাষায় বলে দাও, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও বসে থাকতে, তবুও যাদের নামে মৃত্যু লেখা হয়ে গেছে তারা নিজেরাই মৃত্যুস্থানে এসে হাজির হয়ে যেতে। আসলে এ দুঃখ-বিপর্যয় এ জন্যেই যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে পরিশুদ্ধ করে নিতে চান। কেননা আল্লাহ বান্দার অন্তরের অবস্থা খুব ভালোকরেই জানেন। [২৪৮]

কুরআন এ কথাও বলেছে যে, এই যুদ্ধে পরাজয়ের পেছনে শয়তানের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছে, তারা মূলত শয়তানের ধোঁকায় পড়েছে। এভাবে সাহাবাদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে আর কখনোই শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে কেউ পিছপা না হয়।

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ ۖ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

[২৪৮] আল কুরআন, ৩:১৫৪

অর্থ: সেদিন তোমাদের যারা মোকাবেলা না করে পালিয়ে গিয়েছিলো; মূলত শয়তান ওদের কিছু দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওদের পদস্খলন ঘটায়। অবশ্য এরপর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন। আসলে আল্লাহ বান্দার প্রতি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই সহনশীল।[২৪৯]

যুদ্ধপরবর্তী সময়ে মদিনাতে একটি শোকাবহ পরিবেশ তৈরি হয়। অনেক ঘরেই তখন শহীদের কান্না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। মদিনার আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের অনেকেই এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। অসংখ্য সাহাবী শারীরিকভাবে আহত হয়েছেন। সবমিলিয়ে মদিনায় তখন এক ধরনের শোকাবহ পরিবেশ বিরাজ করেছে।

এমন পরিস্থিতিতে মুনাফিকদের অনেকেই নিজেদের সুযোগ মনে করে মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা-ফাসাদ ছড়ানোর চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে যে সকল মুনাফিকরা যুদ্ধে যায়নি, তারা যুদ্ধাহত ঈমানদারদের নানাভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করছিল। তাদের অনেকেই বলছিল, তোমরা আমাদের মত যুদ্ধে না গিয়ে বাড়িতে থাকলে, আজ এভাবে বিপদে পড়তে না। ওরা শহীদের পরিবারকে তিরস্কার করছিল। বলছিল, তোমাদের ভাইয়েরা যুদ্ধে না গিয়ে বাড়িতে থাকলে এই বিপদে পড়তো না। মুনাফিকদের এমন কাপুরুষোচিত বক্তব্যের প্রতিবাদে আল্লাহ তাআলা কুরআনে জ্বালাময়ী কথা বলেছেন। কুরআন বলছে,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا۟ غُزًّى لَّوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟ وَمَا قُتِلُوا۟ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, তোমরা কাফেরদের মতো কথা বলো না। ওদের আত্মীয়-স্বজনের কেউ যখন কোনো সফরে মারা যায় কিংবা যুদ্ধে নিহত হয়, তখন ওরা বলে, হায়! ওরা যদি আমাদের সাথে বাড়িতে অবস্থান করতো, তবে এ পরিণতি হতো না। এসব ভ্রান্ত কথাবার্তা দ্বারা আল্লাহ ওদের অন্তরে দুঃখ ও আক্ষেপের জন্ম দেন। আসল কথা হচ্ছে, জীবন-মৃত্যু কেবল আল্লাহর হাতে। জেনে রেখো, তোমাদের সব কাজকর্মের উপর আল্লাহ সজাগ দৃষ্টি রাখেন। [২৫০]

আল্লাহ তাআলা শহীদের মর্যাদা ও ফজিলত সম্পর্কে মুসলমানদেরকে আবারও সচেতন করছেন। পাশাপাশি তিনি এ কথা বলছেন যে, যুদ্ধের ময়দানে তোমরা যদি মারা নাও যাও, তবুও তোমাদেরকে একদিন না একদিন মরতেই হবে। কাজেই যুদ্ধের ময়দানে মরা কে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই;

[২৪৯] আল কুরআন, ৩:১৫৫

[২৫০] আল কুরআন, ৩:১৫৬

বরং তা তোমাদের জন্য অনেক বড় সম্মানের। এভাবে মুসলমানদেরকে মুনাফিকদের প্রচারণা থেকে আল্লাহ তাআলা রক্ষা করলেন।

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾
وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

অর্থ: আসলে তোমরা যদি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাও কিংবা মারা যাও, তবে বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমারা ক্ষমা ও রহমত লাভ করবে, যা ওদের দুনিয়ায় জমানো সম্পদ থেকে অনেক অনেক উত্তম। তাছাড়া তোমরা স্বাভাবিকভাবে মারা যাও কিংবা কোনো কারণে নিহত হও– উভয় অবস্থায়ই তোমাদের অবশ্যই আল্লাহর কাছে সমবেত হতে হবে।[২৫১]

ওহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের পেছনে নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব ও কর্মকৌশল কোনটি দায়ী ছিল না; বরং পরাজয়ের পেছনে অন্যান্য সাহাবীদের মানবিক দুর্বলতা মৌলিকভাবে দায়ী ছিল। একজন শাসক ও নেতা হিসেবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদের উপর কঠোর হতে পারতেন। তিনি যুদ্ধে নেতার হুকুম লঙ্ঘনের অপরাধে অনেক সাহাবীকে শাস্তির আওতায় আনতে পারতেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার অপরাধে মদিনার অনেক মানুষকে শাস্তি দিতে পারতেন।

কিন্তু তিনি রাহমাতাল্লিল আলামিন, দয়া ও ভালোবাসার মানুষ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সঙ্গী-সাথীদের প্রতি সবসময় সহনশীল ও কোমল আচরণ এর ছিলেন। নবীজির এই গুনকে কুরআন যথার্থ সঠিক বলে মন্তব্য করেছে। এভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তার পিছনে কুরআনের সরাসরি ভূমিকা রয়েছে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ
فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ
ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

অর্থ: হে নবী, এটা তোমার উপর আল্লাহর রহমত যে, তুমি তোমার অনুসারীদের প্রতি বড়ই কোমল হৃদয়ের। পক্ষান্তরে যদি উগ্র মেজাজ ও পাষান হৃদয়ের হতে, তবে এসব অনুসারীরা তোমার চারপাশ থেকে কেটে পড়তো। অতএব তাদের সাধারণ ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে দাও, আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে ক্ষমা চাও এবং সামষ্টিক কাজকর্মে তাদের সাথে নানা বিষয়ে

[২৫১] আল কুরআন, ৩:১৫৭-১৫৮

পরামর্শ করে নাও। এভাবে কোনো ব্যাপারে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলে, আল্লাহর উপর ভরসা করো। মনে রেখো, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তার উপর ভরসা করে কাজ করে।[২৫২]

মদিনায় তখনও মুনাফিকদের একটা বড় অংশ সক্রিয় ছিল। ওহুদের যুদ্ধে এ সকল মুনাফিকরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের হুকুম লংঘন করেছে। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে ওরা মদিনায় ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়েছে। যখন ওদের কে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, তখন ওরা বলেছিল, আজ কোন যুদ্ধ হবে না। আসলে ওরা যুদ্ধ থেকে পালাতে চেয়েছিল। কুরআন পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে যে, ওদের অন্তরে ঈমানের পরিবর্তে কুফরি অধিক পরিমাণে বিরাজ করছিল।

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَـٰتِلُوا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّٱتَّبَعْنَـٰكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَـٰنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

অর্থ: আর তিনি মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। সেদিন ওদের বলা হয়েছিলো, এসো, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো। অন্তত নিজেদের শহর প্রতিরক্ষার জন্যে হলেও লড়ো। এসব মুনাফিকেরা তখন ভনিতা করে জবাব দিয়েছিলো, আসলে আজ কোনো যুদ্ধই হবে না। যদি যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকতো; তবে তোমাদের সাথে চলতাম। বস্তুত ওরা সে সময় ঈমানের চেয়ে কুফরির দিকেই বেশি ঝুকেছিলো। ওদের অন্তরের কথার সাথে মুখের কথার কোনো মিল ছিলো না। আর আল্লাহ খুব ভালোকরেই ওদের মনের লুকানো কথা জানেন।[২৫৩]

এমনকি মুনাফিকেরা যখন শহীদদের ব্যাপারে অনাকাঙ্খিত মন্তব্য করছিল, তখন আল্লাহ তাআলা ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, যদি তোমরা পারো নিজেদের মৃত্যু ঠেকাও। আসলে ঈমানদারেরা কখনোই মৃত্যুকে পরোয়া করেনা। এভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে উপর মুনাফিকদের আরোপিত সকল অভিযোগ ও আপত্তি খণ্ডনে কুরআন সবসময় সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে। বলা যায়, কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন সফল নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَٱدْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿١٦٨﴾

অর্থ: এরপর এসব মুনাফিকেরা নিজেরা বাড়িতে বসে থাকলো। আরো উল্টো ওদের যেসব ভাই-বন্ধু যুদ্ধ করে শহীদ হলো, তাদের সম্পর্কে বলতে লাগলো– ইশ! ওরা যদি আমাদের

[২৫২] আল কুরআন, ৩:১৫৯
[২৫৩] আল কুরআন, ৩:১৬৭

কথা মানতো তবে আজ মরতো না। হে নবী, ওদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলো, যদি তোমাদের এ বিশ্বাস সত্য হয়, তবে পারলে নিজেদের মরণ ঠেকাও।[২৫৪]

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

অর্থ: খবরদার! যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে তাদেরকে কখনো সাধারণের মতো মৃত ভেবো না। তারা প্রকৃতার্থে জীবিত এবং আপন রবের পক্ষ থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত।[২৫৫]

৪.২.৪. দ্বিতীয় বদরে নবীজির নেতৃত্ব

ওহুদের যুদ্ধের রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতেই আরেকটি যুদ্ধের সময় ঘনিয়ে এলো। ইতিহাসে এই যুদ্ধকে দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধ বলা হয়। ওহুদের যুদ্ধের ফলাফল ছিল অনির্ধারিত। না মুসলমানরা জয়লাভ করেছিল, না মক্কার কাফেররা। তাই যুদ্ধ শেষে কাফেরদের নেতা আবু সুফিয়ান পরবর্তী বছর আবার বদরের ময়দানে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে যায়। ওরা বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ঠিক বদরের ময়দানে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তী বছর যথাসময়ে তাঁর সাহাবাদের নিয়ে বদরের ময়দানে উপস্থিত হলেন। নবীজির সাহসী পদক্ষেপ কাফেরদের অন্তরে ভয় ধরিয়ে দেয়। ফলে ওরা আর যুদ্ধে অংশ নেয় না।

কুরআনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীদের গুণগান পেশ করা হচ্ছে

ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

অর্থ: আরো জেনে রেখো, আহত হওয়ার পরেও যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ডাকে পুনরায় সাড়া দিয়েছে, তারা সৎকাজ করলে এবং তাকওয়ার নীতিতে চললে, তাদের জন্যে বিরাট পুরস্কার অপেক্ষা করছে। [২৫৬]

[২৫৪] আল কুরআন, ৩:১৬৮
[২৫৫] আল কুরআন, ৩:১৬৯
[২৫৬] আল কুরআন, ৩:১৭২

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَٱنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُوا رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

অর্থ: তাদেরকে লোকেরা ভয় দেখিয়ে বলেছিলো, তোমাদের বিরুদ্ধে শত্রুরা বিরাট সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছে। সুতরাং এবার তোমাদের খবর আছে, সতর্ক থেকো। একথা শুনে তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেলো এবং তারা দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলো, আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। আর কিভাবে কাজ সমাধা করতে হয়, তিনি তা ভালোকরেই জানেন। অবশেষে তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে আসলো। এ অভিযানে তাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতিই হলো না; বরং উল্টো তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলার সৌভাগ্য লাভ করলো। আসলে আল্লাহ বান্দার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল।[২৫৭]

৪.২.৫. ইহুদি গোত্র বনি নজির এর বহিষ্কারে নবীজির নেতৃত্ব

ইহুদি গোত্র বনু নজির ছিল মদিনার একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী। মদীনার উপকণ্ঠে নিজেদের সুরক্ষিত দুর্গে বসবাস করতো। ইসলামের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই এদের মধ্যে ছিল তীব্র বিদ্বেষ। তারা নানাভাবে ইসলামের উত্থানকে ঠেকানোর চেষ্টা করতো। দ্বিতীয় বদরের পর যখন মুসলমানেরা মদিনাতে বেশ শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়, তখন বনি নজিরের নেতৃবৃন্দ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[২৫৮]

সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রাষ্ট্রীয় কাজে বনু নজির গোত্রে সফর করেন, তখন তারা তাকে হত্যা করার উদ্যোগ নেয়।[২৫৯] সিরাতের পাতায় সেই হত্যার পরিকল্পনার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। তারা মূলত উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে নবীজিকে হত্যার চেষ্টা চালায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নবীজিকে এই ঘটনা আগে থেকে জানিয়ে দেন। ফলে তিনি প্রাণে বেঁচে যান এবং ওদের পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যায়।

মদিনা সনদের চুক্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসেবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে হত্যা করতে চাওয়া খুব বড় ধরনের একটি অপরাধ। যে অপরাধের জন্য ওদের শাস্তি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে বনু নজির গোত্রকে অবরোধ

---

[২৫৭] আল কুরআন, ৩:১৭৩

[২৫৮] মুসা আল হাফিজ, *রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)*, প্রাগুক্ত, খন্ড. প্রথম, পৃ. ৬৮

[২৫৯] তারিক রমাদান, *রাসূলুল্লাহ এর পদাঙ্ক অনুসরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৫

করলেন। এই অবরোধ খুব দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয়নি; বরং অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা আত্মসমর্পণ করে। কুরআন সে কথাগুলো বলছে,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن دِيَـٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ ۖ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ ۖ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُوا۟ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَـٰرِ ﴿٢﴾

অর্থ: তিনি অবাধ্য দুরাচারী আহলে কিতাবের বনি নযির সম্প্রদায়কে প্রথম আক্রমণেই ওদের ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ওহে ঈমানদারেরা, তোমরা কল্পনাও করতে পারোনি যে, ওরা এতো সহজেই বেরিয়ে যাবে। আর ওরাও ধরে নিয়েছিলো যে, ওদের দুর্গগুলো ওদেরকে আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু না, আল্লাহ ওদের এমন দিক দিয়ে আঘাত হানলেন, যা ওরা কল্পনাও করতে পারেনি। আসলে তখন আল্লাহ ওদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। ফলে ওরা শেষ পর্যন্ত নিজ হাতেই নিজেদের বাড়িঘর ভেঙ্গে চুরমার করে ফেললো। আর চূড়ান্তভাবে ঈমানদারেরা ওদের আস্তানাই শেষ করে দিল। অতএব হে চাক্ষুষ্মানেরা, এ দৃশ্য দেখে নিজেদের জীবনে শিক্ষা গ্রহণ করো। [২৬০]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন দয়ার সাগর তিনি বনি নজির গোত্রের সকল লোকদেরকে মদিনা থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। যদিও তার জন্য ওদেরকে হত্যা করা ছিল বৈধ। এভাবে মদিনা থেকে ওরা নির্বাসত হয়ে গেল। এতো সহজেই ওরা মদিনা থেকে চলে যাবে, সেটা ওরা কখনোই কল্পনা করেনি। এমনকি মদীনাবাসীও ভাবেনি। আল্লাহর পরিকল্পনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সহজেই এই বিজয় লাভ করলেন।

وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿٣﴾

অর্থ: ওরা যদি নিজে থেকে নির্বাসিত হওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে না নিতো, তবে আল্লাহ দুনিয়া থেকে ওদের নাম নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দিতেন। আর আখেরাতে তো ওদের জন্যে জাহান্নামের লেলিহান শিখা প্রস্তুত থাকছেই। [২৬১]

[২৬০] আল কুরআন, ৫৯:২
[২৬১] আল কুরআন, ৫৯:৩

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٤﴾

অর্থ: কারণ, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে মারাত্মকভাবে গাদ্দারি করেছে। যারা আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করে, আল্লাহ ওদেরকে কঠোর হাতে শাস্তি দিয়ে থাকেন।[২৬২]

এই অভিযান পরিচালনার সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি নজির গোত্রের অসংখ্য খেজুর গাছ কেটে ফেলেছেন। আর মদিনার নিত্য দিনের খাবার ছিল খেজুর। অবরোধের প্রয়োজনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। কিন্তু মদিনার ইহুদিরা এবং মুনাফিকরা নবীজির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়। ওরা বলে তিনি শান্তি লঙ্ঘন করছেন। মানুষের খাবার জ্বালিয়ে দিয়েছে।

এভাবে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বের উপর এক ধরনের দোষারোপ করতে থাকে। মহান আল্লাহ তাআলা ওদের এই আচরণের প্রতিবাদ করলেন। আল্লাহ বললেন খেজুর গাছগুলো তাঁর নির্দেশে কাটা হয়েছে। ফলে কার্যত এখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যক্তিগত কোনো দোষ বা চাহিদা নেই। এভাবে ইসলামবিরোধী শক্তির অপপ্রচার থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করলেন।

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿٥﴾

অর্থ: আর হ্যাঁ, অবরোধকালে তোমরা সেখানের যেসব খেজুর গাছ কেটেছিলে, আর যেগুলো না কেটে অক্ষত রেখে দিয়েছিলে– তার সবটাই ছিলো আল্লাহর অনুমতিক্রমে। আল্লাহ এ অনুমতি দিয়েছিলেন, যাতে পাপিষ্ঠ দুরাচারীরা চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়।[২৬৩]

এ অভিযানের বিজয় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে খুব সহজেই মুসলমানরা পেয়েছিল। এর জন্য মুসলমানদেরকে না যুদ্ধ করতে হয়েছে, আর না ঘোড়ায় চড়তে হয়েছে। কাজেই ঈমানদারদের বিশ্বাস আরো মজবুত হয়েছে যে, বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। এভাবে মদিনায় ইসলামের শিকড় দিনদিন মজবুত হতে থেকেছে।

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

[২৬২] আল কুরআন, ৫৯:৪

[২৬৩] আল কুরআন, ৫৯:৫

অর্থ: তবে মনে রেখ, এ অভিযানে আল্লাহ তাঁর রসুলকে যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিয়েছেন, তার জন্যে তোমরা কেউ ঘোড়া বা উটে চড়ে যুদ্ধ করোনি। কখনো কখনো আল্লাহ এভাবেই তাঁর রসুলদের কারও উপর বিজয় দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।[২৬৪]

শুরুতে যখন মুসলমানেরা বনি নজির গোত্রকে অবরোধ করে তখন মদিনার কিছু মুনাফিক নেতারা তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিল যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা ওদেরকে সাহায্য করবে। এই আশ্বাস পেয়ে ইহুদিরা নিজেদেরকে প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু মুনাফিকরা ওদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আসলে মুনাফিকের এমনই। ওরা প্রতিশ্রুতি দিলে তা কখনো রক্ষা করে না। কুরআন মুনাফেকদের সেই সময়কার আচরণগুলো এভাবে বর্ণনা করছে,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٢﴾

অর্থ: হে নবী, তুমি কি মুনাফিকদের অবস্থা লক্ষ্য করোনি? ওরা ওদের কাফের আহলে কিতাব ভাইদের বলছে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, তোমাদরকে এ শহর থেকে তাড়াতে পারবে না। যদি পারে, তবে সেদিন আমরাও তোমাদের সাথে এ শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাবো। তোমাদের ব্যাপারে আমরা কাউকেই ছাড় দেবো না। ভয় পেও না, তোমরা যদি আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো। কিন্তু না! আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, ওরা ডাহা মিথ্যাবাদী। ১২. শুনে রেখো, ঐসব ইহুদিদের তাড়িয়ে দিলে মুনাফিকদের কেউই ওদের সাথে দেশত্যাগ করবে না। ওদেরকে মেরে সাফ করে দিলেও সাহায্যের জন্যে এদের কেউ এগিয়ে আসবে না। আর যদি সাহায্য করতে দু-একজন আসেও, তারাও পালিয়ে যাবে। দুরাচারী পাপীরা কোনো জায়গা থেকেই সাহায্য পাবে না। [২৬৫]

আল্লাহ তাআলা এই সময়ে মুসলমানদেরকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে, ইহুদিরা দূর থেকে যত শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ দেখাক না কেন, আসলে ওরা খুবই দুর্বল। তাছাড়া মুনাফিকরা কখনোই কারো সাহায্যে আসে না। কাজেই ভবিষ্যতে আর এসব লোকদেরকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। বরং মদিনায় তোমরা নিজ শক্তি বলে আল্লাহর দীনের বিধানগুলো কায়েম করে চলো। এভাবে কুরআনে নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরও দৃঢ় এবং সক্রিয় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে।

---

[২৬৪] আল কুরআন, ৫৯:৬

[২৬৫] আল কুরআন, ৫৯:১১-১২

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِى صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَـٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, এসব মুনাফিকেরা আল্লাহর চাইতে এখন তোমাদেরকেই বেশি ভয় করে। কেননা ওরা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেনি। ঐসব ইহুদিরা একজোট হয়ে কখনোই খোলা ময়দানে তোমাদের মোকাবেলায় যুদ্ধে নামবে না। লড়াই করলেও তা করবে দুর্গের ভিতর থেকে বা কোনো প্রাচীরের আড়াল থেকে। আসলে ওদের নিজেদের মধ্যে ভয়ানক পারস্পরিক কোন্দল রয়েছে। দূর থেকে তোমাদের মনে হবে, ওরা সবাই একজোট; কিন্তু না, ওদের মধ্যে কোনো আন্তরিক মিল নেই। আর এর অন্যতম কারণ হলো, ওরা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে না।[২৬৬]

৪.২.৬. ইহুদি গোত্র বনি কাইনুকা এর বহিষ্কারে নবীজির নেতৃত্ব

ইহুদি গোত্র বনু কায়নুকা, যারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতো। এক পর্যায়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। নিরাপরাধ মুসলমানদেরকে হত্যা করে। তারা প্রকাশ্যে মদিনা সনদের চুক্তি লঙ্ঘন করে। চুক্তি লঙ্ঘনের অপরাধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করে দেন। এভাবে মদিনা থেকে একের পর এক ইহুদি বংশ নির্মূল হয়ে যায়।

ইহুদিদেরকে এভাবে মদিনা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে একটি সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। দীর্ঘ সময়ের জন্য ইহুদিরা কখনোই মুসলমানদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে আগ্রহী ছিল না। এমনকি ওরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার পক্ষেও ছিল না। ওরা সুযোগ পেলেই মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরণের বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা তৈরিতে উস্কানি দিতো। ফলে মুসলমানদের আশপাশ থেকে ওদেরকে সরিয়ে দেওয়া ছিল একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের পরিচয়। আল্লাহ তাআলা নবীজির সাল্লাল্লাহু সাল্লাম-কে সে গুণ দিয়েছিলেন

كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا۟ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾

[২৬৬] আল কুরআন, ৫৯:১৩-১৪

অর্থ: ওদের পরিণতি ঠিক বনু কাইনুকার মত হবে, যারা কিছুদিন আগে নিজেদের অপকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। বস্তুত ওদের জন্যে প্রস্তুত রয়েছে এক মর্মান্তিক আযাব।[২৬৭]

৪.২.৭. খন্দকের যুদ্ধে নবীজির নেতৃত্ব

ওহুদের যুদ্ধের পর মক্কার কুরায়েশরা মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করার জন্য একটি বৃহৎ পরিকল্পনা হাতে নেয়। তারা মক্কার ও আরবের অন্যান্য বন্ধুদের সাথে নিয়ে প্রায় ১০ হাজার সৈন্যের[২৬৮] একটি বিরাট বাহিনী তৈরি করে। এই সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণের জন্য মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। কুরাইশদের নেতৃত্বে সমগ্র আরবের এই সম্মিলিত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা অভ্যন্তরে থেকেই প্রতিরোধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

পারস্যের সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় চারপাশে পরিখা খনন করেন। এই অভিনব প্রতিরক্ষা কৌশল দেখে আরবের বাহিনী থমকে যায়। এই যুদ্ধের নানা নাটকীয়তার পর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। মুসলমানদের এই বিজয় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিল। আল্লাহ তাআলা তার নিজের সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে মুসলমানদেরকে জয় এনে দিয়েছিলেন। কেননা খন্দকের যুদ্ধে মুসলমান এবং কাফেরেরা মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করেনি।

কুরআনে সূরা আহযাব নাযিল করে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে এই যুদ্ধের নানা ঘটনা জানিয়েছেন। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা একসাথে কুরাইশ, বনু গাতফান, বনু কুরাইজা ও বনু নজীর এর সম্মিলিত বিশাল বাহিনীকে মোকাবেলা করেছে।[২৬৯]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছিলেন, তা একবার স্মরণ করো। শত্রুবাহিনী যখন চারদিক দিয়ে তোমাদের উপর চড়াও হচ্ছিলো, তখন

---

[২৬৭] আল কুরআন, ৫৯:১৫

[২৬৮] ড. হিশাম আল আওয়াদি, *বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

[২৬৯] মুহাম্মদ আল মহল্লী, *তাফসীরে জালালাইন*, (অনু. মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসুম, ঢাকা: আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তাফা, ২০১১) খন্ড: ৫ পৃ. ১২০

আমিই ওদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও অদৃশ্য বাহিনী পাঠিয়েছিলাম। আসলে আল্লাহ তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপেই চোখ রাখেন।[২৭০]

খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের সৈন্যবাহিনী ছিল অনেক বড়। সমস্ত আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে এই সৈন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ মদিনার জনসংখ্যার চেয়েও এই সৈন্যসংখ্যা ছিল বেশি। তদুপরি কাফেররা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধের রসদ নিয়ে আক্রমণ করতে এসেছিল। অপরদিকে আভ্যন্তরীণ ইহুদি সম্প্রদায় এবং মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একেরপর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল। বাহিরে কাফেরদের আক্রমণ এবং ভিতরের মুনাফিক ও ইহুদিদের আক্রমণে মুসলমানদের জন্য ছিল খুবই বিপর্যয়মূলক একটি পরিবেশ। এতই ভয়ঙ্কর পরিবেশ ছিল যে, মুসলমানদের জন্য জীবন মরণের প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল।

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَـٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠ ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا۟ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

অর্থ: স্মরণ করো, শত্রুবাহিনী যখন উপর ও নিচ উভয় দিক থেকেই তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন ভয়ে তোমাদের চোখ হয়ে পড়েছিলো বিস্ফোরিত, প্রাণ হয়ে পড়েছিলো ওষ্ঠাগত। এমনকি তোমাদের কেউ কেউ আল্লাহ সম্পর্কে নানা অশোভন কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলে। সত্যিই সে সময় ঈমানদারেরা কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ছিলো। এ পরীক্ষা তাদের সমাজকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দিয়েছিলো।[২৭১]

এসময় সম্মিলিত বাহিনী দেখে মদিনার মুনাফিকরা এবং দুর্বল ঈমানদারেরা ভেঙে পড়ে। তারা আল্লাহ সম্পর্কে নানা ধরনের বিভ্রান্তি মুলক কথাবার্তা বলতে থাকে। এমনকি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে ব্যাপারে তারা একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। তারা প্রকাশ্যে জনগনকে বলতে থাকে আল্লাহ এবং তার রাসুল আমাদের সাথে প্রতারণা করেছে। আমরা যদি এখনো মুসলমানদের সাথে থাকি তবে নিশ্চিত আমরা মারা পড়বো।

এভাবে ওরা মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়াতে লাগলো। মুনাফিকদের এমন চক্রান্তে মদিনার দুর্বল ঈমানদার লোকেরা যুদ্ধ থেকে পালানোর চেষ্টা করতে লাগলো । তাদের অনেকেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমাদেরকে বাড়িঘরে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত। আসলে যুদ্ধ থেকে পালাতে চাচ্ছিল।

[২৭০] আল কুরআন, ৩৩:৯

[২৭১] আল কুরআন, ৩৩:১০-১১

খন্দকের যুদ্ধে একদিকে ঈমানদারদের ঈমানের চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয়া হচ্ছিল, অপরদিকে মুনাফিকদের লুকিয়ে থাকা সকল চেহারাগুলো একে একে প্রকাশ করে দেওয়া হচ্ছিল। পাশাপাশি মদিনার ইহুদিদের সর্বশেষ যে গোত্র ছিল, তাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়ে যায়। এভাবে এই খন্দকের যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের চূড়ান্তভাবে বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করে দেওয়া হয়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে ঈমানদারেরা আরবের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই এবং ঘরের শত্রুদেরকে একইসাথে মোকাবেলা করার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, আগামী দিনের নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে আসবে। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা নবীজির সাথে অসীম বিরত্ব প্রকাশ করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেন। নবীজি তাঁর সাহাবীদের উজ্জিবীত রাখতে এ সময় করিতাও পাঠ করেন। পরিখা খননের সময় সাহাবাদের সাথে সমচ্চারিতভাবে তিনি এ কবিতা পাঠ করেন।[২৭২]

وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَـٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

অর্থ: মনে করে দেখো, সে সময় মুনাফিকেরা ও ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের লোকেরা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে বলছিলো, দেখো! আল্লাহ ও তাঁর রসুল আমাদেরকে যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তা স্রেফ ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্মরণ করো হে ঈমানদারেরা, এ সময় ওদের একদল তো প্রকাশ্যে বলে বেড়াতো, হে ইয়াছরিববাসী, তোমাদের জন্যে আর এ নবীর সাথে থাকার সুযোগ নেই, ফিরে চলো। এরপর ওদের কিছু কিছু লোক নবীর কাছে এসে ফিরে যাওয়ার জন্যে অনুমতি চাইতে লাগলো। ওরা বাহানা দেখালো, আমাদের বাড়িঘর বিপদাপন্ন। অথচ না, ওদের বাড়িঘর বিপদাপন্ন ছিলো না। ওরা মূলত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে চাচ্ছিলো।[২৭৩]

এ সময় মুনাফিকদের আসল চেহারা একেবারে খোলামেলাভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়। তার আসলে কোনোভাবেই মুসলমানদের পক্ষের শক্তি ছিল না। যদিও এর আগে ওরা মুসলমানদের সাথে ঐব্যবদ্ধ হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ওরা আসলে সব সময় চাইত

[২৭২] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, *বুখারী শরীফ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১) পরিচ্ছেদ ১৯০০, হাদিস নং ২৮২১, খন্ড: ৫, পৃ. ২৪৬

[২৭৩] আল কুরআন, ৩৩:১২-১৩

মুসলমানদেরকে বিনাশ করে দিতে এবং এর জন্য ওরা যে কোন কিছু করতেই প্রস্তুত ছিল। কুরআন এই পর্যায়ে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই এর অনুমোদন করে দেয়

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَءَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَـٰهَدُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَـٰرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْـُٔولًا ﴿١٥﴾

অর্থ: ওদের মানসিক অবস্থা ছিলো এতোটাই নোংরা যে, যদি শত্রুরা চারদিক দিয়ে মদিনায় ঢুকে পড়তো এবং ওদেরকে ডেকে বলতো, মুসলমানদের নিধনে আমাদের সাথে যোগ দাও, তবে ওরা মুহূর্তের মধ্যেই বিদ্রোহে নেমে পড়তো। চক্ষুলজ্জাও ওদেরকে এক মুহূর্তের জন্যে থামাতে পারতো না। অথচ ওরাই ইতিপূর্বে আল্লাহর কাছে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার দিয়েছিলো যে, ওরা কখনো কোনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছপা হবে না। জেনে রাখুক, আল্লাহর সাথে করা সে অঙ্গীকারের জবাব ওদেরকে অবশ্যই দিতে হবে।[২৭৪]

মুনাফিকদের চিন্তা বিশ্বাসের মৌলিক গলদ সম্পর্কে কুরআন কথা বলছে। ওরা দুনিয়াকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছে। মুসলমানরা দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতের জীবনকে বেশি পছন্দ করে। আর আখেরাতে যাওয়ার জন্য মৃত্যু হচ্ছে তাদের একমাত্র পথ। দুর্বল ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ তাআলা কিছু নসিহত মূলক বক্তব্য রেখেছেন, যাতে তারা মুনাফিকদের ধোকায় পড়ে ঈমানহারা না হয়।

মদিনা রাষ্ট্রকে নিরাপদ রাখার জন্যে মদিনাবাসী যে শপথ নিয়েছিলো, নবীজি তা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এমনকি তিনি এও বলেছেন যে, বিপদের দিনে ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যে কেউ একদিনও সময় দিলে, তা হাজার দিন সময় দেওয়া বলে গন্য হবে।[২৭৫] এভাবে তিনি মদিনাবাসীকে সম্মিলিত বাহিনীর প্রতিরোধে এগিয়ে আসার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। মানুষকে সঠিক পথে ধরে রাখার যে প্রচেষ্টা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘসময় ধরে করছেন, আল্লাহ তাআলা তাকে সমর্থন করলেন। মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি সফল নেতৃত্বের প্রমাণ।

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ

[২৭৪] আল কুরআন, ৩৩:১৪-১৫

[২৭৫] ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, অধ্যায় ১১, হাদিস নং ১২৯৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৫

رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَٰنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾

অর্থ: হে নবী, এসব মুনাফিকদের বলো, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে লাভ নেই। হয়তো এ যাত্রায় মৃত্যু কিংবা নিহত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে। কিন্তু এরপর জীবনে ভোগ-মাস্তি করার জন্যে খুব কম সময়ই পাবে। ওদেরকে আরো বলো, আল্লাহ যদি তোমাদের ক্ষতি করতে চান, তাবে কে তোমাদের রক্ষা করবে? আর তিনি যদি তোমাদের উপর অনুগ্রহ করতে চান, তবে কে তোমাদের বঞ্চিত করবে? ওদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহর মোকাবেলায় ওরা কোনো পৃষ্ঠপোষক খুঁজে পাবে না। কোনো সাহায্যকারীও এগিয়ে আসবে না। ওদের বলে দাও, আল্লাহ ভালো করেই জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা সাধারণ লোকদেরকে যুদ্ধে আসতে বাধা দিচ্ছিলে এবং নিজ স্বজনদেরকে বলছিলে, যুদ্ধ না করে বরং আমাদের সাথে ফিরে চলো। আসলে তোমরা তো লোক দেখানোর জন্যে নামকাওয়াস্তে যুদ্ধে এসেছিলে।[২৭৬]

এ সময় কুরআন মুনাফিকদের আত্মপরিচয়ের সংকটগুলো তুলে ধরেছে যাতে সাধারণ মুসলমানরা সতর্ক হতে পারে। কুরআন দেখাচ্ছে, মুসলমানদের উপর সামান্য ব্যাপারেই এ সকল মুনাফিকরা চোখ উল্টে দেয়; অথচ মুসলমানদের বিজয় হলে ওরা গনীমতের আশায় মুসলমানদের চারপাশে ভিড় জমায়। এমন দ্বিমুখী আচরণ কখনোই ঈমানদারদের জন্য শোভনীয় নয়। কাজেই ওরা যে সত্যিকারের ঈমানদার নয়, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকার সুযোগ নেই। এর মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কাফেরদের মতোই আচরণ করার অনুমোদন দিয়েছেন

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُو لَٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

অর্থ: এসব মুনাফিকেরা মুমিনদের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে হাত গুটিয়ে রেখেছে। বিপদ দেখামাত্রই ওদের চোখে-মুখে মৃত্যুর ছাপ পড়ে যায় এবং তোমাদের দিকে চোখ উল্টিয়ে তাকাতে থাকে। আর যখন বিপদ কেটে যায় তখন আবার যুদ্ধলব্ধ মালামালের লোভে তোমাদেরকে ধারালো বাক্যবাণে জর্জরিত করে। ওরা আসলে ঈমানদার নয় বরং পাক্কা

[২৭৬] আল কুরআন, ৩৩:১৬-১৮

কাফের। আল্লাহ ওদের সমস্ত কাজকর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন। আল্লাহ এমনটা করতে মোটেই দ্বিধান্বিত হন না।[২৭৭]

খন্দকের যুদ্ধ কে মুনাফিকরা তাদের নিজেদের জন্য সর্বশেষ সুযোগ বলে গ্রহণ করেছিল। সে কারণেই আরবের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে মিলে মদিনায় অভ্যন্তরে মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের ফেতনা ফাসাদ ছড়ানোর চেষ্টা করছিল। ওরা ধরেই নিয়েছিল, এবার মুসলমানদের শেষ হবে। কেননা আরবের এই বিশাল বাহিনী কোনভাবেই মুসলমানদেরকে নিঃশেষ না করে বিদায় নেবে না। ওদের এমন ধারণার কারণেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল মুনাফিকরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছিল। এতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে যারা মুনাফেকি করতো, তারা প্রকাশ্যে তাদের পরিচয় প্রকাশ করলো। আল্লাহ তাআলা মদিনা থেকে সকল মনাফিককে নির্মূল করার জন্যেই এই সুযোগটি তৈরি করে দিয়েছিলেন, যাতে করে মুসলমানদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়, কে এবং কারা আসলে মুনাফেক।

يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِى ٱلْأَعْرَابِ يَسْـَٔلُونَ عَنْ أَنۢبَآئِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَـٰتَلُوٓا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

অর্থ: এসব মুনাফিকেরা বিশ্বাস করে যে, অবরোধকারী সম্মিলিত বাহিনী ঈমানদেরদের নিশ্চিহ্ন না করে চলে যেতে পারে না। তাই যদি এ বাহিনী আবার ফিরে এসে আক্রমন চালায়, তবে এসব মুনাফিকেরা চাইবে যুদ্ধ না করে বরং মরুভূমির বেদুইনদের মাঝে আত্মগোপন করে থাকতে। নিরাপদ দুরত্বে থেকে ওরা তোমাদের খোঁজ-খবর নেবে। আর যদি একান্ত বাধ্য হয়ে তোমাদের মধ্যে থেকেই যায়, তবে ওরা খুব কমই যুদ্ধে অংশ নেবে।[২৭৮]

সত্যিকারের ঈমানদারেরা এই যুদ্ধে নিজেদের ঈমান ও আমলের প্রমাণ রেখেছেন। তারা নবীজির মধ্যে নিজেদের জন্য উত্তম আদর্শ খুঁজে পেয়েছেন। আল্লাহর জন্য জীবন উৎসর্গ করতে তাদের কোনো পরোয়া ছিলনা। তারা মক্কার এই সম্মিলিত বিশাল বাহিনীকে কোনভাবে ভয়ের জিনিস মনে করেনি; বরং এই বাহিনী দেখে তাদের ঈমান আরও বেড়ে গিয়েছিলো। তারা বলেছিল আল্লাহ আমাদেরকে যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্য সত্য। মুসলমানদেরকে অবশ্য বিজয় দান করবেন।

এ সকল মর্দে মুজাহিদ আল্লাহওয়ালা ঈমানদারদের তীব্র লড়াই এর কারণে মক্কার সম্মিলিত বাহিনী যেভাবে পরাজিত হয়েছে অপরদিকে মদিনার অভ্যন্তরে থাকা মুনাফেক এবং ইহুদিরাও পরাজিত হতে বাধ্য হয়েছে। সন্দেহ নেই যে এই সময়ে সাহাবাদের ঈমান মজবুত রাখার পেছনে কুরআনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি ছিল। কুরআনের নির্দেশনার কারণেই নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সহজেই তার আপন সাহাবীদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

[২৭৭] আল কুরআন, ৩৩:১৯

[২৭৮] আল কুরআন, ৩৩:২০

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَـٰنًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

অর্থ: যাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ও আখেরাতের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং কার্যত আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে চলে, নিশ্চয়ই তাদের জন্যে আল্লাহর রসুলের মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। সেদিন প্রকৃত ঈমানদারেরা সম্মিলিত শত্রুবাহিনীকে দেখে বলেছিলো, এতো আমাদের সাথে করা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সেই মহাবিজয়ের প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ। আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওয়াদা সত্য হতে চলেছে। বাস্তবে এ দৃশ্য তাদের ঈমান ও আনুগত্যের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো।[২৭৯]

আল্লাহ তাআলা সাহাবীদের ঈমানের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। দ্বীন ইসলামের জন্য অসংখ্য সাহাবী ইতিপূর্বে জীবন দিয়েছে এবং আরও অনেকেই জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। কুরআনের এমন উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য শুনে সাহাবাদের মধ্যে ঈমানের শক্তি ও প্রেরণা তৈরি হয়। ফলে তারা নবীজির নেতৃত্বে আরও সক্রিয়ভাবে দ্বীনের পথে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যান।

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَـٰهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

অর্থ: ঈমানদারদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর সাথে করা নিজেদের অঙ্গীকারকে পূরণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাতের নজরানা পেশ করেছে এবং অনেকেই শাহাদাতের তামান্না নিয়ে অপেক্ষা করছে। অঙ্গীকার দেওয়ার পর থেকে তারা কখনোই একচুল এদিক-সেদিক করেনি।[২৮০]

খন্দকের যুদ্ধ মূলত ছিল একটি পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ঈমানদারদের ঈমানের পরিশুদ্ধতা যাচাই করা হচ্ছে অন্য দিকে কপট ঈমানদারদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বাস্তবিকভাবে ঈমানদার সমাজকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে বড় বড় বিজয় অভিযান পরিচালনা করা যায়।

لِّيَجْزِىَ ٱللَّهُ ٱلصَّـٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

[২৭৯] আল কুরআন, ৩৩:২১-২২

[২৮০] আল কুরআন, ৩৩:২৩

অর্থ: এ ঝড়ঝঞ্ঝাময় ঘটনার মাধ্যমে মূলত আল্লাহ সাচ্চা ঈমানদারদের সত্যবাদিতার পুরস্কার দিতে চেয়েছেন এবং একইসাথে কপোট মুনাফিকদের চেহারা উন্মোচন করে শাস্তি অথবা ভুল স্বীকারের মাধ্যমে ওদেরকে ক্ষমা করতে চেয়েছেন। আসলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীর, বড়ই দয়ালু।[২৮১]

শেষ পর্যন্ত মক্কার সম্মিলিত বাহিনী খালি হাতে মদিনা থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রসুলের জয় হয়েছে এবং জয় হয়েছে মুসলমানদের। মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সম্মিলিত আরবের যে বাহিনী মদিনা অবরোধ করেছিল, একটা সময় পর তারা খালি হাতে ফিরে যায়। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে কাফেরদের উপরে স্থায়ীভাবে বিজয় দান করেন। এই ঘটনার পর সমস্ত আরবের উপরে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কেউ আর মুসলমানদের বিরোধিতা করার সাহস পায়নি। এমনকি খোদ কুরাইশরা পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিরোধ করার সাহস দেখায়নি।

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

অর্থ: এ যুদ্ধে আল্লাহ সত্য অস্বীকারকারীদের ব্যর্থ করে দিয়েছেন। ওরা এক বুক জ্বালা-যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে গেছে। ওরা কোনো লাভই অর্জন করতে পারেনি। যুদ্ধে ঈমানদারদের রক্ষার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট প্রমাণিত হলেন। বস্তুত আল্লাহ মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী।[২৮২]

৪.২.৮. বনু কুরাইজার অভিযানে নবীজি নেতৃত্ব

খন্দকের যুদ্ধে মদিনায় বসবাসরত ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। তারা মক্কার সম্মিলিত বাহিনীর সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলমানদের নির্মূল করার কাজে অংশগ্রহণ করে এবং খোলাখুলিভাবে মদিনা সনদের সকল চুক্তি অস্বীকার করে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে আগেই সতর্ক করেছেন যে, ইহুদিদের মধ্যে এখনো এমন অনেকেই রয়েছে যারা সুযোগ পেলেই চুক্তি ভঙ্গ করবে। এ ব্যাপারে তারা আল্লাহকে ভয় করে না।

[২৮১] আল কুরআন, ৩৩:২৪
[২৮২] আল কুরআন, ৩৩:২৫

ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ۬ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

অর্থ: ওদের মধ্যে এমন কিছু নিকৃষ্ট লোকও রয়েছে, যারা তোমার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পরও, সুযোগ পেলে চুক্তি বিরোধী কাজ করে। আসলে ওদের মধ্যে আল্লাহর ব্যাপারে সামান্য ভয়ও নেই। কাজেই হে ঈমানদারেরা, তোমরা যুদ্ধের ময়দানে এসব চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে হাতের নাগালে পেলে এমন ভয়ানকভাবে বিনাশ করো, যাতে ওদের পরিণতি দেখে পরবর্তীতে আর কেউ এমনটা করার দুঃসাহস না দেখায়। [২৮৩]

খন্দকের যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী মদিনা ছেড়ে চলে যাবার পর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে ইহুদি গোত্র বনু কুরাইযাকে আক্রমণ করার জন্য হুকুম দিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাহিনীকে দ্রুত সময়ের মধ্যে বনু কুরাইজা গোত্রে যাওয়ার জন্য হুকুম জারি করলেন। এভাবে মুসলমানদের অবরোধের কারণে বনু কুরাইজা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। এরপর বিচারে তাদের অনেককে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হলো এবং অনেককে বন্দি করা হয়। এভাবেই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হিসেবে বনু কুরাইজা কঠিন শাস্তি পেল।

وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَـٰهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾

অর্থ: এদিকে ইহুদিগোত্র বনি কুরায়যা– যারা যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুবাহিনীকে সাহায্য করেছিলো, আল্লাহ ওদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করে দিলেন এবং শেষপর্যন্ত ওদেরকে দুর্গ থেকে নেমে আসতে বাধ্য করলেন। এভাবেই তোমরা ওদের একদলকে হত্যা করলে এবং অন্যদের বন্দী করার সুযোগ পেলে। [২৮৪]

এভাবে এক পর্যায়ে মদিনা থেকে সকল ইহুদিদের নির্বাসিত করা হলো। বনু কুরাইজার রেখে যাওয়া ঘরবাড়ি জায়গা-জমি ও ধন-সম্পদ সবকিছুই মুসলমানদের করায়ত্ব হলো। মুসলমানেরা গনিমতের মাল হিসেবে বৃহৎ অঞ্চল লাভ করল। পাশাপাশি সমগ্র মদিনার উপরে মুসলমানদের একক অধিকার ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হলো।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَـٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ۬ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

[২৮৩] আল কুরআন, ৮:৫৬-৫৭

[২৮৪] আল কুরআন, ৩৩:২৬

অর্থ: আর এভাবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ওদের সব জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পত্তির মালিক বানিয়ে দিলেন এবং তোমাদের এমন অনেক অঞ্চল দিলেন, যেখানে তোমরা আগে কখনো আসোনি। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুর উপরই প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী।[২৮৫]

৪.২.৯. হুদায়বিয়ার সন্ধিতে নবীজির দূরদর্শীতা

খন্দকের যুদ্ধের পর মদিনায় মুসলমানদের একক অধিকার ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে মক্কার কাফেররা আর কখনোই মুসলমানদের উপর আক্রমন করার সাহস দেখায়নি। এ সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পবিত্র কাবা ঘরে ওমরা পালন করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা লাভ করেন। এই নির্দেশনা অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী ষষ্ঠ বছরে প্রায় ১৪ শত সাহাবীকে নিয়ে পবিত্র কাবা ঘরে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন।

মক্কার কাফেররা এ সময় তাদেরকে মক্কা নগরীতে ঢুকতে বাধা দেয়। ফলে মুসলমানদের জামাত হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। এ সময় উভয় দলের মধ্যে দূত মারফত সমঝোতার আলোচনা শুরু হয়। একপর্যায়ে মুসলমানদের বার্তাবাহক হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার কাফেররা বন্দী করে রাখলে গুজব ছড়ায় যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। এই সংবাদের ভিত্তিতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের জমায়েত করলেন এবং মক্কায় চূড়ান্ত অভিযান চালানোর বায়াত গ্রহণ করলেন। হাদিসে এই বায়াতকে মৃত্যুর বায়াত বলা হয়েছে।[২৮৬] এ সময় সাহাবীগন জীবন দিয়ে হলেও উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিবে, এমন শপথ গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা সেই শপথ সম্পর্কে বলছেন,

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَـٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

অর্থ: হে নবী, আল্লাহ তোমার সেসব ঈমানদার সাথীদের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে তোমার হাতে আমৃত্যু লড়াইয়ের বায়াত করেছিলো। তখনকার তাদের মনের অবস্থা আল্লাহ ভালো করেই জানতেন। তাই তিনি তাদের মনকে করেছিলেন প্রশান্ত ও স্থির-দৃঢ়চেতা এবং পুরস্কার হিসেবে দিলেন আসন্ন বিজয়।[২৮৭]

---

[২৮৫] আল কুরআন, ৩৩:২৭

[২৮৬] ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব আন নাসায়ী, *সুনানু নাসাঈ শরীফ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাাদেশ, ২০০০), অধ্যায়- বায়আত, হাদিস নং ৪১৬০, খন্ড: ৪, পৃ. ১৮০

[২৮৭] আল কুরআন, ৪৮:১৮

নবীজির এই বায়াত গ্রহণ করাকে আল্লাহ তাআলা এতই পছন্দ করলেন যে, তিনি বললেন এইবার তাঁর হাতে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বকে যথার্থ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন করা হলো। সাহাবাগন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তারা উদ্বুদ্ধ হলেন আল্লাহর পথের জীবন-মরণ উৎসর্গ করতে। পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা সাহাবাদেরকে এই বলেও সতর্ক করলেন যে এই বায়াত কোন মামুলি বায়াত নয়। কাজেই একবার বায়াত করার পর কেউ যদি তা ভঙ্গ করে তবে তার শাস্তি হবে খুবই ভয়ঙ্কর। এভাবে আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যথার্থ নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ করে দেন

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

অর্থ: হে নবী, সেদিন যারা তোমার হাতে আমৃত্যু লড়াইয়ের জন্যে বায়াত করেছিলো, প্রকৃতার্থে তারা আল্লাহর হাতেই বায়াতবদ্ধ হচ্ছিলো। তাদের হাতের উপর ছিলো আল্লাহর হাত। অতএব এখন যে এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে, সে এর কঠিন পরিণাম ভোগ করবে। আর যে তা পূর্ণ করবে, আল্লাহ খুব শীঘ্রই তাকে মহাপুরস্কারে সম্মানিত করবেন।[২৮৮]

হুদায়বিয়ার এই অনুষ্ঠানটি আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনা আলোকেই হয়েছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে ওমরার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা নবীজিকে স্বপ্নে মাধ্যমে এই নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ফলে এটা বলা যায় যে, হুদায়বিয়ার এই অভিযান আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল। যদিও মুসলমানেরা হিজরী ষষ্ঠ বছরে মক্কা জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছিল, তবে তারা সে বছর ওমরা পালন না করেই ফিরে যায়। এ সময় তারা কুরাইশদের সাথে ১০ বছরের যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইসলামের ইতিহাসে এই চুক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানরা এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিল। আসলে তারা বুঝতেই পারেনি এই চুক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে কি পরিমাণ কল্যাণ দান করেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথায় এর মর্ম অনুধাবন করতে তারা সক্ষম হননি; কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তারা হুদায়বিয়ার চুক্তির সার্থকতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা নবীজিকে প্রকাশ্য বিজয় দিয়েছেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

নবীজি স্বপ্নের মাধ্যমে যে কাবাঘর জিয়ারত দেখেছিলেন, তাও সম্পন্ন হয়েছে পরবর্তী বছরে। হিজরী ৭ম সালে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের কে নিয়ে মক্কায় ওমরাহ পালন করেন। এভাবে তিনি আবারও মক্কায় ফিরে আসলেন এবং এ কারণেই মক্কা বিজয়ের পথ সুগম হয়ে গেল।

[২৮৮] আল কুরআন, ৪৮:১০

لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রসুলকে সত্য স্বপ্নই দেখিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা পূর্ণ নিরাপদে কাবাঘরে প্রবেশ করবে। সেদিন তোমরা নিজেদের মাথা মুণ্ডন করাবে অথবা চুল ছোট করে কাটিয়ে নেবে। সেদিন তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না। তোমরা যা জানতে না, তা আল্লাহ জানতেন। তাই এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার আগে তোমাদেরকে এ আসন্ন বিজয় দান করেছেন।[২৮৯]

৪.২.১০. খায়বারে ইহুদিদের বিরুদ্ধে নবীজির নেতৃত্ব

খায়বার, মদিনা থেকে ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি ইহুদি জনপদ। এখানে আগে থেকেই ইহুদিদের উপনিবেশ ছিল। মদিনার ইহুদিদের সাথে এই খায়বারের ইহুদিদের পূর্ববর্তী সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে মদীনায় ইহুদিদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার জন্য খায়বারের ইহুদিরা নানাভাবে উস্কানি ও মদদ জোগাতো। মদিনার রাষ্ট্রীয় চুক্তি লঙ্ঘনের কারণে যে গোত্রগুলোকে মদিনা থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, তাদের অনেকেই খায়বারে এসে বসবাস শুরু করে।

খায়বারের ইহুদিরা মদিনার বিরুদ্ধে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের ছক আঁকে। এসব ইহুদিরা বুদ্ধি-অস্ত্র দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সহায়তাও করে। আর বেদুইনদের সাথে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধের পরিকল্পনা করে। মুসলমানদের কাছে খায়বারের ইহুদিদের এই ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ পেল, তখন তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার অভিযান পরিচালনা করলেন।

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে আগে থেকেই এবারের বিজয় এবং প্রচুর গনিমতের মাল পাওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে রাখবেন। হিজরী সপ্তম সালে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এবং মক্কা বিজয়ের আগে মুসলমানেরা খায়বার বিজয় করেন। এ সময় তারা প্রচুর গনিমতের মাল জয় করেন। নিশ্চয়ই খায়বারের এই অভিযান মহান আল্লাহ তাআলার সুক্ষ্ম পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় সম্পন্ন হয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যা ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত।

[২৮৯] আল কুরআন, ৪৮:২৭

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَـٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾

অর্থ: হে নবী, আল্লাহ তোমার সেসব ঈমানদার সাথীদের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে তোমার হাতে আমৃত্যু লড়াইয়ের বায়াত করেছিলো। তখনকার তাদের মনের অবস্থা আল্লাহ ভালো করেই জানতেন। তাই তিনি তাদের মনকে করেছিলেন প্রশান্ত ও স্থির-দৃঢ়চেতা এবং পুরস্কার হিসেবে দিলেন আসন্ন বিজয়। **১৯.** আর অচিরেই তারা বিপুল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করবে। বস্তুত আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।[২৯০]

وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَـٰذِهِۦ وَكَفَّ أَيْدِيَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছেন, অচিরেই তোমরা বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিক হবে। খেয়াল করে দেখো, তিনি খুব সহজেই তোমাদেরকে এক বিজয় দান করলেন এবং শত্রুর হাত থেকে তোমাদেরকে পূর্ণ নিরাপদ রাখলেন, যা ঈমানদারদের দৃষ্টিতে আল্লাহর কুদরতের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে আছে। আসলে আল্লাহ সবসময়ই তোমাদেরকে সত্য-সঠিক পথে পরিচালিত করেন। [২৯১]

খন্দক যুদ্ধের পর মদিনার মুনাফিকদের সকল পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায়। এরপর থেকে মুসলমানদের কোনো অভিযানে মুনাফিকদেরকে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। এমনকি এ ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন করতে বলা হয়। কুরআনের ভাষায়,

سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, অচিরেই তোমরা যখন এমন কোনো অভিযানে বের হবে, যেখানে বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পত্তি পাওয়ার সহজ সম্ভাবনা রয়েছে, তখন আজকের পিছনে পড়ে থাকা লোকগুলো এসে বলবে, আমাদেরকে তোমাদেরে সাথে এ অভিযানে নিয়ে চলো। ওরা আল্লাহর

[২৯০] আল কুরআন, ৪৮:১৮-১৯

[২৯১] আল কুরআন, ৪৮:২০

ফয়সালাকে বদলে দিতে চায়। ওদের সাফসাফ বলে দাও, না, তোমরা আমাদের সাথে আসবে না। কারা যাবে আর কারা যাবে না– আল্লাহ তা আগেই ঠিক করে দিয়েছেন। তখন এসব কপোট লোকেরা বলবে, তোমরা তো আমাদেরকে হিংসার চোখে দেখছো। আসলে ওরা সঠিক কথা খুব কমই বোঝে।[২৯২]

৪.২.১১. ঐতিহাসিক মক্কার বিজয়ে নবীজির নেতৃত্ব

হিজরী অষ্টম বছরে ঐতিহাসিক মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়। মক্কার কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি লংঘন করলে, নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের সিদ্ধান্ত নেন। নবীজির সিদ্ধান্তে ১০ হাজার সাহাবীর এক বিরাট বাহিনী ৮ম হিজরির ১০ রমজান মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হয়।[২৯৩] কোন ধরনের প্রতিরোধ ছাড়াই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় করতে সক্ষম হন। হুদায়বিয়ার সন্ধি মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে বিজয় দেওয়ার কথা বলেছিলেন, মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন ঘটলো। কুরআনে এই বিজয়কে সুস্পষ্ট বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾

অর্থ: হে নবী, আমি এ চুক্তির মধ্য দিয়ে তোমাকে এক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।[২৯৪]

মক্কা বিজয় ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যে মক্কায় তার জন্ম, যেখানে তার বেড়ে ওঠা, যেখান থেকেই দ্বীন প্রচারের কাজ শুরু করেছিলেন এবং দীর্ঘদিন নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়ে নিজের বাড়িঘর ছেড়ে ছিলেন, সেই মক্কা নগরী জয় করা সত্যিই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল। এই অভিযানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ধরনের রক্ত প্রবাহ করেননি। মক্কার কাফেররা তেমন কোনো প্রতিরোধ তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। বলা যায় অনেকটা নীরবে মক্কা নবীজিকে বরণ করে নিয়েছে।

মুসলমানেরা আল্লাহর ঘরের নিয়ন্ত্রক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। এভাবে আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে মুসলমানেরা পুরো আরবের উপরে বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করে। আল্লাহর ঘর নাপাকি থেকে মুক্তি পায়। বিনা রক্তপাতে বিজয় সত্যি ঐতিহাসিক। ইতিহাসে এমন বিজয়ের সংখ্যা খুবই নগণ্য। রক্তপাতহীন বিজয় মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়েছে, কুরআনে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করছেন,

---

[২৯২] আল কুরআন, ৪৮:১৫

[২৯৩] আল্লামা ইদরিস কান্ধলবী, *সীরাতুল মুস্তফা সা.*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭), খন্ড: ৩, পৃ.২৩

[২৯৪] আল কুরআন, ৪৮:১

وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنۢ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, আমি মক্কার মাটিতে তোমাদের বিজয় দান করার পর ওদের হাতকে তোমাদের বিরুদ্ধে এবং তোমাদের হাতকে ওদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র করেছি। আসলে তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ তা সবই দেখেন।[২৯৫]

৪.২.১২. গোত্রসমূহকে দ্বীনের পথে আনতে নবীজির নেতৃত্ব

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে সমগ্র আরবের উপর মুসলমানদের বিজয় নিশানা উন্মোচিত হয়েছে। আরবের বিভিন্ন গোত্র একে একে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। দেখতে দেখতে আরবের সকল গোত্রই ইসলামের ছায়ায় চলে আসে।[২৯৬] হিজরি নবম বর্ষকে বলা হয় প্রতিনিধি আগমনের বছর। এই বছর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরবের সকল এলাকা থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধিদল আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামের জয়যাত্রা আরবের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আগেই এই ব্যাপারে ভবিষ্যৎ বাণী উল্লেখ করেছিলেন। কুরআন বলছে আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্তবিজয় এবং সাহায্য আসবে, তখন লোকেরা দলে দলে ইসলামে দাখিল হবে। আল্লাহ তাআলার বাণী সত্যতা খুব অল্প সময়ে লোকেরা দেখতে পেলেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিশ্বব্যাপী দ্বীন ছড়িয়ে পড়ার কথা শোনাতেন। তখন হয়তো কারো কারো কাছে এ কথাগুলো অবিশ্বাস্য মনে হতো; কিন্তু সময়ের ব্যবধানে যখন চোখের সামনে এসব দৃশ্যমান দেখতে পেল, তখন সকলেই বুঝতে পারল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্ব কতটা মজবুত ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিল। এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ পেয়েই এ সকল কথা বলতেন। কাজেই তার প্রদত্ত নেতৃত্বের পিছনে আল্লাহর প্রত্যাদেশ তথা কুরআনের ভূমিকা সবার চেয়ে বেশি ছিল

[২৯৫] আল কুরআন, ৪৮:২৪

[২৯৬] নঈম সিদ্দিকী, *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

অর্থ: যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন দেখবে হে নবী, লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীন কবুল করছে। অতএব সে সময় তুমি তোমার রবের সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করো। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং ভুলত্রুটির জন্যে তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই তওবা কবুলকারী।[২৯৭]

৪.২.১৩. হুনায়নের যুদ্ধে নবীজির নেতৃত্ব

মক্কা বিজয়ের পর যখন চারদিক থেকে মুসলমানদের দলের শত শত মানুষ যোগদান করছে, তখন হুনায়নের হাওয়াজেন গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ঘোষণা দিয়েছে। তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল গোত্রগুলো থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে। প্রায় চার হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী গঠন করে সেনানায়ক মালিক বিন আউফ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্রোহের এই সংবাদ শুনে সাহাবীদের মধ্য থেকে এক বাহিনী নিয়ে হুনায়েনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ৮ম হিজরি, ৬ই শাওয়াল, শনিবার এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান হুনায়নের ময়দানে।[২৯৮] এ যুদ্ধে মুসলমানদের ১২ থেকে ১৪ হাজারের মতো সৈনিক ছিলেন, যা অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে।

মুসলমান সৈনিকদের মধ্যে অনেকে ছিলেন নবীন। সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এমন অনেকেই মুসলিম সেনাবাহিনীতে অংশ নিয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাধিক্যের কারণে কিছু মুসলমানদের মধ্যে এমন একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেল যে, আজকের যুদ্ধে আমাদের বিজয় অবশ্যই হবে।[২৯৯] সংখ্যাধিক্যের কারণে বিজয় লাভ করা যায় না; বরং বিজয় আসে মহান আল্লাহর সাহায্যে– এই শিক্ষা কিছু কিছু সৈনিকদের মধ্যে পাওয়া গেল না। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটি কঠিন শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানেরা কোণঠাসা হয়ে পরলো। এমনকি কাফেরদের আঘাতে মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে শুরু করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর নেতৃস্থানীয় সাহাবীগন তখনও যুদ্ধের ময়দানে মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাদেরকে রেখেই সাধারণ সৈনিকরা জীবন বাঁচানোর জন্য পালাতে লাগল। এ সময় নবীজির আহবানে সাহাবীদের একটি দল

[২৯৭] আল কুরআন, ১১০:১-৩
[২৯৮] আল্লামা ইদরিস কান্ধলবী, *সীরাতুল মুস্তফা সা.*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৩, পৃ.৬১
[২৯৯] মুহাম্মদ জালালুদ্দিন, *শানে নুযুল*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১৩

ময়দানে দৃঢ়ভাবে যুদ্ধ শুরু করলো। সময়ের ব্যবধানে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। মুসলমানেরা যুদ্ধে জয় লাভ করলেন।

আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধে মুসলমানদের কে সাহায্য করেছেন। অতীতের যুদ্ধগুলোর মতো হুনায়নের ময়দানে মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্যে প্রচুর গনিমতের মাল লাভ করলেন। হুনায়নের বিজয়ের পর কার্যত সমগ্র আরব বিশ্বে মুসলমানদের বিরোধী আর কোন শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা বিশ্বব্যাপী তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করলেন।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾

অর্থ: হে মুসলমানেরা, আল্লাহ তোমাদের বহু যুদ্ধে সাহায্য করেছেন। এই তো সেদিনও হুনায়নের যুদ্ধে তোমরা তাঁর সাহায্যে বিজয় লাভ করলে। ভেবে দেখো! সেদিন তোমাদের মনে সংখ্যাধিক্যের অহমিকা ছিলো; কিন্তু এ বিরাট সৈন্যবাহিনী তোমাদের বিজয় এনে দিতে পারেনি। বিরাট পৃথিবীও সে সময় তোমাদের কাছে সংকুচিত হয়ে এসেছিলো। এমনকি, তোমরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পিছনে পালাতে শুরু করেছিলে। [৩০০]

ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٢٦﴾

অর্থ: এরপর আল্লাহ নিজেই তাঁর রসুল ও ঈমানদারদের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা তৈরি করলেন এবং এমন সেনাদল পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। এভাবেই সেদিন তিনি কাফের বাহিনীকে বড় ধরনের শাস্তি দিলেন। বস্তুত ঐসব কাফেরেরা এ ধরনের পরিণামের যথার্থ উপযুক্ত ছিলো।[৩০১]

[৩০০] আল কুরআন, ৯:২৫

[৩০১] আল কুরআন, ৯:২৬

৪.২.১৪. তাবুক অভিযানে নবীজির নেতৃত্ব

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের শেষ সময় যখন ইসলাম আরবের সীমানা পেরিয়ে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন তৎকালীন বিশ্ব শাসকেরা মুসলমানদের ব্যাপারে আশঙ্কার মধ্যে পড়ে যায়। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের রণপ্রস্তুতি তৈরি করে। বিশেষ করে রোমান সাম্রাজ্যের কথা সবার আগে চলে আসে। কারণ আরবের সীমানার সাথেই ছিল রোম সাম্রাজ্যের সীমানা। সে কারণে রোমান সম্রাট মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করবে বলে সংবাদ পাওয়া গেল।

এ সংবাদ শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের এক বিরাট বাহিনী তৈরি করলেন। প্রায় ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের প্রান্তের রওনা হলেন রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। রোমান সম্রাট মুসলমানদের এই যুদ্ধযাত্রার কথা শুনে কিছুটা ভয় পেয়ে যায় এবং সে তার যুদ্ধ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে। মুসলমানেরা তাবুকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে অবশেষে মদিনায় ফিরে আসেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধটি নানা কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে।

বিশেষ করে এই যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মধ্য থেকে দুর্বল ঈমানদার এবং অবশিষ্ট মুনাফিকদেরকে ছাঁটাই করে দিলেন। যেহেতু এই যুদ্ধটি হয়েছিল প্রচণ্ড গরমের সময়। ছিলো দীর্ঘ পদযাত্রা। মদিনায় তখন ছিল খাদ্য সংকট; সবেমাত্র ফসল উঠেছে। এমন সময় এই দীর্ঘ যুদ্ধে যাওয়ার মানেই হলো আগামী বছরের খাদ্য সংকটের মধ্য দিয়ে দিন কাটানো। তার ওপরে যুদ্ধ হচ্ছে রোম সাম্রাজ্যের সাথে। অনুমান করা যায়, এই যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। এসব কিছু সামনে রেখেই মদিনার মুনাফিকরা এবং দুর্বল ঈমানদারেরা যুদ্ধযাত্রা থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের এমন আচরণের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা শুনিয়ে দিয়েছেন । কুরআন বলছে,

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا۟ أَن يُجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا۟ لَا تَنفِرُوا۟ فِى ٱلْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا۟ يَفْقَهُونَ
﴿٨١﴾

অর্থ: এ অভিযানে ওদের যারা না যাওয়ার জন্যে অব্যাহতি পেয়েছিলো, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে যুদ্ধে শরিক না হয়ে নিজেদের ঘরে-বাড়িতে থাকতে পারায় বেশ আনন্দিত হয়েছিলো। ওরা নিজেরা তো আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করেছেই, তদুপরি অন্যদেরকেও জিহাদ থেকে ফেরানোর জন্যে বলেছে, এ প্রচণ্ড গরমে তোমরা অভিযানে

যেও না। ওদেরকে বলো, জাহান্নামের আগুন তো এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি গরম। আফসোস! ওদের যদি সে চেতনা বোধ বেঁচে থাকতো।[৩০২]

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّى وَلَا تَفْتِنِّىٓ ۚ أَلَا فِى ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٤٩﴾

অর্থ: হে নবী, ওদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে বলে আমাকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দিন। কেননা যুদ্ধকালীন সময়ে আমি ফেতনায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করছি। হায় আফসোস! ওরাতো আগে থেকেই ফেতনার মধ্যে ডুবে রয়েছে। অপেক্ষা করো, জাহান্নামের আগুন এসব অবিশ্বাসীদেরকে অচিরেই চারদিক দিয়ে গ্রাস করে নেবে।[৩০৩]

এই অভিযানের ব্যাপারে অনেক সাহাবীর কিছু কিছু ভুলত্রুটি হয়েছিল, যা মহান আল্লাহ তা'আলা নিজ গুনে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে কিছু কিছু সাহাবীর ক্ষমা পেতে অনেক সময় লেগেছে । বিশেষ করে তিনজন সাহাবীর তওবা কবুল হওয়ার একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। এভাবে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সকল ধরনের দুর্বলতা ও কলুষতা থেকে মুক্তি দিলেন।

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِىِّ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

অর্থ: আর শোনো! এ অভিযানের তীব্র সংকটকালে নবী ও তার অনুগামী মুহাজির ও আনসারদের যেসব ভুলত্রুটি হয়েছিলো, আল্লাহ তা নিজ গুণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। যদিও তাদের এক অংশ পথ হারানোর উপক্রম হয়েছিলো, তবুও শেষ পর্যন্ত নবীর সাথে থাকায় আল্লাহ তাদের সবাইকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ এসব লোকদের প্রতি খুবই স্নেহশীল এবং অপার করুণাময়।[৩০৪]

وَعَلَى ٱلثَّلَـٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

[৩০২] আল কুরআন, ৯:৮১

[৩০৩] আল কুরআন, ৯:৪৯

[৩০৪] আল কুরআন, ৯:১১৭

অর্থ: এমনকি, সেই তিনজনকেও ক্ষমা করেছেন, যারা অভিযানে পিছনে থাকার অপরাধ স্বীকার করেছিলো। তাদের তওবা বেশ কিছুদিন ঝুলে ছিলো। তাদের অবস্থা এতোটাই করুণ হয়েছিলো যে, বিশাল পৃথিবীও নিজেদের জন্যে ছোট মনে হতে লাগলো, জীবন হয়ে গিয়েছিলো দুর্বিষহ। তারা ভালোকরেই টের পেয়েছিলো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাদেরকে আশ্রয় দিতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন। ফলে তারা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পেরেছে। আসলেই বান্দার প্রতি ক্ষমা ও দয়া করার ক্ষেত্রে আল্লাহর কোনো তুলনা নেই।[৩০৫]

৪.২.১৫. বিদায় হজ্জে নবীজির নেতৃত্ব

বিদায় হজ্ব, নবী জীবনের সর্বশেষ সমাবেশ ছিলো, যা হিজরী দশম সালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করেন। এই হজ্বে লক্ষাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের উদ্দেশ্যে এক দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। এর মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বব্যাপী ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সাহাবাদেরকে আহ্বান জানান। আল্লাহ তায়ালা এ সময় দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন বলে আয়াত নাযিল করেন। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিদায় হজ্জের দিন আরাফার ময়দানে এই আয়াত নাযিল হয়।[৩০৬]

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٣﴾

অর্থ: মনে রেখো, এসবই পরিষ্কার পাপাচার। হে ঈমানদারেরা, ইতোমধ্যে কাফেরেরা তোমাদের দ্বীনের সাফল্য ও মজবুতি দেখে পুরাপুরি নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই এখন থেকে ওদেরকে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং একমাত্র আমাকেই ভয় করে চলো। আমি ঘোষণা দিচ্ছি, আজ তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্যে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের দ্বীন হিসেবে ইসলামকেই আমি মনোনীত করলাম।[৩০৭]

---

[৩০৫] আল কুরআন, ৯:১১৮

[৩০৬] তাবারী, *তাফসীরে তাবারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৮, পৃ: ২৬১

[৩০৭] আল কুরআন, ৫:৩

অধ্যায়ঃ ৫

ইহুদি খ্রিস্টানদের মোকাবেলায় মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব

ইহুদি-খ্রিস্টানদের বলা হয় আহলে কিতাব, যারা মুসলমানদের আগে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানী কিতাব লাভ করেছিল। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ওরা ওদের কিতাবের মধ্যে নানা ধরনের বিকৃতি সাধন করেছে। যার ফলে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে আল্লাহর বিরোধী বক্তব্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআন নাজিল করে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সে সকল চিন্তা বিশ্বাসের তীব্র সমালোচনা ও সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আল্লাহ তাআলার সেই পর্যালোচনায় ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বের দিকটি সঠিক ভাবে ফুটে উঠেছে।

এই আলোচনায় আমরা দেখার চেষ্টা করবো ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মোকাবেলায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তার পিছনে কুরআনের সহযোগিতা কি রকম ছিল। আমরা খুব সহজেই এ কথা বলতে পারি যে, কুরআনের সহযোগিতার মাধ্যমে প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের অতীত জীবনের নানা অপকর্ম ও বিকৃতির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরতে পেরেছিলেন।

৫.১. ইহুদি-খ্রিস্টানদের চিন্তা বিশ্বাসের প্রতিবাদ

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। কিন্তু ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ধর্ম বিশ্বাসেও একাধিক খোদার বর্ণনা রয়েছে। ইহুদিরা তাদের প্রিয় মানুষ উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করতো। অপরদিকে খ্রিস্টানেরা ঈসা মাসিহকে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস পোষণ করতো। এমনকি তারা মা মরিয়মকেও একজন খোদা বলে স্বীকার করতো। এভাবে তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এই সকল ভুল এবং মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। কুরআনের বর্ণনায় এটা স্পষ্ট যে, ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের এ দাবি কেবলমাত্র তাদের মুখের কথা। এর পেছনে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলিল-প্রমাণ নেই। এমনকি তাদের কেতাবে এই বিষয়টি উল্লেখও নেই। কুরআন বলছে,

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

অর্থ: ইহুদিরা বলে, ওযাইর আল্লাহর পুত্র ছিলো। অপরদিকে খ্রিষ্টানেরাও দাবী করছে, ঈসা মসীহ আল্লাহর পুত্র। শোনো! এসব একেবারে ভিত্তিহীন আজগুবি কথাবার্তা। ওদের পূর্ববর্তী

কাফেরদের দেখাদেখি ওরাও এ ধরনের উদ্ভট কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর গজব পড়ুক ওদের উপর। আফসোস! ওরা কোন্ দিকে হাঁটছে? [৩০৮]

ইহুদি-খ্রিস্টানেরা নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র ও প্রিয়ভাজন লোক বলে দাবী করতো।[৩০৯] ওরা সাধারণ মানুষের তুলনায় নিজেদেরকে অধিক আল্লাহর আপনজন বলে প্রচার চালাতো। এর মাধ্যমে ওরা মূলত নিজেদের জন্যে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতো। ওরা সাধারণ মানুষদের থেকে এই দাবির ভিত্তিতে এক ধরনের জাগতিক সুযোগ-সুবিধা নিতো এবং নিজেদের অনেক অপরাধের জন্যেও ছাড় চাইতো। ওরা নবীজির সতর্কবার্তা শুনে ভয় না পেয়ে উল্টো বলতো, আপনি আমাদেরকে ভয় দেখান; আমরা আল্লাহর সন্তান ও প্রিয়পাত্র।[৩১০] বিশেষ করে কোনো অন্যায় করে তার জন্যে অনুতপ্ত না হয়ে, আল্লাহর সন্তান হওয়ার দাবী করে নিজেদের অপরাধের আগাম মাফ পাবে বলে প্রচার চালাতো।

এভাবে যখন সাধারণ মানুষের উপরে ওদের মিথ্যাচার চলছে, তখন ওদের প্রতিরোধে আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আসল সত্যিটা জানিয়ে দিলেন। আল্লাহ বলে দিলেন, ওরা সাধারণ মানুষের মতোই মানুষ, এর বেশি কিছু নয়। অতীতেও ওদের পাপের জন্যে আল্লাহর ওদেরকে অনেকবার শাস্তি দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাহায্য করলেন ওদের মিথ্যা অহংকার ভেঙ্গে দিতে। ফলে ওদের বিরুদ্ধে নবীজি ও তাঁর সাহাবীগন শক্তিশালী হয়ে উঠলেন।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

অর্থ: এসব ইহুদি-খ্রিষ্টানেরা বলে বেড়ায়, তারা নাকি আল্লাহর সন্তান এবং আল্লাহ তাদেরকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন। আচ্ছা! ওদের জিজ্ঞেস করো, তোমাদের দাবী যদি সত্যি হয়, তবে তোমাদের পাপের কারণে তিনি তোমাদেরকে বারবার শাস্তি দিচ্ছেন কেন? না, আসল সত্য হলো, তোমরাও অন্যদের মতো আল্লাহর এক সৃষ্টি, এর বেশি কিছু নও। সুতরাং জেনে রেখো, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাউকে ক্ষমা করেন, আবার কাউকে চাইলে শাস্তিও দেন। মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এদুয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে, তার উপর সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। আর তাঁর দিকেই সবাইকে ফিরতে হবে। [৩১১]

---

[৩০৮] আল কুরআন, ৯:৩০

[৩০৯] হামিদা মুবাশ্বেরা, *শিকড়ের সন্ধানে*, (ঢাকা: সমকালীন প্রকাশন, ২০২০), পৃ. ৯২

[৩১০] তাবারী, *তাফসীরে তাবারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৮, পৃ: ৩৬৪

[৩১১] আল কুরআন, ৫:১৮

ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে। ওদের একদল নিজেদেরকে একমাত্র সঠিক দল বলে দাবি করার পাশাপাশি ওপর দলকে ভুল বা মিথ্যা বলে প্রচার করে। ইহুদিরা বলে বেড়াতো যে, খ্রিস্টানদের ধর্মের সঠিক কোনো ভিত্তি নেই। ওরা ধর্মের নামে মিথ্যাচার করছে। আবার খ্রিস্টানেরা বলতো, ইহুদি ধর্মের কোনো বর্তমান ভিত্তি নেই। যেহেতু আমরা ওদের পরবর্তী আসমানি ধর্ম, তাই ইহুদি ধর্মের এখন কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এভাবে এক ধর্মের অনুসারীরা অপর ধর্মের অনুসারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতো। এভাবে ধর্মীয় সমাজে একটা বিরুপ পরিবেশ বিরাজ করতো।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তখন এমন ধর্মীয় সামাজিক পরিবেশ মোকাবেলা করতে হলো। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করলেন। আল্লাহ ওহী নাযিল করে জানিয়ে দিলেন, ওদের কোনো ধর্মেরই এখন আর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। বিশেষ করে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কেউই আর সঠিক পথে ছিলো না।[৩১২] ওরা সকলেই মিথ্যাচারে ডুবে আছে। রোজ কেয়ামতের বিচারে আমিই ওদের ব্যাপারে ফয়সালা করে দিবো। এভাবে ইহুদি-খ্রিস্টানদের মোকাবেলায়, আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বকে শক্তি যোগালেন। কুরআন বলছে,

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

অর্থ: ইহুদিরা বলে খ্রিস্টানদের দ্বীনের কোনো সঠিক ভিত্তি নেই। আবার খৃষ্টানেরাও বলে, ইহুদিদের দ্বীনের কোনো সঠিক ভিত্তি নেই। অথচ এ উভয় দলই তাদের কাছে থাকা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে। ওদের দেখাদেখি যাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের কোনো জ্ঞান নেই– সে মুশরিকেরাও এমনসব দাবি করে বসে আছে। সুতরাং জেনে রেখো, ওরা সবাই যে দাবিতে মতোবিরোধ করছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ স্বয়ং সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিবেন।[৩১৩]

[৩১২] ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ১-৩, পৃ. ৩৬৭

[৩১৩] আল কুরআন, ২:১১৩

৫.২. ইহুদি-খ্রিস্টান আলেমদের অপকর্মের সমালোচনা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের সুমহান দাওয়াত পেশ করা শুরু করলে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের অনেকেই নবীজির কাছে আসেন দাওয়াতের বক্তব্য শুনতে। এ সময় তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করেন এবং এক পর্যায়ে যখন তারা এটা বুঝতে পারেন যে, তিনি সত্যিই আল্লাহর নবী, তখন তাদের অল্প কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে অধিকাংশ লোকেরাই ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এভাবে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের অনেকেই সাধারণ জনগনকে ইসলামের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়ায়।

এ সকল আলেমদের অধিকাংশ এতটাই দুনিয়া পুজারী ছিল যে, ওরা সাধারণ মানুষের ধনসম্পত্তি ধর্মের নামে নানাভাবে আত্মসাৎ করতো। ওরা সোনা এবং রুপার পাহাড় জমিয়ে রাখতো; কিন্তু তা থেকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে এক কানাকড়িও খরচ করতো না। ওরা নিজেদের জাগতিক স্বার্থের কারণে সাধারণ মানুষদেরকে আল্লাহর সঠিক কথা শুনতে এবং মানতে বাধা দিত। এভাবে একের পর এক জাগতিক লোভ-লালসার পড়ে এ সকল ইহুদি ও খ্রিস্টান আলেমেরা ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল আলেমদের প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। কুরআন এই ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নানা ধরনের তথ্য ও যুক্তি প্রমাণ দিয়ে সাহায্য করে। বলা যায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের সাহায্যে ওদের আসল চেহারা উন্মোচন করেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, আহলে কিতাবের অধিকাংশ আলেম ও দরবেশ লোকদের অবস্থা দেখো, ওরা নানা ছলেবলে ও কৌশলে মানুষদের ধন-সম্পদ হাতিয়ে নিচ্ছে এবং তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নানাভাবে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে ওরা সোনা রুপার পাহাড় জমাচ্ছে। অথচ তা থেকে আল্লাহর পথে এক কানাকড়িও খরচ করে না। কাজেই এসব নাফরমানদের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। [৩১৪]

যখন ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে ইসলামের নানা বিষয় আপত্তি উত্থাপন করা হচ্ছিল, তখন আল্লাহ তাআলা নিজেই ইহুদি এবং খ্রিস্টান আলেমদের বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলছেন, ওরা জাগতিক স্বার্থে এতটাই অন্ধ হয়ে গেছে যে, সাধারণ মানুষদেরকে হারাম খেতে ও

[৩১৪] আল কুরআন, ৯:৩৪

হারাম পথে চলতে বাধা পর্যন্ত দিচ্ছে না। যখন ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অধিকাংশ মানুষই একের পর এক অন্যায় অপরাধ ও জাহেলের জীবন যাপন করছে , তখন কেন ঐ সকল আলেমেরা তাদেরকে সত্যের পথে আহবান জানায় না? শ্রোতাদেরকে হারাম পথ পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে না?

এসব প্রশ্নগুলো একের পর এক আল্লাহ তাআলা পেশ করেছেন, যার ফলে খুব সহজেই ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের যে প্রচারণা ও প্রপাগান্ডা ছিল, তার প্রতিশোধ ও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। এভাবেই কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সকল মিত্যাচার ও অধর্মেল বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে।

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

অর্থ: দুর্ভাগ্য! ওদের উলামা ও ধর্মীয় প্রচারকেরা কেন ওদেরকে নাফরমানীর কথা বলতে এবং হারাম খেতে বাধা দেয় না? আফসোস! ওরা নিজেদের জীবন খাতায় যা কিছু রচনা করছে, তা কতোইনা নিকৃষ্ট! [৩১৫]

অতীতে যখন ইহুদিদের কাছে আসমানী কিতাব তাওরাত নাযিল করা হয়, সেখানে সত্যিকারের ইসলামের কথাগুলো লেখা ছিল। সেই সময়ের আলেম-ওলামা এবং ফকিহগন আসমানী কিতাবের আলোকেই বিচার ফায়সালা চালাতেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এখন আর সেই দিন নেই। বর্তমান সময়ের ইহুদি আলেম-ওলামাগন নিজেদের স্বার্থে আল্লাহর দ্বীনের কথাগুলোকে বদলে ফেলেছে।ওরা জাগতিক চাহিদার কারণে সামান্য ঘুষের বিনিময়ে ইসলামের বিধানগুলো বদলে দেন। এভাবে তারা ন্যায়-ইনসাফের পথ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তখন মদিনার অনেক ইহুদির বিচার ফয়সালা তিনি করতেন। ইহুদিরা আল্লাহর কিতাব তাওরাতের ভিত্তিতে সব সময় বিচার ফয়সালা করতো না। যদিও তাওরাত ছিলো নূর।[৩১৬] আল্লাহ তাআলা নবীজিকে কেবলমাত্র কুরআনের আলোকে বিচার ফয়সালা করার হুকুম দিলেন, যাতে করে সাধারণ মানুষেরা সত্য ও ন্যায়ের ফায়সালা পেতে পারে। এর মাধ্যমে একদিকে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর অকার্যকারিতা প্রমাণিত হয়, অপরদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব কে সঠিক ও সর্বগ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণ করা হয়।

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا

[৩১৫] আল কুরআন, ৫:৬৩

[৩১৬] তাবারী, *তাফসীরে তাবারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৯, পৃ: ৫

النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

অর্থ: আমি এসব লোকদের কাছে তাওরাত কিতাব পাঠিয়েছিলাম, তাতে ছিলো স্পষ্ট পথনির্দেশ ও দীপ্তময় আলো। এ কিতাবের নির্দেশানুযায়ী আল্লাহর অনুগত নবীগন, আলেমগন এবং ফকিহগন ওদের মধ্যে বিচার ফয়সালা চালাতেন। তারা সবাই ছিল আল্লাহর সে কিতাবের জিম্মাদার এবং লোকদের কাছে এর স্বপক্ষের সাক্ষী। সুতরাং তোমরা বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে মানুষকে ভয় করো না; বরং একমাত্র আমাকেই ভয় করো। আর খবরদার! সামান্য ঘুষের বিনিময়ে তোমরা আল্লাহর ন্যায়নীতি বিক্রি করে দিও না। মনে রেখো, আল্লাহর নাযিল করা বিধি-বিধান অনুযায়ী যারা বিচার করবে না, তারা নির্ঘাত কাফের বলে গণ্য হবে। [৩১৭]

আহলে কিতাব এর আলেমগন ছিল খুব চতুর ও বিকৃত রুচির অধিকারী। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরুদ্ধে মদিনার ইহুদি আলেমরা নানা ধরনের মিথ্যাচার ও কূটচাল পরিচালনা করতো। তারা সাধারণ মানুষদেরকে আল্লাহর দ্বীন থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে আশ্রয় নিত। কখনও কখনও নিজেদের অনুসারীদের বলতো, তোমরা প্রকাশ্যে সকাল বেলায় ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিবে, আবার সন্ধ্যাবেলা নিজেরা ইসলাম পরিত্যাগ করার ঘোষণা দেবে। এতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আবার কখনো তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যকে বিকৃত করে উপস্থাপন করতো। কখনো কখনো নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম যে কথাগুলো বলতে ভুল অর্থ তৈরি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করতো।

এরা অনেক সময় নবীজিকে এমন শব্দ দ্বারা ডাকতো যার অর্থ হত খারাপ। এমনকি নবীজিকে যখন সালাম দিতো, তখনও ভুল অর্থ তৈরি করে দিতো। ওরা বলতো, আস সামু আলাইকুম,যার অর্থ হলো, তোমার মৃত্যু হোক। কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের এমন আচরণকে তীব্রভাবে ঘৃণা করেছেন। এই আচরণের মাধ্যমে তারা সত্য ন্যায় থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। এভাবে ইহুদি আলেমদের নানা ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ খোদ কুরআন নিজেই করেছে। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সহজেই ইহুদিদের নানা ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছেন।

مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ

[৩১৭] আল কুরআন, ৫:৪৪

وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٤٦﴾

অর্থ: সাবধান! ইহুদিদের কেউ কেউ কথা বলার সময় বিকৃত উচ্চারণের মাধ্যমে শব্দের অর্থ বদলে দেয়। ওরা তোমাদের সামনে বলে, আমরা শুনলাম কিন্তু এরপরে উচ্চারণ বিকৃত করে বলে– আমরা অমান্য করলাম। ওরা নিজেদের লোকদের বলে, তোমরাও আমাদের মতো কেবল শোনার ভান করো। সত্যদ্বীনের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ প্রকাশের জন্যে ওরা নিজেদের জিহ্বাকে কুঞ্চিত করে রসুলকে 'রাইনা' বলে ডাকে। যার আসল অর্থ করে 'হে আমাদের রাখাল'। আফসোস! ওরা যদি সত্যিসত্যি বলতো, হে রসুল, আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। হে রসুল, আপনি আমাদের কথা শুনুন এবং আমাদের দিকে খেয়াল রাখুন, তবে সেটা ওদের জন্যে কতোইনা ভালো ও ন্যায়সঙ্গত হতো। কিন্তু সত্যকে ছুড়ে ফেলার অপরাধে ওদেরকে আল্লাহর লানত ঘিরে ধরেছে। ফলে ওদের খুব কম লোকই সত্যপথে ফিরে আসবে। [৩১৮]

৫.৩. ইহুদি-খ্রিস্টানদের অতীত স্মরণ করিয়ে সতর্ককরণ

আহলে কিতাবদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পূর্ববর্তী জীবনের ঘটনা প্রবাহের আলোকপাত করেছেন। আর এই আলোচনাটি তিনি করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র কুরআনের জ্ঞান এর কারণে। বনি ইসরাইলের কাছ থেকে আল্লাহ তাআলা অনেকবার অনেক বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে, তারা সব সময় আল্লাহর এবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে ,যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহর জন্য তারা সবসময় নিবেদিত থাকবে। সময়ের পরিবর্তনে বনি ইসরাইলের অনেক মানুষই সে অঙ্গীকারের কথা ভুলে গিয়েছিলো। বাস্তবে ওই অঙ্গীকারের কথা গুলোই ইসলামের মৌলিক কথা। এইভাবে কুরআন এর সহযোগিতায় নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে দ্বীনের পথে আহবান করার সুযোগ পেলেন।

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ

[৩১৮] আল কুরআন, ৪:৪৬

قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

অর্থ: শোনো! আল্লাহ এক সময় বনি ইসরাইলদের থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিলেন। এ সময় ওদের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণের জন্যে ওদের মধ্য থেকে বারোজন নকীব নিযুক্ত করলেন। আল্লাহ ওদেরকে আশান্বিত করে বললেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। শুনে রেখো, তোমরা যদি ঠিকঠাকভাবে নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, তোমাদের কাছে আসা আমার রসুলদের কথা মেনে চলো ও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসো এবং আল্লাহর জন্যে করযে হাসানা দান করো– তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপগুলোকে ধুয়েমুছে সাফ করে দেবো এবং তোমাদের এমন জান্নাতের মেহমান বানাবো, যার তলদেশে ঝর্নাধারা বয়ে গেছে। কিন্তু ভালোকরে মনে রেখো, এরপরেও তোমাদের কেউ যদি কুফরির পথে হাটে, তবে সে নিজেই সরল-সঠিক পথ হারানোর জন্যে দায়ী থাকবে। [৩১৯]

এমনকি ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে তাদের আসমানি কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিল শরীফ এর আমলও তেমন একটা ছিল না। ওরা নিজেদের স্বার্থে আসমানী কিতাবের বর্ণনায় পরিবর্তন আনতো। ওদের এমন আচরণের প্রতিবাদে মহান আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, যতক্ষণ না তোমরা সত্যিকার অর্থে তাওরাত ও ইঞ্জিল এর বিধানাবলী নিজেদের মধ্যে প্রয়োগ করবে, ততক্ষণ তোমরা আল্লাহর প্রিয় হতে পারবে না। ইসলামের বিরোধিতা করতে ওরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলো, কুরআনের সাহায্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খণ্ডন করতে পারলেন।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

অর্থ: কিতাবওয়ালাদের পরিষ্কার ভাষায় বলে দাও, তোমরা ততদিন নিজেদেরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দাবী করতে পারো না, যতদিন না তাওরাত, ইনজিল ও তোমাদের প্রভুর দেওয়া অন্যান্য কিতাবগুলোকে তোমাদের মধ্যে ঠিকঠাকভাবে প্রতিষ্ঠা করো। হে নবী, আসলে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার কাছে কিতাব আসায়, ওদের অনেকেরই গোয়ার্তুমী ও কুফরি আচরণ বেড়ে গেছে। তাই এ ধরনের অবিশ্বাসী কাফেরদের আচরণে তুমি দুঃখ পেও না। [৩২০]

[৩১৯] আল কুরআন, ৫:১২

[৩২০] আল কুরআন, ৫:৬৮

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গী-সাথীরা আহলে কিতাবের লোকদেরকে দ্বীনের পথে অবিরত দাওয়াত দিয়েছেন। তাদেরকে নানাভাবে ইসলামের সঠিক বার্তাগুলো বুঝিয়েছেন এবং এও বলেছেন, এই কথাগুলোই তোমাদের কিতাবের মূল কথা। অথচ তোমরা এমন সব লোকদের কথা মেনে চলছো, যা তোমাদের আসল কেতাবের পরিপন্থী । দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা পূর্ববর্তী এমন অনেক মানুষের বক্তব্যকেই আল্লাহর বক্তব্য হিসেবে ধরে নিয়েছো, যারা সত্য সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছে। এভাবে তোমরা সত্য দ্বীন থেকে দূরে সরে গেছো। কাজেই এখন ইসলামই একমাত্র তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত জীবনাদর্শ। এভাবে কুরআনের মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদি-খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিতে সক্ষম হয়েছেন।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

অর্থ: এসব কিতাবওয়ালাদের বলো, খবরদার! নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা খামাখা বাড়াবাড়ি করো না। এসব বিষয়ে তোমাদের পূর্ববর্তী ভ্রান্ত লোকদের মনগড়া মতবাদের অনুসরণ করো না। কেননা তারা নিজেরাতো পথভ্রষ্ট ছিলোই, তদুপরি আরো বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। আসলে ওরা সত্য পথের ধারে-কাছেও ছিলো না। [৩২১]

لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

অর্থ: দেখো, তোমাদের কিংবা কিতাবওয়ালাদের কারও খেয়ালখুশির উপরই লোকদের পরিণতি নির্ভর করে না। যে পাপ করবে, সে তার ফল ভোগ করবেই। সে আল্লাহর মোকাবেলায় কাউকে তার বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে পাশে পাবে না। [৩২২]

নবীজির সময় অনেক ইহুদি ও খ্রিস্টান আলেমেরা জেনে-বুঝে আল্লাহর দ্বীনের বিবৃতি করতো। ওরা নিজেদের স্বার্থে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করতো। সাধারণ মানুষকে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিলিয়ে প্রচার চালাতো। এতে সাধারণ মানুষ কিছুটা বিভ্রান্ত হতো। মহান আল্লাহ ওদের এমন আচরণের সমালোচনা করে বলেন, যখন তোমরা জানো এটা সত্য, তাহলে কেন তোমরা মিথ্যাচার করছো? সত্যের গায়ে মিথ্যার পোশাক কেন পরিয়ে দিচ্ছো? এভাবে একের পর এক ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের চক্রান্ত কে কুরআন প্রকাশ করে দিয়েছে। ফলে খুব সহজেই ওদের উপরে নবীজির নেতৃত্ব শক্ত ও সফলভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

---

[৩২১] আল কুরআন, ৫:৭৭

[৩২২] আল কুরআন, ৪:১২৩

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

অর্থ: হে কিতাবওলারা, এ তোমাদের কেমন আচরণ, তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করে তুলছো? এমনকি কখনো কখনো সবকিছু জেনে-বুঝেও সত্যকে লুকিয়ে যাচ্ছো। [৩২৩]

অর্থ: হে কিতাবওলারা, তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে চলছো? অথচ তোমরাই এসবের সত্যতার সাক্ষী হয়ে আছো। [৩২৪]

৫.৪ ইবরাহিম আ. কে নিয়ে ইহুদি-খ্রিস্টানদের মিথ্যা দাবির প্রতিখণ্ডন

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন ইসরাইল বা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এর দাদা। অর্থাৎ বনি ইসরাইল মূলত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর বংশধর। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান– সকল ধর্মেরই আদি পুরুষই ছিলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ।

আল্লাহ তাআলা যখন কুরআনে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর আদর্শ গ্রহণের জন্যে মুসলমানদেরকে নির্দেশে দিয়েছেন, তখন ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা নিজেদেরকে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর অনুসারী বলে দাবী করে। ফলে ওরা বুঝাতে চায় যে, আমরাতো আগে থেকেই ইবরাহিমের আদর্শের উপরে রয়েছি, তথা সত্যের পথে রয়েছি। ওরা এও দাবী করে যে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন ওদের ধর্ম বিশ্বাসের অনুরসারী।

আল্লাহ তাআলা ওদের এই বিভ্রান্তিমূলক কথার যৌক্তিক প্রতিবাদ নবীকে শিখিয়ে দিয়েছেন। যখন তাওরাত ও ইনজিল কিতাব ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর ওফাতের অনেক পরে নাযিল হয়েছে, তখন কিভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এই কিতাবের অনুসারী হতে পারেন? কিভাবে তিনি ওদের দলভুক্ত হতে পারেন? এভাবে কুরআন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহলে কিতাবদের মিথ্যাচারের প্রতিরোধে সঠিক নেতৃত্ব দিতে সহায়তা করে।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

[৩২৩] আল কুরআন, ৩:৭১

[৩২৪] আল কুরআন, ৩:৭০

অর্থ: হে কিতাবওলারা, ইবরাহিম তোমাদের কাদের দলের লোক ছিলো, তা নিয়ে তোমরা কেন বিতর্ক করছো? অথচ তাওরাত ও ইনজিল নাযিলের বহু আগে সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তোমাদের কি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও নেই? [৩২৫]

বাস্তবে ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা সাধারণ মানুষদের বলতো, সত্যের পথে থাকলে চাইলে তোমাদেরকে আমাদের পথে আসতে হবে। অর্থাৎ মুসলমান না হয়ে; বরং ইহুদি বা খ্রিস্টান হতে হবে। এভাবে তারা নিজেদেরকে একমাত্র সত্যপন্থী ধর্মাশ্রয়ী দল বলে প্রচার করতো। মহান আল্লাহ ওদের এমন মিথ্যাচারের জবাবে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শিখিয়ে দিলেন যে, বরং তুমি বলো, সত্যের পথে থাকতে হলে ইবরাহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন আদর্শে ফিরতে হবে।

এই ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর জীবনাদর্শের কথা বলে একদিকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের এই বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে, তোমরা সত্যের পথ থেকে বহু দূরে সরে গেছো। অপরদিকে মুসলমানেরাই যে একমাত্র সত্যের অনুসারী তাও প্রমাণ করা হলো। এভাবে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের সকল প্রপাগাণ্ডাকে সহজভাবেই মোকাবেলা করতে পারলেন। বস্তুত কুরআনের নির্দেশনা ও সহযোগিতা ছাড়া খুব সহজে ইহুদি-খ্রিস্টানদের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করা নবীজির পক্ষে সম্ভব হতো না। আল্লাহর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা নিয়ে তিনি একজন সফল নেতা হতে পেরেছেন।

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾

অর্থ: ইহুদিরা বলে, ইহুদি ধর্ম মেনে নাও তাহলে সত্য সঠিক পথ পাবে। আবার খ্রিস্টানেরা দাওয়াত দিয়ে বলে, সঠিক পথে থাকতে হলে খ্রিস্টান হয়ে যাও। তুমি ওদের পরিষ্কার ভাষায় বলো, না! তোমাদের পথে নয়; বরং এসব ছেড়ে একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের জীবনাদর্শেই রয়েছে সঠিক পথ। আর শুনে রেখো, ইবরাহিম কখনো মুশরিকদের দলে ছিলো না। [৩২৬]

৫.৫. খ্রিস্টানদের ভালো দিকের মূল্যায়ন

কুরআন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বন্ধু নির্বাচনের ব্যাপারেও পরামর্শ দিয়েছে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কাদেরকে তুলনামূলক একটু কাছে বা ভালো পাওয়া যাবে, তা জানিয়েছে। কুরআনের ভাষায়, ইহুদি ও মুশরিকেরা মুসলমানদের সাথে সর্বদা শত্রুতা বজায় রাখবে। পক্ষান্তরে

[৩২৫] আল কুরআন, ৩:৬৫
[৩২৬] আল কুরআন, ২:১৩৫

খ্রিস্টানদের মধ্যে এখনো কিছু ভালো দিক রয়েছে। বিশেষকরে ওদের ধর্মীয় গুরুরা অন্যদের তুলনায় বেশি পরহেজগার। কুরআন বলছে,

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

অর্থ: জেনে রেখো, মানুষের মধ্যে এসব ইহুদি ও মুশরিকেরা ঈমানদারদের জন্যে সবচেয়ে বড় শত্রু। তবে যারা নিজেদের নাসারা বা খ্রিস্টান বলে পরিচয় দেয়, তুলনামূলক তাদেরকে তোমরা বন্ধু হিসাবে পাবে। কারণ ওদের মধ্যে এখনো কিছু ইবাদতকারী আলেম ও নির্লোভ দরবেশ লোক রয়েছে। তাছাড়া ওরা আত্ম অহংকারী নয়। [৩২৭]

খ্রিস্টান আলেম-ওলামাদের ব্যাপারে কুরআনের এই উক্তি উল্লেখযোগ্য,

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾

অর্থ: তোমরা দেখবে, এসব খ্রিস্টান আলেম ও দরবেশেরা আমার এ রসুলের কাছে আসা কুরআনের পাঠ শুনে অশ্রুসিক্ত হয়। কারণ তারা সত্যকে চিনতে পারে। ফলে তারা দোয়া করে, হে আমাদের রব, আমরা সত্যের প্রতি ঈমান আনছি। অতএব আমাদেরকেও সাক্ষ্যদাতা হিসাবে কবুল করো। ৮৪. তারা আরো বলে, যখন আমাদের জীবনের লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহর নেক বান্দা হওয়া, তখন কেন আমরা আল্লাহকে মেনে নেবো না? কেন আমাদের কাছে আসা এ সত্যকে অনুসরণ করবো না? [৩২৮]

৫.৬. ইহুদি-খ্রিস্টানদের ব্যাপারে মুসলমানদের নীতি নির্ধারণ

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কিভাবে নির্ণিত হবে, তা কুরআন আমাদেরকে শিখিয়েছে। অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব তৈরি করার ক্ষেত্রে ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা কখনোই বিশ্বস্ত নয়। ওরা নিজেদেরকে যতোটা আপন মনে করে, ঈমানদেরকে ততোটা কখনো মনে করে না; বরং ওরা যখনই সুযোগ পায়, ঈমানদের ক্ষতি করতে ছাড়ে না। এ কারণে আল্লাহ তাআলা কঠিন ভাষায় সতর্ক করে বলেছেন, যদি ওদের কারো সাথে মুসলমানদের কেউ অন্তরঙ্গ বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে সম্পর্ক

[৩২৭] আল কুরআন, ৫:৮২
[৩২৮] আল কুরআন, ৫:৮৩

করে, তবে সে আর মুসলমানদের সদস্য বলে আল্লাহর দৃষ্টিতে গণ্য হবে না; বরং ঐ দলের সদস্য বলে গণ্য হবে।

কুরআনের এই সুস্পষ্ট নির্দেশনার কারণে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সহজেই ইহুদি-খ্রিস্টানদের মোকাবেলা করতে পেরেছেন। এ সময় তার সকল সাহাবীগন ঐক্যবদ্ধভাবে নবীজির পাশে ছিলো। কারণ তারা আগে থেকেই এ ব্যাপারে সত্য জানতে পেরেছিলো। ফলে তাদের কাউকেই ওরা নিজেদের প্রতারণার জালে আটকাতে পারেনি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, খবরদার! কখনোই তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাবে না। কেননা ওরা তোমাদেরকে নয়; বরং কেবল নিজেদের লোকদেরকেই বন্ধু মনে করে। অতএব মনে রেখো, তোমাদের কেউ যদি ওদেরকে বন্ধু হিসাবে বেছে নেয়, তবে সে ওদেরই একজন বলে গণ্য হবে। ভুলে যেও না, যালেমেরা কখনোই আল্লাহর দেখানো সত্য-সঠিক পথ খুঁজে পায় না। [৩২৯]

কুরআন মুসলমানদেরকে একেবারে খুলে খুলে জানিয়ে দিয়েছে যে, কেউ ওদের মতো ইহুদি বা খ্রিস্টান না হলে, ওরা কাউকে আপন মনে করে না। ওরা অন্তর দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করবে না। ফলে ওদের কাছ থেকে আন্তরিক সম্পর্ক প্রত্যাশা করা অনেকেটা মরুভূমির বালু রাশিতে সুপেয় পানি খোঁজার মতো। বাস্তবে মুসলমান থাকার পরেও যারা ওদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চায়, তারা উভয় কুল হারাবে। না তারা ওদের বন্ধুত্ব পাবে, আর না ওরা আল্লাহর দয়া-সাহায্য পাবে। কাজেই তোমরা ওদেরকে পরিত্যাগ করো এবং তোমাদের প্রভুর সন্তুষ্টির পিছনে লেগে যাও।[৩৩০]

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

অর্থ: হে নবী, যতক্ষণ তুমি ইহুদি বা খ্রিস্টানদের দ্বীন গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ ওরা তোমার প্রতি খুশি হবে না। ওদের পরিষ্কার বলে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহর দেখানো পথই একমাত্র গ্রহণীয় পথ। হে নবী, তোমার কাছে সত্য জ্ঞান থাকার পরেও যদি ওদের কামনা-বাসনা অনুযায়ী চলতে থাকো, তবে মনে রেখো, আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমায় বাঁচানোর জন্যে কোনো বন্ধু থাকবে না। এমনকি, কোনো সাহায্যকারীও পাবে না। [৩৩১]

---

[৩২৯] আল কুরআন, ৫:৫১

[৩৩০] ইবনে কাসীর, *তাফসীরে ইবনে কাসীর*, প্রাগুক্ত, খন্ড: ১-৩, পৃ. ৩৮৪

[৩৩১] আল কুরআন, ২:১২০

অধ্যায়: ৬

সমাজ সংস্কারে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন মহান সমাজ সংস্কারক। প্রাক-ইসলামী যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। গোত্র কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, হানাহানি, সামাজিক বিশৃঙ্খলার নৈরাজ্য পূর্ণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল গোটা সমাজ। সামাজিক সাম্য- শৃঙ্খলা, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, নারীর মর্যাদা ইত্যাদির কোনো স্থায়িত্বই ছিল না। জঘন্য দাসত্ব প্রথা, সুদ, ঘুষ, জুয়া- মদ, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, পাপাচার, অন্যায়-অত্যাচারের চরম তীব্রতায় সমাজ কাঠামো ধসে পড়েছিল, এমন এক দুর্যোগময় যুগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাব।

তিনি আরবের বুকে বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করে বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয় খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে নবুওতের আলোকে উদ্ভাসিত করেন। ইসলামেও সমাজ সে কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে সালাত, হজ্জ, জিহাদ ও অর্থ ব্যয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিধানই সমাজ সমষ্টির ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত।[৩৩২] বাস্তবিকই ইসলামী চিন্তা ও কর্মব্যবস্থা সমাজবদ্ধ জীবনের কর্তৃত্বশূন্য নয়; বরং সেখানে গুরুত্ব ও দাবীসমূহ অপরিসীম বলে স্বীকৃত।[৩৩৩]

৬.১. তাওহিদের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ গঠন

ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানা অনাচার, পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে সমগ্র সমাজ-সংগঠনকে এক আল্লাহে বিশ্বাসী তাওহিদের আদর্শে সমাজকে নবরূপে রূপায়িত করেন। সকল ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের উৎস একমাত্র আল্লাহকেই মেনে নিয়ে সমাজের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার ব্যবস্থা করেন। কুরআনে কুরআনে তাওহীদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। মানব সমাজকে তাওহিদের রঙে সাজানোর জন্যে আল্লাহ তাআলা শুরু থেকেই নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নানাভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন। কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে এ ব্যাপারে,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

অর্থ: আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহর। বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না।'[৩৩৪]

---

[৩৩২] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ১০৯

[৩৩৩] সদরুদ্দিন ইসলাহী, ইসলামের সমাজ দর্শন, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫) পৃ. ২৫

[৩৩৪] আল কুরআন, ৩১:২৫

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ: 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।'[৩৩৫]

وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً

অর্থ: ''আর ইবাদত কর আল্লাহর, শরিক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে''।[৩৩৬]

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلاّ أَنَا فَاعْبُدُونِ

অর্থ: আপনার পূর্বে আমি যে রাসুলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর''।[৩৩৭]

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمّةٍ رَسُولاً أَنْ اُعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاغُوتَ

অর্থ: 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাকো''।[৩৩৮]

এই আয়াতের মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যে, মহান আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী সমাজব্যবস্থা তৈরীর জন্য নানাভাবে নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

৬.২. সংঘাতমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা

তৎকালীন আরবের বিভিন্ন গোত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকত। সামান্য অজুহাতে ভয়াবহ যুদ্ধের দামামা বাজত, আর দীর্ঘকাল যাবৎ তা দাবানলের মতো জ্বলতে থাকত। রক্তপাত ও লুণ্ঠন ছিল তাদের নিত্যদিনের পেশা। হজরত মুহাম্মদ (সা.) এসব অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কিশোর বয়সেই শান্তি সংঘ 'হিলফুল ফুজুল' এবং পরে 'মদিনা সনদ'-এর মাধ্যমে সমাজে শান্তি আনয়ন করেন।

সংঘাত মুক্ত সমাজ গঠনে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছে। একদিকে সাধারণ মানুষদেরকে সংঘাতমুক্ত হওয়ার জন্য মানবিক

[৩৩৫] আল কুরআন, ১:১
[৩৩৬] আল কুরআন, ৪:৩৬
[৩৩৭] আল কুরআন, ২১:২৫
[৩৩৮] আল কুরআন, ১৬:৩৬

গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, অন্যদিকে সমাজে রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাসকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এভাবে কুরআনের সহযোগিতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব অল্পসময়ের মধ্যেই একটি শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন, যা এই পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল ঐতিহাসিক ঘটনা। নবীজির দাওয়াতের একটি মূল স্তম্ভ ছিলো সামাজিক ন্যায়বিচার।[৩৩৯]

وَلَا تُفْسِدُوا فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ

অর্থ: 'পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর এতে তোমরা বিপর্যয় ঘটাবে না।'[৩৪০]

وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ

অর্থ: 'ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।'[৩৪১]

৬.৩. সমাজে মানুষের মৌলিক মানবীয় গুণের বিকাশ সাধন

আল কুরআনের লক্ষ্যবস্তু মানুষ। পবিত্র কুরআনের বহুমুখী নির্দেশনার প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় মানুষের আনাগোনা রয়েছে। তাই নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের স্বাভাবিক জীবনঘনিষ্ঠ নিয়ম-কানুনেরই সমন্বিত ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা শিখিয়েছেন, যা তিনি কুরআনের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। কুরআন মুসলমানদেরকে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। জীবনের সফলতার সন্ধ্যান দেয়।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

অর্থ: 'তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি! তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।[৩৪২]

প্রাকৃতিক গুণাবলির মাধ্যমে মানুষ অন্য সব সৃষ্ট জীব ও প্রাণিকুল থেকে আলাদা। মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক চেতনায় মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। প্রাকৃতিক গুণাবলির সঠিক ব্যবহারেই জীবনের সফলতা এবং এর ভুল ব্যবহারই ব্যর্থতা। এ কারণেই মহান আল্লাহ নবীজির মাধ্যমে আমাদের জানাচ্ছেন,

---

[৩৩৯] আব্দুর রহমান আযযাম, *মহানবী (সা.) এর শাশ্বত পয়গাম*, (ঢাকা: ই.ফা.বা, ১৯৮০), পৃ. ৭৬

[৩৪০] আল কুরআন, ৭:৫৬

[৩৪১] আল কুরআন, ২:১৯১

[৩৪২] আল কুরআন, ৩:১১০

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

অর্থ: 'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।'[৩৪৩]

৬.৪. ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ, সংঘাত-সহিংসতা, প্রতিহিংসা ও শত্রুতা বিরাজ করছিল। কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি, খুনোখুনি ও বিনা কারণে রক্তপাত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। প্রতিশোধ গ্রহণই ছিল তাদের নেশা। ফলে গোটা আরব জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এহেন নিশ্চিত ধ্বংসোন্মুখ কঠিন অবস্থা থেকে তাদের ইসলামই রক্ষা করেছিল। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলার কাজ করেন। আর এ কাজে কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনা তাকে সহযোগিতা করে।

কুরআন ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

অর্থ: নিশ্চয়ই মুমিনেরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক সংশোধন করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো। এভাবে তোমরা রহম পাবে।[৩৪৪]

মহানবী (সা.) নিজেও বিদায় হজের ভাষণে বলেছিলেন, 'অনারবদের ওপর আরবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং আরবদের ওপরও অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।'

৬.৫. অশ্লীলতা রোধ

অশ্লীলতা খুবই মারাত্মক একটি রোগ। কোনো সমাজকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এমন একটি রোগই যথেষ্ট। ইতিহাসে অশ্লীলতা মানব সভ্যতার জন্যে সব সময়ই ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত

[৩৪৩] আল কুরআন, ১০৩:১-৩
[৩৪৪] আল কুরআন, ৪৯:১০

হয়েছে। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দাওয়াতি কাজ শুরু করেন, তখন আরবে অশ্লীলতা ছিলো খুবই স্বাভাবিক। চারদিকে অশ্লীলতা ছড়িয়ে ছিলো। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সামগ্রিক আন্দোলন করেছেন। অশ্লীলতার সকল পথ ও পন্থাকে তিনি নিষিদ্ধ করেছেন। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বড় সহায়ক ছিলো কুরআন। কুরআন অসংখ্য জায়গায় অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কুরআনের এই ঘোষণায় নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত খুব সহজেই মানুষের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে। কুরআন বলছে,

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

অর্থ: তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। অবশ্যই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পন্থা।[৩৪৫]

ইসলাম প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

অর্থ: লজ্জাকর কার্যে জড়িত হয়ো না, সে প্রকাশ্যেই বা গোপনে।[৩৪৬]

অশ্লীল কর্ম সমাজে ছড়িয়ে দেওয়াও মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَـٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

অর্থ: যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার লাভ করুক তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানে, তোমরা জান না।[৩৪৭]

এমনকি, মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে, যাতে তার চোখ খারাপ কিছু না দেখে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

[৩৪৫] আল কুরআন, ১৭:৩২
[৩৪৬] আল কুরআন, ৬:১৫১
[৩৪৭] আল কুরআন, ২৪:১৯

অর্থ: মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।"[৩৪৮]

৬.৬. নারীর মর্যাদা নিশ্চিতকরণ

আরবে তখন নারীদের তেমন কোনো মর্যাদা বা অধিকার ছিলোই না। পুরুষেরা নারীদেরকে নিম্ন শ্রেণির মানুষ বানিয়ে রেখেছিলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই প্রথম নারীদেরকে প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। এই সম্মান প্রদানের পিছনে সবচেয়ে বড় ভুমিকা ছিলো কুরআনের। মানব জাতির উপর কুরআনই সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে 'নিসা' অর্থাৎ 'মহিলা' শব্দটি ৫৭ বার এবং 'ইমরাআহ' অর্থাৎ 'নারী' শব্দটির ২৬ বার উল্লেখ হয়েছে। পবিত্র কুরআনে 'নিসা' তথা 'মহিলা' শিরোনামে নারীর অধিকার ও কর্তব্যসংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ সূরাও রয়েছে। আরবের তৎকালীন নানা অসংগতি থেকে কুরআনের নির্দেশনার আলোকে নবীজি নারী মুক্তির কাজে সফল হয়েছেন। ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়কে সমানভাবে সম্বোধন করেছে। মানবিক মর্যাদা থেকে শুরু করে অপরাধ দণ্ডবিধি পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে উভয়কে সমান দৃষ্টিতে দেখেছে।[৩৪৯]

ক. বেঁচে থাকার অধিকার

ইসলাম-পূর্ব নারীরা ছিল চরম অবহেলিত, ঘৃণিত। কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদ শোনামাত্র তাদের মুখ অন্ধকার ও মলিন হয়ে যেত। এমনকি কন্যাসন্তানকে জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্মম ঘটনাও ঘটেছিল সে সময়। মেয়েদের প্রতি তাদের এই ঘৃণ্য আচরণের নিন্দা জানিয়ে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

[৩৪৮] আল কুরআন, ২৪:৩০

[৩৪৯] আবদুল হালীশ আবু শুক্কাহ, *রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৯৯৫) পৃ. ৭৮

অর্থ: 'তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তার থেকে বাঁচতে সে নিজ সমপ্রদায় থেকে আত্মগোপন করে; সে চিন্তা করে যে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে দেবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে, তা কতই না নিকৃষ্ট। ৩৫০'

খ. উপার্জিত সম্পদে মালিকানার অধিকার

তৎকালীন সময়ে নারীদের জন্তু-জানোয়ারের মতো কেনাবেচা হতো। মিরাস (উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি) তো পেতোই না; উপরন্তু তারাও মিরাস হিসেবে বণ্টিত হতো। তারা অধিকারী ছিল না; ছিল অধীনস্থ। এমনকি স্বীয় উপার্জিত সম্পদে তাদের মালিকানা ছিল না, উপার্জন করে আনলেও স্বামীরা লুট করে নিত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবস্থা থেতে তাদের মুক্তি দিলেন। কুরআন তাদের অধিকারের জন্যে বললো,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ

অর্থ: পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।[৩৫১]

গ. হালাল-হারামের বিধানে বৈষম্য পরিহার

জাহিলি যুগে এমন অনেক নিয়ম ছিলো, যা নারী-পুরুষে বৈষম্য তৈরি করতো। পুরুষের জন্যে এমন অধিকার রয়েছে, যা নারী পেতে পারে না। এমনকি খাবারের ক্ষেত্রেও এমন বৈষম্যনীতি ছিলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই বিভাজন দূর করেন। কুরআন তাকে এ কাজে সাহায্য করেছে। যেমন,

وَقَالُوا۟ مَا فِى بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلْأَنْعَٰمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾

অর্থ: 'তারা বলে, এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য এবং আমাদের মহিলাদের জন্য হারাম। যদি তা মৃত হয়, তবে তার প্রাপক হিসেবে সবাই সমান। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের বর্ণনার শাস্তি দেবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।[৩৫২]

---

৩৫০ আল কুরআন, ১৬:৫৮-৫৯

৩৫১ আল কুরআন, ৪:৩২

৩৫২ আল কুরআন, ৬:১৩৯

ঘ. পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার

জাহেলী যুগের আরবের নারীরা কখনোই তাদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে কোন অধিকার পেত না। যুগ যুগ ধরে কেবল পুরুষের এই সকল সম্পত্তির মালিক হতো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলী পদ্ধতির পরিবর্তন করেন। তিনি কুরআনের নির্দেশনার আলোকে নারীকে পুরুষের মতই পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান করেন। কুরআন বলছ,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

অর্থ: 'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশি। এ অংশ নির্ধারিত।[৩৫৩]

ঙ. মোহরের মাধ্যমে সম্মান প্রদান

জাহেলী যুগের নারীদের পুরুষরা যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করতো। পুরুষেরা যখন চাই বিয়ে করতেন, আবার মনে হলে তালাক দিয়ে দিতেন। এভাবে একজন নারী নিগৃহীত জীবন যাপন করতেন। নারীদেরকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মান দিলেন। বিয়েতে নারীর জন্য মহর পাওয়া তার অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত করবেন।

وَءَاتُوا ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

অর্থ: আর তোমরা স্ত্রীদের তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশিমনে। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো।[৩৫৪] '

[৩৫৩] আল কুরআন, ৪:৭

[৩৫৪] আল কুরআন, ৪:৪

চ. নারীর সম্পদে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ

নারী যা কিছু উপার্জন করবে তার মালিক নারী হবে, একইভাবে পুরুষ যা উপার্জন করবে তার মালিক পুরুষই হবে। এভাবে ইসলাম নারী এবং পুরুষের উপার্জনের উপর তাদের মালিকানা স্বীকার করেন

পবিত্র কুরআনে বলছে,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ

অর্থ: 'হে ঈমাণদাররা, বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়।[৩৫৫]'

৬.৭. দাসদের অধিকার নিশ্চিতকরণ

ইসলাম-পূর্ব পৃথিবীতে দাস-দাসীদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। সাধারণত মালিকেরা তাদেরকে মানুষ হিসেবে তেমন কোনো অধিকারই দিত না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম দাস দাসীদেরকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা ও অধিকার দেওয়ার কথা বলেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে অনেক আয়াত নাযিল করেন। এভাবেই একসময় দাস-দাসীরা তাদের মৌলিক অধিকার লাভ করে। কুরআন মালিকদের উদ্দেশ্যে বলছে,

وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلرِّزْقِ ۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا۟ بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

অর্থ: আল্লাহ তাআলা জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্টত্ব দিয়েছেন। অতএব যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করে।[৩৫৬]

[৩৫৫] আল কুরআন, ৪:১৯

[৩৫৬] আল কুরআন, ১৬:৭১

৬.৮. দরিদ্র-মিসকিনদের পুণর্বাসন

মানুষেরা মানুষের জন্যে কাজ করবে- এটাই স্বাভাবিক। প্রাকৃতিক নিয়মেই কিছু মানুষ অন্যের উপর কখনো কখনো নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। সমাজের সবাই স্বচ্ছল নাও হতে পারে। অসহায় দরিদ্র শ্রেণির পাশে স্বচ্ছল শ্রেণির মানুষদের সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়ানো উচিত। বিশেষকরে শ্রমিক শ্রেণির সাথে সর্বদা ন্যায় আচরণ করা ইসলামের শিক্ষা।[৩৫৭]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাথীদের মাধ্যমে এই শিক্ষা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। তিনি ও তাঁর সাহাবীগন সমাজের দুস্থ অসহায়দের পাশে সব সময় দাড়িয়েছেন। আর এই কাজে কুরআন তাদেরকে সর্বদা উৎসাহ ও নির্দেশনা দিয়েছে। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ এমন কথা বলেছেন। যেমন,

كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾

অর্থ: কখনো যেন এরূপ না হয় যে, তোমরা ইয়অতিমদের সম্মান করা না; আর মিসকিনদের খাদ্যদানে (অন্যকে) উৎসাহিত কর না।[৩৫৮]

৬.৯. এতিমদের অধিকার সংরক্ষণ

এতিমদের প্রতি আল্লাহ এবং তার রসুল খুবই আন্তরিক। তাই কুরআন এবং হাদিসে এতিমদের সম্পর্কে অসংখ্য আলোচনা রয়েছে। এমনকি খোদ নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম জীবনের প্রথম সময়ে তিনি এতিম ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে এতিমদের জন্য অনেক কাজ করেছেন। কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ব্যাপারে অনেক নির্দেশনা দিয়েছে। কুরআনে এতিমের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

অর্থ: তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। কোনো কিছু তাঁর সঙ্গে শরিক করবে না। আর মাতা-পিতা, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথি, মুসাফির ও তোমাদের

[৩৫৭] মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার*, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ২৩
[৩৫৮] আল কুরআন, ৮৯:১৭-১৮

অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[৩৫৯] '

অনেকে এতিম শিশুকে ধমক দেয়। তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে। এ বিষয়ে কুরআনের শক্ত কথা হলো,

فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾

অর্থ: 'সুতরাং তুমি এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না।[৩৬০]

এমনকি যারা এতিমের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, কুরআনে তাদের ঈমান ও আমল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বলছে,

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾

অর্থ: তুমি কি দেখেছ তাকে, যে দ্বিনকে অস্বীকার করে? সে তো সে-ই, যে এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।[৩৬১]

কুরআন এতিমের সেবাকে একটি মহৎ পুণ্যের কাজ বলছে,

وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ

অর্থ: কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের ওপর ঈমান আনলে। আর (পুণ্য আছে) আল্লাহকে ভালোবেসে আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্তদের জন্য দান করলে।[৩৬২]

এতিমের সম্পদ সুরক্ষায় কুরআনে সুনির্দিষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

وَءَاتُوا ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

[৩৫৯] আল কুরআন, ৪:৩৬
[৩৬০] আল কুরআন, ৯৩:৯
[৩৬১] আল কুরআন, ১০৭:১-২
[৩৬২] আল কুরআন, ২:১৭৭

অর্থ: এতিমদের তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে। আর ভালোর সঙ্গে মন্দ বদল করবে না। তোমাদের সম্পদের সঙ্গে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস কোরো না। অবশ্যই এটি মহাপাপ।[৩৬৩]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি সুন্দর সমাজব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, যেখানে এতিমের জন্যে ছিলো সুখের ঠিকানা। যেমনটা কুরআন করতে বলেছে,

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ

অর্থ: মানুষ তোমাকে এতিম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম...।[৩৬৪]

এভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের অসংখ্য নির্দেশনার আলোকে এতিমদের জন্যে একটি আদর্শ সমাজ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে সমাজ আজও পৃথিবীতে বিরল এক ইতিহাস হয়ে আছে।

[৩৬৩] আল কুরআন, ৪:২

[৩৬৪] আল কুরআন, ২:২২০

অধ্যায়:৭

রাষ্ট্র সংস্কারে মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্ব

রাষ্ট্র ও সরকার মানব জীবনের দুটি অপরিহার্য বিষয়। দুনিয়ায় মানুষের স্থিতি, বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্যে রাষ্ট্র ও সরকারের অস্তিত্ব একান্তই আবশ্যক। অন্তত মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন যে রাষ্ট্র ও সরকার ছাড়া চলতে পারে না, এ বিষয়ে প্রাচীন ও আধুনিক কালের মনীষীগন প্রায় সকলেই একমত। ইসলামও তাই রাষ্ট্রকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে। ইসলাম যেভাবে সৎ ব্যক্তি, সুন্দর পরিবার ও সুশীল সমাজ গড়তে চেষ্টা করে, তেমনি উপযুক্ত ও সুন্দর রাষ্ট্র গঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও ইসলামে লক্ষ্যণীয়।[৩৬৫]

রসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনেতিহাস অধ্যয়ন করলেই জানতে পারা যায়, তিনি মদীনায় উপস্থিত হয়েই একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।[৩৬৬] একজন রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্র পরিচালকের ন্যায় তিনি যাবতীয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি যুদ্ধকালে একটি সুসংবদ্ধ সৈন্যবাহিনী গঠন করেছেন। বিভিন্ন গোত্রপতি বা রাষ্ট্র-প্রধানদের সাথে নানা ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছেন। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলেছেন ও পরিচালনা করেছেন।

তিনি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এক-একটি সুসংগঠিত সমাজ পরিচালনার জন্য যা যা করা অপরিহার্য, তিনি তার প্রত্যেকটি কাজই সুষ্ঠুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। বিচার বিভাগ সুসংগঠিত করে তার সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর নির্মিত মসজিদই ছিল এই সমস্ত কাজের কেন্দ্রস্থান। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি যাবতীয় দায়িত্ব এই মসজিদেই পালন করেছেন। রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করেছেন। বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাষ্ট্র-প্রধানের নিকট রাষ্ট্রীয় পত্রাদিও প্রেরণ করেছেন। সে পত্রাদি যেমন আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছেন, তেমনি তার বাইরের ব্যক্তিদের নিকটও পাঠিয়েছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে কুরআন অসংখ্য দিক নির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত এই সকল নিয়মাবলী সামনে রেখেই খেলাফত তৈরি হয়েছিলো। তাই আমরা নবী জীবনের প্রতিটি পাতায় পাতায় কুরআনের সরস উপস্থিতি লক্ষ্য করি। আমরা নিচে দেখার চেষ্টা করবো, কুরআন কিভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনায় সাহায্য করেছে।

---

[৩৬৫] ইউসুফ আল কারযাভী, *ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১৫), পৃ. ২৩

[৩৬৬] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৭.১. নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং এর ভিত্তি ও পরিধি নির্ধারণ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আরবের ইতিহাসে সেটিই ছিলো প্রথম কোনো নগর রাষ্ট এবং তার মূল ভিত্তি ছিল তাওহীদ। যদিও আরবের গোত্রীয় কাঠামোর ভিতর থেকেই এর উত্থান, তবুও মদিনাকে রাজধানী করে এটি একটি কেন্দ্র শাসনাধীন সরকারে রূপ নেয়।[৩৬৭] এক আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তার দেওয়া বিধানের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করাই ছিল, এই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি।

নবী প্রতিষ্ঠিত এ রাষ্ট্রের আইন ও আদালত ইসলামী শরীয়তের বিধি মোতাবেক পরিচালিত হয়েছে, যা কুরআন এবং সুন্নাহ দলিল দ্বারা প্রমাণিত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব ছিলো নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং খারাপ কাজ থেকে মানুষদের ফিরিয়ে রাখা। কুরআনে এ ব্যাপারে চূড়ান্তনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কুরআন বলছে,

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

অর্থ: আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কার্য হতে নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।[৩৬৮]

৭.২. রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

মানবজীবনে ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অত্যধিক।সভ্য সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের কোনো বিকল্প নেই। শাসক ও জনগনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকা জরুরি। রাষ্ট্রের শাসন মেনে চলার অভ্যাস থাকা গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে জনগনকে শাসকের অনুগত থাকার বিধান দেওয়া হয়েছে।[৩৬৯]

---

[৩৬৭] ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (সা) এর সরকার কাঠামো*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪), পৃ. ২০৬

[৩৬৮] আল কুরআন, ২২:৪১

[৩৬৯] ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব আন নাসায়ী, *সুনানু নাসাঈ শরীফ*, অধ্যায়- বায়আত, হাদিস নং ৪১৫০, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৪, পৃ. ১৭৭

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শাসনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সকলের জন্যে সমান আইন প্রয়োগ করেছেন। এমনকি তিনি নিজে বলেছেন যে, আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করে, তবে তার হাতও কাটা যাবে। এভাবে সবার জন্যে আইনের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে অনেক গুরুত্বারোপ করেছে। অসংখ্য আয়াত ও নির্দেশনা নাযিল করেছে। হাদিসেও এ ব্যাপারে নানা কথা বলা হয়েছে। একজন ন্যায়পরায়ন শাসকের মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক উচ্চ। কেয়ামতের দিন তারা আল্লাহর নিকটের নূরের উচ্চ মিনারে তারা অবস্থান করবে।[৩৭০] বলা যায় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল কুরআনের নির্দেশনার আলোকেই মদিনায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কুরআন বলছে,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, হকদারদের হক তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কত উত্তম উপদেশই না দিচ্ছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।[৩৭১]

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে নিরপেক্ষ আদালত ও বিচার পদ্ধতি একান্ত প্রয়োজন। তাই সত্য সাক্ষ্যও গুরুত্বপূর্ণ। কুরআন প্রত্যক মুমিনকে নির্দেশ দিচ্ছে যে,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

অর্থ: হে মুমিনগন! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।[৩৭২]'

---

[৩৭০] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯) খন্ড: ১, পৃ. ১৯৭

[৩৭১] আল কুরআন, ৪:৫৮

[৩৭২] আল কুরআন, ৫:৮

কুরআন এর সকল বিধানের উদ্দেশ্য হলো মানবকল্যাণ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জীবনের সুরক্ষা, সম্পদের সুরক্ষা, সম্ভ্রমের সুরক্ষা, দেওয়ার জন্যেই আইনের শাসন কায়েম করেছেন। এ জন্যেই কুরআন নবীজিকে সব সময় যেকোনো মূল্যে আইনের শাসনের উপর থাকার জন্যে জোর নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনের বলছে,

فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ

অর্থ: কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি করো, তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ না করো। [৩৭৩]

৭.৩. শুরা ভিত্তিক সরকার গঠন

একটি আদর্শ রাষ্ট্র সব সময় পরামর্শের ভিত্তিতে চলে। একক কোনো চিন্তা ও সিদ্ধান্তে চললে, সেখানে কল্যাণ বা বরকত কম থাকে। তাই কুরআন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে শুরা পদ্ধতি চালু করেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শুরা ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন বলছে,

وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ

অর্থ: এবং তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদন করে।[৩৭৪]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সিদ্ধান্ত তার সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেই নিতেন। এমনকি কখনো কখনো আমভাবে সকল সাহাবীদের পরামর্শ নিয়েছেন। যেমন, ওহুদ যুদ্ধের আগে মদিনা নগরীর বাইরে গিয়ে, না ভেতর থেকে যুদ্ধ মোকাবেলা করা হবে, তা নিয়ে মহানবী সা. তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তারপরও মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ

অর্থ: এবং কাজকর্মে তুমি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।[৩৭৫]

এভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করেন, সেখানে শুরা বা পরামর্শ সভা ছিলো মৌলিক ও প্রধানতম একটি দিক। আর এই নির্দেশনাটি দিয়েছে কুরআন।

---

[৩৭৩] আল কুরআন, ৫:৪৮

[৩৭৪] আল কুরআন, ৪২:৩৮

[৩৭৫] আল কুরআন, ৩:১৫৯

৭.৪. সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

নবী পূর্ব সময়ে সারা দুনিয়ায় সাধারণভাবে এবং আরবের ব্যবসাকেন্দ্র মক্কায়ও সুদি কারবার ছিল ব্যাপক। বলতে গেলে তখনকার গোটা অর্থনীতিই ছিল সুদভিত্তিক। বনি ইসরাইলে ইতিহাসেও সুদের কারবার ছিলো।[৩৭৬] বাস্তবিক এটি ছিলো মানবতার জন্যে খুবই খারাপ একটি বিষয়। সুদের মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষই নির্যাতনের শিকার হয়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার পর সেখানে সুদের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে হারাম করেছেন। কুরআন নবীজিকে এমনটা করার হুকুম দিয়েছে। সকল মুসলমানকে কুরআন শক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছে সুদকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে। পাশাপাশি সুদের ক্ষতিকর দিকও বর্ণনা করেছে। বলেছে সুদের বিকল্প কী হবে- তাও। কুরআন স্পষ্টভাষায় বলছে,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, আল্লাহকে ভয় করে চলো। তোমাদের ঈমান যদি পাকাপোক্ত হয়ে থাকে, তবে লোকদের কাছে যে সুদের পাওনা বকেয়া রয়েছে, তা ছেড়ে দাও।[৩৭৭]

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ ﴿٢٧٥﴾

অর্থ: যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা শাইতানের স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির অনুরূপ কিয়ামাত দিবসে দন্ডায়মান হবে; এর কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা সুদের অনুরূপ বৈ তো নয়; অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।[৩৭৮]

---

[৩৭৬] প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *সুদ*, (রাজশাহী, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯), পৃ. ৫

[৩৭৭] আল কুরআন, ২:২৭৮

[৩৭৮] আল কুরআন, ২:২৭৫

৭.৫. যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা

যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম, যা মহান আল্লাহ এটিকে ফরজ করেছেন।[৩৭৯] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন, আল্লাহ তাকে যাকাতের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা সাজানোর জন্যে হুকুম দিয়েছেন। মূলত ক্রমবর্ধমান যে কোনো সম্পদেই যাকাতের বিধান আরোপ করা হয়েছে।[৩৮০] কুরআনে অসংখ্য আয়াতে যাকাত দিতে মানুষদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। মূলত কুরআনের নির্দেশনার আলোকে যাকাত ভিত্তিক সমাজ গড়ার কাজে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব দ্রুত সময়েই সফলতা লাভ করেছেন।

কুরআন বলছে,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

> অর্থ: তাদের সম্পদ থেকে তুমি সদকা গ্রহণ করো, যা দিয়ে তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং কল্যাণ ও উন্নত সাধন করবে।[৩৮১]

কুরআন অন্য আয়াতে বলছে,

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

> অর্থ: এবং তোমরা মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির জন্যা যে বৃদ্ধি (সুদ) প্রদন কর তা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যে যাকাত প্রদান করে থাক সেই যাকাতই হল বহুগুণ বৃদ্ধিকারী।[৩৮২]

এমনকি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও যাকাত আদায়ে উম্মতকে অনেক নসিহত করেছেন। যেমন তিনি বলেন, যখন তুমি যাকাত আদায় করে দিলে, তখন তোমার উপর থাকা কর্তব্য তুমি পালন করে দিলে।[৩৮৩] একথা দিবালকের মতো স্পষ্ট যে, কুরআনের আয়াতে বারবার উল্লেখ হওয়া এবং নবী থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনায় প্রমাণিত হওয়ায়, যাকাত মুসলিম উম্মাহর উপর গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ।[৩৮৪]

---

[৩৭৯] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ, *সুনানে ইবনে মাজাহ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১) খন্ড: ২, পৃ. ১৩৪

[৩৮০] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০১২) পৃ. ২২৩

[৩৮১] আল কুরআন, ৯:১০৩

[৩৮২] আল কুরআন, ৩০:৩৯

[৩৮৩] ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১), খন্ড: ৩, পৃ. ৩

[৩৮৪] আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮২), পৃ. ১০১

৭.৬. জনগনের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

মানবজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলাম সর্বোচ্চ সতর্কতা ও কঠোর বিধান প্রণয়ন করেছে। জীবনের নিরাপত্তা বলতে শুধু প্রাণ রক্ষা নয়; বরং জীবনের স্থিতিশীল, সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের প্রয়োজনীয় সব কিছু এর অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য ইসলাম যেমন বাহ্যত হত্যাকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছে, তেমনি যা কিছু মানবজীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, তাও নিষিদ্ধ করেছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় এমন রাষ্ট্র তৈরি করেছিলেন, যেখানে প্রত্যেক মানুষের জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা ছিলো। কেউ কাউকে হত্যা করতে পারতো না অন্যায়ভাবে। এমনকি হাদিসে জিম্মিকে হত্যা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ জিম্মিকে হত্যা করলে, বেহেশতের ঘ্রাণও পাবে না।[৩৮৫] কেউ অন্যায়ভাবে হত্যা করলে, তাকে কেসাস অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হতো। কুরআন স্পষ্টভাষায় কেসাসের বিধান আরোপ করেছে। কুরআন বলছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ﴿١٧٨﴾

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, তোমাদের জন্যে হত্যা মামলায় কিসাসের লিখিত বিধান দেওয়া হয়েছে। হত্যাকারী স্বাধীন ব্যক্তি হলে তার বদলে ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকেই হত্যা করতে হবে। হত্যাকারী দাস হলে ঐ দাসকেই হত্যা করা হবে কিংবা হত্যাকারী কোনো মহিলা হলে ঐ মহিলাকেই হত্যা করা হবে।[৩৮৬]

مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ

অর্থ: নরহত্যা বা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকে হত্যা করল; আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।[৩৮৭]

কুরআন শুধুমাত্র অন্যকে হত্যা করতে নিষেধ করে নাই। বরং নিজেকে হত্যা করতেও নিষেধ করেছে। হাদিসে আত্মহত্যার মারাত্মক শাস্তির কথা বলা হচ্ছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ আত্মহত্যা

---

[৩৮৫] আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, বুখারী শরীফ, পরিচ্ছেদ ১৯৬৫, হাদিস নং ২৯৪২, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৫, পৃ. ৩৩৫

[৩৮৬] আল কুরআন, ২:১৭৮

[৩৮৭] আল কুরআন, ৫:৩২

করলে, তাকে ঐ বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেওয়া হবে। আর জাহান্নামই হবে তার আবাস।[৩৮৮] তাই আত্মহত্যা ইসলামে হারাম কাজ। কুরআন বলছে,

وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ

অর্থ: তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কোরো না।[৩৮৯]

এভাবে মনিদার সমাজে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। কেউ সেখানে বেআইনিভাবে নিহত হতো না। নিহত হলেও তার উত্তারিধাকারীরা কেসাস অনুযায়ী সুবিধা পেতো। আর এই শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে কেবল কুরআনের মাধ্যমে।

৭.৭. নাগরিকদের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

জনগণের সম্পদের নিরাপত্তা দেওয়া নবীজির প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় ছিলো অপরিহার্য কর্তব্য এবং সকলের ঈমানি দায়িত্ব। কুরআনের অসংখ্য নির্দেশনার আলোকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিয়ম কার্যকর করেছিলেন।

কুরআন মানব জাতিকে স্পষ্ট ভাষায় বলছে যে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

অর্থ: হে ঈমানদারেরা, তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা বাণিজ্য করো। তবে সাবধান! কখনোই অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে খেয়ো না। আর নিজেদের কখনোই হত্যা করো না। মনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি খুবই দয়ালু।[৩৯০]

অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং সুদের বেড়াকলে মানুষকে পিষ্ট করা থেকে নবীজি মানবতাকে মুক্তি দিয়েছেন। কুরআনের নির্দেশনা হচ্ছে,

---

[৩৮৮] ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ মুসলিম*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯) খন্ড: ১, পৃ. ১৯৭

[৩৮৯] আল কুরআন, ৪:২৯

[৩৯০] আল কুরআন, ৪:২৯

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

অর্থ: বারবার নিষেধ করার পরেও যারা সুদের কারবারে লিপ্ত হয়েছে। অন্যায়ভাবে অপরের ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। জেনে রেখো, তাদের জন্যে এখন কেবল কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবই অপেক্ষা করছে।[৩৯১]

৭.৮. নাগরিকদের সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

প্রত্যেক নাগরিকের সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিয়ম চালু করেছেন। মদিনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল পুরুষ এবং নারীদের সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। কুরআনের অসংখ্য নির্দেশনার আলোকে মুসলমানেরা নিজেদেরকে পবিত্র জীবনে সংযত করেছিল। আল্লাহ এবং তার রাসুল সকল মুসলমানদের কে ব্যক্তিগতভাবেই সচ্চরিত্র এবং নিয়মানুবর্তিতা মধ্যে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন বলছে,

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا

অর্থ: তোমরা ব্যাভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয় তা অশ্লীলতা ও বিপথগামিতা।[৩৯২]

ব্যাভিচারে জড়িয়ে পড়লে ইসলাম তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করে। মদিনা রাষ্ট্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাভিচারের সর্বোচ্চ শাস্তি দিয়েছেন মৃত্যুদন্ড। কুরআনে ১০০ বেত্রাঘাতের উল্লেখ রয়েছে। কুরআন বলছে,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

অর্থ: ব্যভিচারকারী মহিলা ও পুরুষ অবিবাহিত হলে উভয়ের প্রত্যেককেই শাস্তি হিসাবে আলাদা আলাদাভাবে একশ বেত্রাঘাত করো। আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রেখে থাকলে,

---

[৩৯১] আল কুরআন, ৪:১৬১

[৩৯২] আল কুরআন, ১৭:১৭

আল্লাহর এ শরিয়ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো দয়া-মমতাবোধ যেনো তোমাদেরকে প্রভাবিত করতে না পারে। আর একদল ঈমানদারদেরকে এ শাস্তির ব্যাপারে সাক্ষী রাখবে।[৩৯৩]

এভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের অসংখ্য নির্দেশনার আলোকে মদিনার সমাজ থেকে ধর্ষণ ও ব্যাভিচারসহ সকল অশ্লীলতা নির্মূল করেছিলেন।

৭.৯. অপরাধ নির্মূলে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

অপরাধ নির্মূলের নিমিত্তে মদিনা রাষ্ট্রে অসংখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরমধ্যে কিছু কিছু অপরাধের জন্যে প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়ার বিধান প্রয়োগ করা হয়।

ক. মাদক নির্মূল

ইসলাম সকল প্রকার মাদক তথা নেশাদার দ্রব্য হারাম ঘোষণা করেছে। এর সর্বনাশা মরণ ছোবলে সমাজ ও রাষ্ট্রে নানা সমস্যা তৈরি হয়। ভেঙ্গে পড়ে অসংখ্য পরিবার। বিঘ্নিত হয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বৃদ্ধি পায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস। ফলে মানুষের জান-মাল ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। সমাজের অধিকাংশ অপরাধের জন্য মুখ্যভাবে দায়ী এই মাদক।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা রাষ্ট্র থেকে ধীরে ধীরে মাদক সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করেন। কুরআন তিন বার একটু একটু করে মাদক নির্মূলের নির্দেশনা দেয়। চূড়ান্তভাবে নির্মূলের উপযুক্ত সময় ও পরিবেশ তৈরি হলে, কুরআন আদেশ জারি করে যে,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِيْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ-

অর্থ: হে মুমিনগন! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের কার্য বৈ কিছু নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং

[৩৯৩] আল কুরআন, ২৪:২

আল্লাহর স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখন কি নিবৃত্ত হবে?[৩৯৪]

এভাবে কুরআনের সহায়তায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম রাষ্ট্রে মাদকের সকল ধরনের ব্যাবহার নিষিদ্ধ করেন। মাদক গ্রহণ, ব্যবসা, পরিবেশনসহ এর সাথে সম্পৃক্ত সকল কিছুকে নিষিদ্ধ করেন।

খ. চুরি-ডাকাতি বন্ধকরণ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শাসনামলে রাষ্ট্র থেকে চুরি-ডাকাতি বন্ধ করেছেন। এই ব্যাপারে তিনি শক্ত আইন প্রয়োগ করেছেন। তিনি কখনোই এই সকল অপরাধীকে ছাড় দেন নাই। কুরআনে যে কয়টা অপরাধের জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, চুরি তার মধ্যে অন্যতম একটা।[৩৯৫] ডাকাতির ক্ষেত্রেও ইসলামে শক্ত বিধান রয়েছে। অপরাধীকে হত্যা, শূলবিদ্ধকরণ, বিপরীত দিক দিয়ে হাত-পা কেটে ফেলা ও দেশ হতে নির্বাসনে দেওয়ার মতো শক্ত শাস্তি ইসলামে রয়েছে।[৩৯৬] কুরআন বলছে,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَـزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থ: তোমরা চোর পুরুষ বা মহিলা যে হোক, হাত কেটে দিবে তাদের কৃতকর্মের (চৌর্যবৃত্তি) দরুন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ। বস্তত আল্লাহ্ তা'আলা অতিশয় ক্ষমতাবান, মহা প্রজ্ঞাময়।[৩৯৭]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের সম্পদকে লুট করে নেওয়া বা তাতে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। বিদায় হজের ভাষণে তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্মানে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ। এভাবে কুরআনের নির্দেশনার সাহায্যে তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে চুরি-ডাকাতি বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন।

---

[৩৯৪] আল কুরআন, ৫:৯০-৯১

[৩৯৫] ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,২০০৯) পৃ. ৬৮

[৩৯৬] ড. আহমদ আলী, *ইসলামের শাস্তি আইন*, পৃ. ৮৮

[৩৯৭] আল কুরআন, ৫:৩৮

গ. ঘুষ নির্মূলকরণ

ঘুষ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক ব্যাধি। ঘুষের আদান-প্রদান তথা লেনদেন একটি নিকৃষ্ট পন্থা। এ ব্যাধি ও নিকৃষ্ট পন্থা থেকে বিরত থাকা ইসলামের নির্দেশ। কুরআন স্পষ্টভাষায় বলছে,

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

অর্থ: তামরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে-বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারককে উৎকোচ দিও না।[৩৯৮]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘুষকে নিষিদ্ধ করেছেন। কোনো সাহাবী সরকারি কাজে কোনো ধরনের উৎকচ বা ঘুষ গ্রহণ করলে, নবীজি তাদেরকে তিরস্কার করতেন। আইনের আওতায় আনতেন।[৩৯৯] এভাবেই কুরআনের নির্দেশনায় ঘুষমুক্ত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।

---

[৩৯৮] আল কুরআন, ২:১৮৮

[৩৯৯] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস আস সিজিস্তানী, *আবু দাউদ শরীফ*, অনুচ্ছেদ ১৪৯, হাদিস নং ২৯৩৬, প্রাগুক্ত, খন্ড: ৪, পৃ.১৬৪

উপসংহারঃ

নবী জীবনী আমাদের পথ চলার পাথেয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথেই মানবতার কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। তাই নবী জীবনের প্রতিটি ঘটনা প্রবাহ জানা ও বোঝা এবং এ থেকে শিক্ষা নেওয়া আমাদের জন্যে একান্ত জরুরি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতি জীবনের মাত্র ২৩ বছরে যে বিপ্লব সাধন করেছেন, তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র অবধি বদলে দিয়েছেন। একজন আরব মূরুর সন্তান হয়ে তিনি যে সফলতা দেখিয়েছেন, তা অনন্য ও সর্বজন সমাদৃত।

এই সফল নেতৃত্বের পিছনে আল্লাহ তায়ালার সহযোগিতা ও নির্দেশনা সবচেয়ে বড় ভুমিকা পালন করেছে। বাস্তবে কুরআনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সর্বদা তত্ত্বাবধান করেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্তকে কুরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে। কখন কোন্ কাজটি করবেন এবং তার পদ্ধতি কী হবে, তার পূর্ণঙ্গ পরিকল্পনা কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সর্বদা প্রদান করেছে। এভাবেই একটি সফল নেতৃত্বের পিছনে কুরআন সরাসরি ভুমিকা রেখেছে। বক্ষমান অভিসন্দর্ভটিতে এই বিষয়টি যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচিত অধ্যায়গুলো থেকে আমরা যা কিছু শিখতে পারছি, তার সংক্ষিপ্ত বিবারণ নিচে তুলে ধরছি।

প্রথম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে আমরা শিখেছি যে, যুগে যুগে মানুষের হেদায়াতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাণী ও বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন। কুরআন তেমনই একটি কিতাব, যা আমাদের জন্যে পাঠানো হয়েছে এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জীবনে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: এ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নেতৃত্বের অনেক গুণাবলী শিক্ষা দিয়েছে। একজন সফল নেতা হিসেবে নবীজিকে গড়ে তুলেছে। নবীজিকে দ্বীনের সকল জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে, দাওয়াতের কলা কৌশল শিখিয়েছে, সহকর্মীদের সাথে আচরণবিধি জানিয়েছে, প্রতিপক্ষের মোকাবেলা কৌশল শিখিয়েছে। এমনকি ধৈর্য, সহনশীলতা, সাহসিকতা, আন্তরিকতা, দৃঢ়তার মতো গুণ অর্জন করিয়েছে। বস্তুত এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়: এ অধ্যায়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাক্কী জীবনের সকল ঘটনাগুলো কুরআনের বর্ণনায় দেখেছি। মক্কার প্রথম দিকে নবীজি গোপনে দাওয়াত পেশ করেছেন। অতঃপর যখন প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছেন, তখন প্রথমদিকে কাফেরেরা মৌখিকভাবে এর প্রতিরোধ করতে চেয়েছে; কিন্তু পরে ওরা নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ ১৩ বছর মক্কায় দাওয়াতের কাজ করেছেন। নানা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি এই সময় পার করেছেন। অবশেষে তিনি দ্বীনের কারণে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়: এ অধ্যায়ে আমরা নবী জীবনের মদিনার দিনগুলোর ঘটনা প্রবাহ দেখেছি। হিজরত করে এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার বিবাদমান সমাজকে শান্তি ও নিরাপত্তার সমাজে রূপান্তর করলেন। কুরআনের নানা নির্দেশনার আলোকে তিনি মদিনাকে সাজিয়ে নিলেন। এরপর একের পর এক যুদ্ধে তিনি সফলভাবে নেতৃত্ব দিলেন। মদিনা থেকে পুরো আরবকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে দেখালেন।

পঞ্চম অধ্যায়: এ অধ্যায়ে আমরা মূলত ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নানা ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সফল নেতৃত্ব দেখতে পাই। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আহলে কিতাবদের নানা অসঙ্গতি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র ধর্ম ইসলাম ব্যাতীত অন্য সকল মিথ্যা ও বাতিল ধর্মের বিরুদ্ধে কুরআন নবীজিকে সাহায্য করেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: এই অধ্যায়ে সমাজ সংস্কারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গৃহিত পদক্ষেপের কিছু দিক দেখেছি। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমাজের বিবাদ মিমাংসা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা আনায়নে নবীজির ভুমিকা উল্লেখযোগ্য। আর এসবের পিছনে কুরআনের ভুমিকা ছিলো প্রত্যক্ষ।

সপ্তম অধ্যায়: এ অধ্যায়ে রাষ্ট্র সংস্কারে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদত্ত নেতৃত্বের কিছু দিক আলোচিত হয়েছে। আমরা দেখেছি, তিনি কিভাবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। শান্তিপূর্ণ ও স্বনির্ভর রাষ্ট্র গঠনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তার পিছনে কুরআনের ভুমিকা নির্ণয় করা হয়েছে।

সর্বোপরি, এই অভিসন্দর্ভটি আমাদেরকে নবী জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও দিককে কুরআনের আলোকে দেখতে উদ্বুদ্ধ করছে। সীরাতের প্রতিটি বিষয়ের সাথে কুরআনের কোনো না কোনো আয়াত জড়িত, তাই প্রতিটি ঘটনা কুরআনের আলোকে বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন, যা আমাদের চিন্তা ও কর্ম পরিকল্পনাকে সঠিক রাখবে। কাজেই এ কথা বলা যায় যে, এই অভিসন্দর্ভটি আমাদের জন্যে চিন্তা ও জ্ঞানের এক নতুন সংযোজক হয়েছে।

চিত্র

৮.১. চিত্রে মক্কা নগরী

চিত্র-১: মক্কা নগরির ছবি, ১৮৮১ এর।[৪০০]

[400] https://www.arabnews.com/node/1491651/lifestyle

৮.২. মক্কা নগরীর ম্যাপ

চিত্র-২: মক্কা নগরির ম্যাপ[৪০১]

[401] https://www.mapsofworld.com/saudi-arabia/cities/makkah.html

৮.৩. আরব ভুখন্ডের ম্যাপ

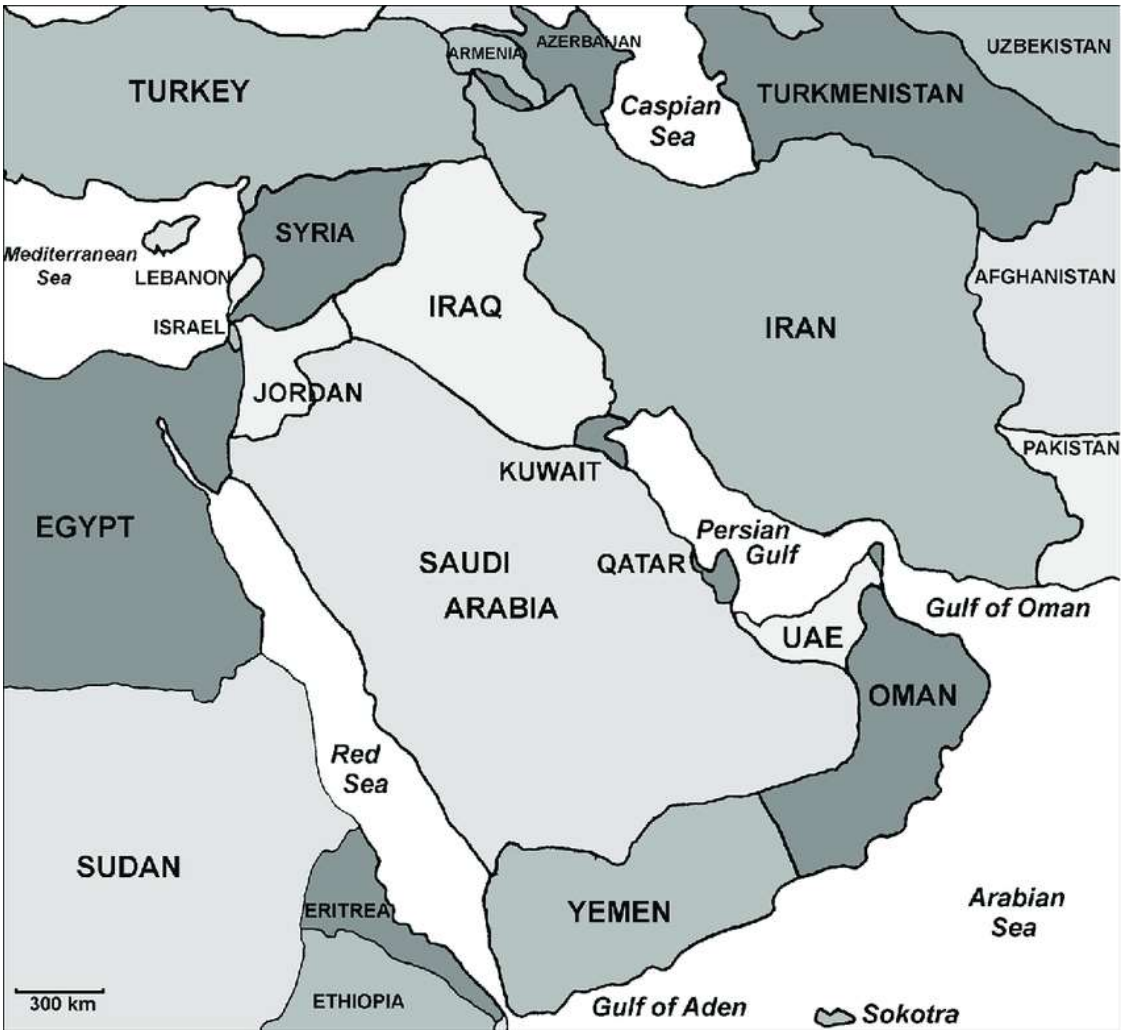

চিত্র-৩: আরব ভুখন্ডের ম্যাপ[৪০২]

[402] https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-Arabian-Peninsula-and-surrounding-

৮.৪. মক্কা ও নবীজির জন্মস্থান

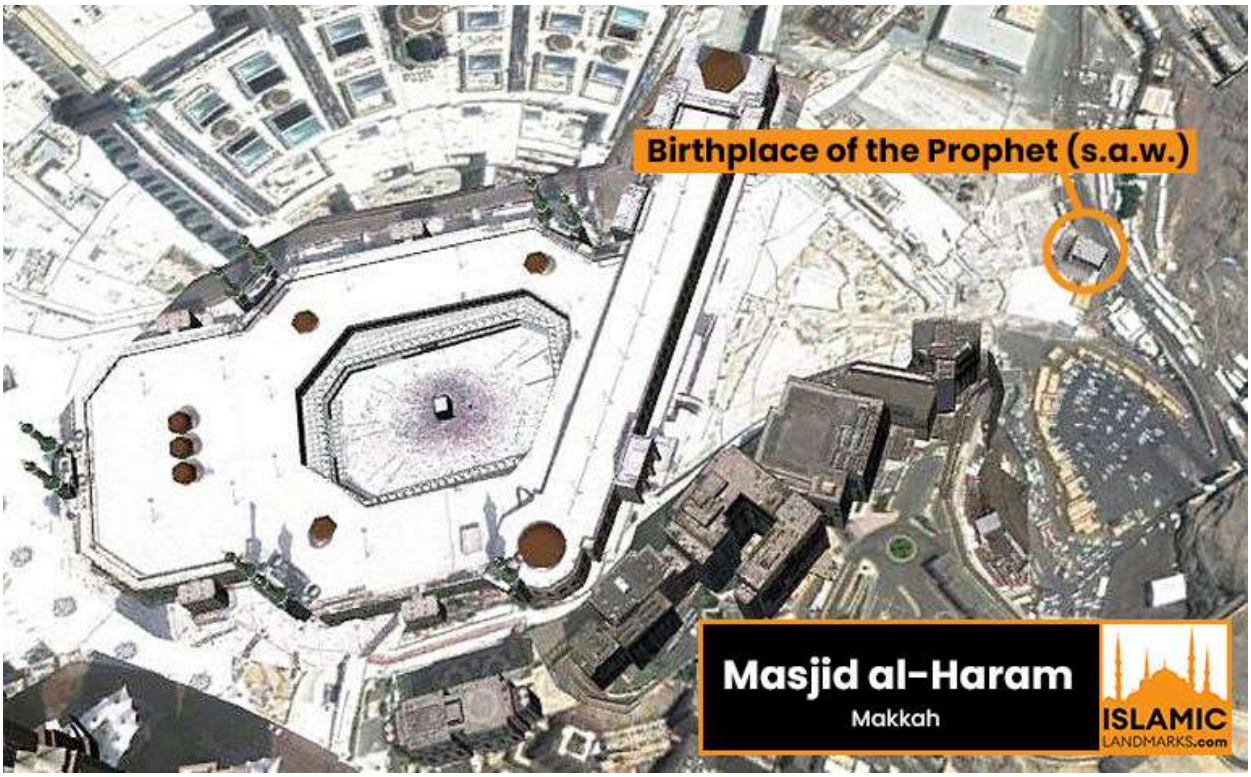

চিত্র-৪: পবিত্র মক্কা নগরী এবং প্রিয় নবীজির জন্মস্থান[৪০৩]

[403] https://www.islamiclandmarks.com/makkah-other/birthplace-of-the-prophet-saw

৮.৫. হেরা গুহা

চিত্র-৫: হেরা গুহা, এখানে নবীজি প্রথম ওহী লাভ করেন।[৪০৪]

[404] https://www.islamicchannel.in/jabal-noor/jabal-noor-2/

৮.৬. সাওর পর্বত

চিত্র-৬: সাওর পর্বতের গুহা, এখানে নবীজি সা. হিজরতের সময় আশ্রয় নিয়েছিলেন।[৪০৫]

[405] https://www.islamiclandmarks.com/wp-content/uploads/2022/01/Cave-of-Thawr-before-cleanup.jpg

৮.৭. মসজিদে আকসা

চিত্র-৭: মসজিদে আকসা, এখানে মিরাজের রাতে নবীজি প্রথমে এসেছিলেন।[৪০৬]

[406] https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Aqsa_Mosque#/media/File:Jerusalem-2013-Temple_Mount-Al-Aqsa_Mosque_(NE_exposure).jpg

৮.৮. মদিনার ম্যাপ

চিত্র-৮: মদিনার ম্যাপ, নবীজি সা. এখানেই হিজরত করে গিয়েছিলেন।[৪০৭]

[407] https://www.researchgate.net/figure/Location-of-Al-Madinah-Al-Munawarah-on-Saudi-Arabia-Map-AL-Madinah-Al-Munawarah-located_fig9_265207791

৮.৯. মসজিদে কুবা

চিত্র-৯: মসজিদে কুবা, নবীজি সা. হিজরত করে এসে প্রথমে এখানে মসজিদ তৈরি করেন।[৪০৮]

[408] https://en.wikipedia.org/wiki/Quba_Mosque#/media/File:Qubaorig.jpg

৮.১০. মসজিদে নববী এর মোকাপ

চিত্র-১০: মসজিদে নববী, নবীজি সা. হিজরত করে এসে মদিনায় প্রধান যে মসজিদ নির্মাণ করেন, এই ছবিটি সেই মসজিদের মডেলে মোকাপ করা।[৪০৯]

[409] https://www.researchgate.net/figure/Mock-up-model-of-the-Prophet-Mosque-in-Madinah_fig1_353891024

৮.১১. মসজিদে নববী এর বর্তমান রূপ

চিত্র-১১: মসজিদে নববী এর আধুনিক নির্মাণ ও বর্তমান অবস্থা[৪১০]

[410] https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Masjid_an-Nabawi#/media/File:Masjid_Nabawi_The_Prophet's_Mosque,_Madina.jpg

৮.১২. বদরের যুদ্ধের রূপরেখা

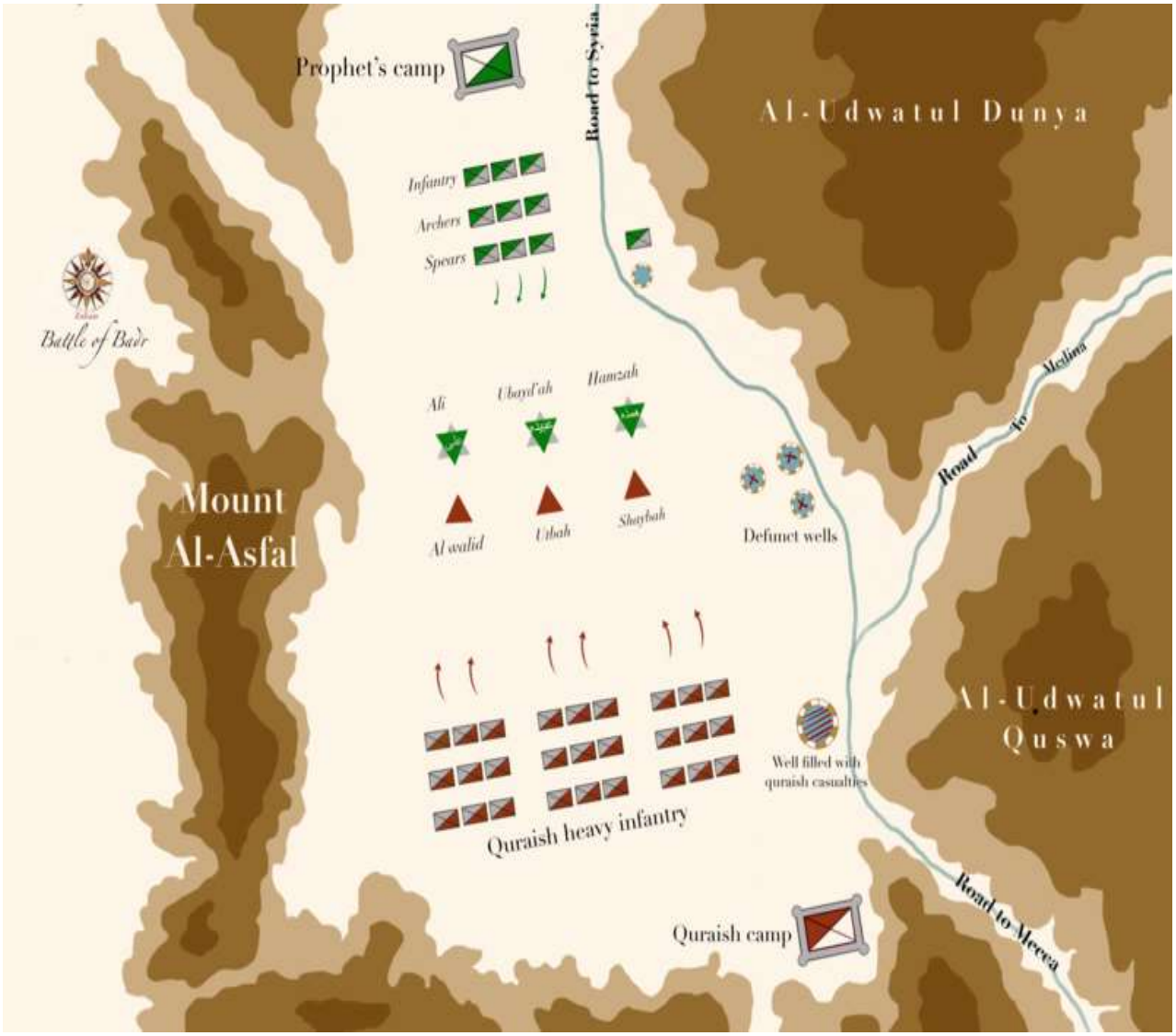

চিত্র-১২: বদরের যুদ্ধে মুসলিম ও কুরাইশ বাহিনীর যদ্ধের চিত্র মোকাপ করা হয়েছে।[৪১১]

[411] https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Badr#/media/File:The_battle_of_Badr.png

৮.১৩. ওহুদ যুদ্ধের রূপরেখা

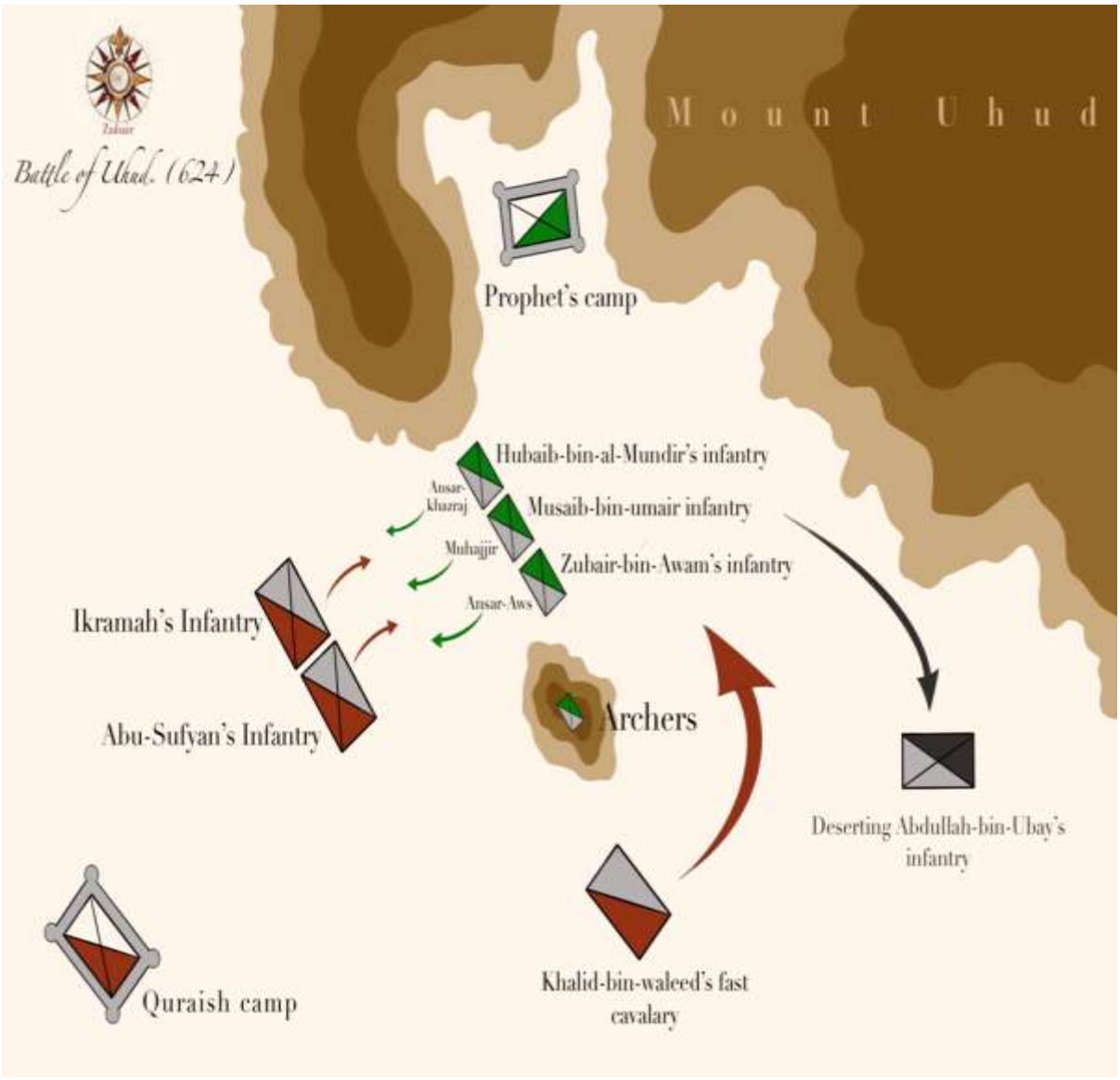

চিত্র-১৩: ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম ও কুরাইশ বাহিনীর যদ্ধের চিত্র মোকাপ করা হয়েছে[৪১২]

412

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Uhud#/media/File:Battle_of_Uhud_624_CE.png

৮.১৪. খন্দক যুদ্ধের রূপরেখা

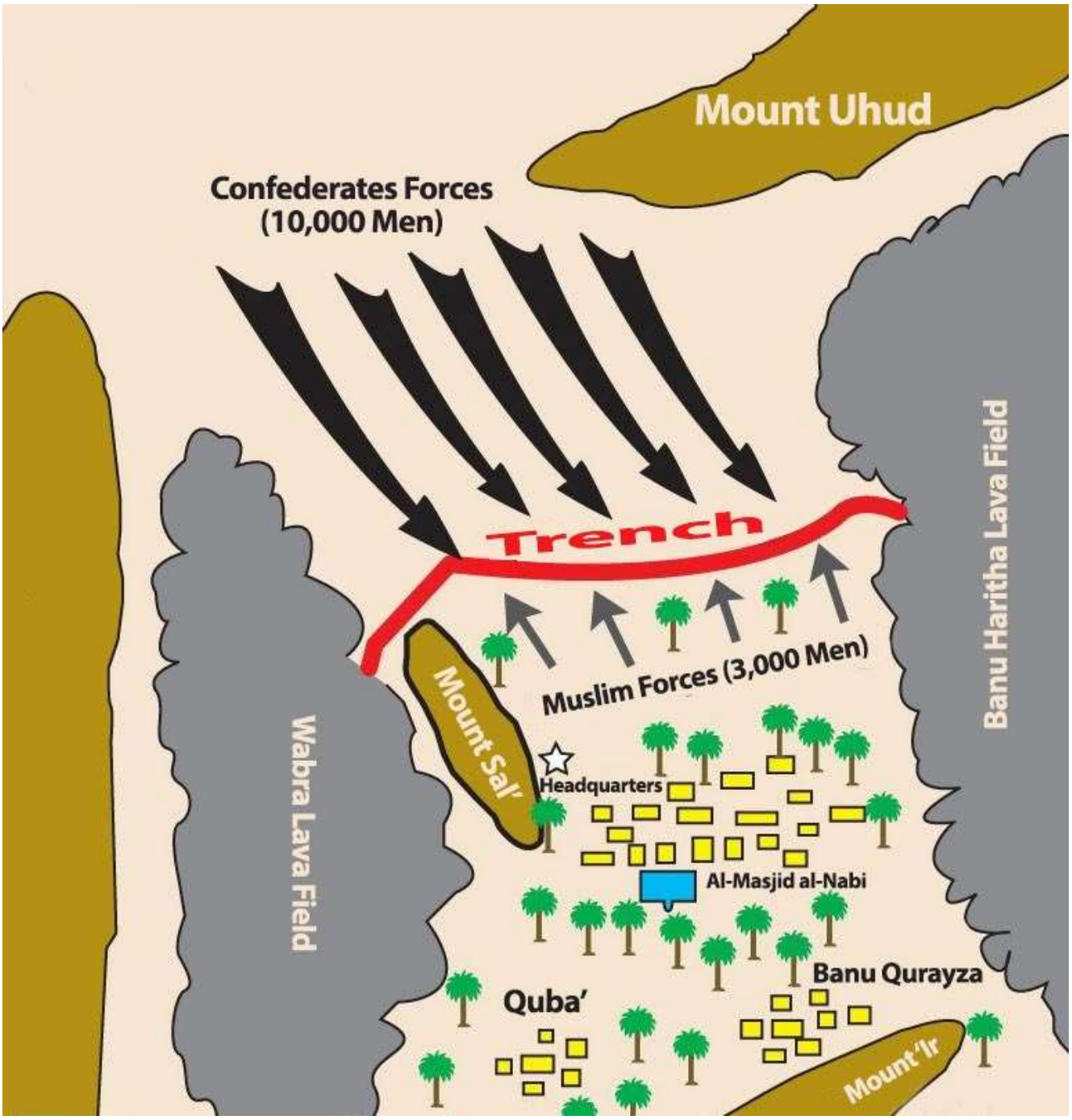

চিত্র-১৪: খন্দক যুদ্ধে মুসলিম ও সম্মিলিত বাহিনীর যদ্ধের চিত্র মোকাপ করা হয়েছে।[৪১৩]

[413] https://en.wikishia.net/view/Battle_of_Khandaq#/media/File:Battle-of-Khandaq.jpg

৮.১৫. বনু কুরাইজার পরিত্যাক্ত জনপদ

চিত্র-১৫: বনু কুরাইজা এর পরিত্যক্ত জনপদ এর চিত্র[৪১৪]

[414]https://en.wikishia.net/view/Battle_of_Banu_Qurayza#/media/File:%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B8%D9%87.jpg

৮.১৬. হুদায়বিয়ার মসজিদ

চিত্র-১৬: হুদায়বিয়ার চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার স্মৃতিস্থানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।[৪১৫]

[415] https://hajjumrahplanner.com/masjid-al-hudaibiyah/

৮.১৭. মক্কা বিজয়ের অভিযানের চিত্রাঙ্গন

চিত্র-১৭: মক্কা বিজয়ের অভিযানে মুসলিম সৈন্যদের সামরিক অবস্থান চিত্র।[৪১৬]

416

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=148909671861722&substory_index=0&id=142743959144960

৮.১৮. আরাফার ময়দান

চিত্র-১৮: বিদায় হজ্জে নবীজি সা. এখানে ভাষণ দিয়েছিলেন।[৪১৭]

[417] https://saudigazette.com.sa/article/515716/SAUDI-ARABIA/Arafat

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআন

২. ইবনু কাসীর, হাফেজ ইমাদুদ্দিন। *তাফসীর ইনবে কাসীর*। অনু. ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান। ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ১৯৮৬।

৩. তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারীর। *তাফসীরে তাবারী শরীফ*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০।

৪. পানিপথী, কাযী ছানাউল্লাহ। *তাফসীরে মাযহারী*। অনু. মাওলানা তালেব আলী। ঢাকা: হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া, ২০০০।

৫. মুহাম্মদ আল মহল্লী, জালালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আমম্মদ ইবনে মুহাম্মদ। *তাফসীরে জালালাইন*। অনু. মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসুম। ঢাকা: আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তাফা, ২০১১।

৬. শহীদ, সাইয়েদ কুতুব। *তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন*। ঢাকা: আল কুরআন একাডেমি লন্ডন, ২০১১।

৭. শাফী, মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ। *তফসীর মাআরেফুল কোরআন*। অনু. মাওলানা মহিউদ্দীন খান। রিয়াদ: বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি:।

৮. উসমানী, শাইখুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মদ তাকী। *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন*। অনু.মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১১।

৯. যাকারিয়া, ড. আবু বকর মুহাম্মদ। *কুরআনুল কারীম*। রিয়াদ: বাদশা ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ২০১৫।

১০. জালালুদ্দিন, মুহাম্মদ। *শানে নুযুল*। ঢাকা: মাহমুদিয়া লাইব্রেরী, ২০১২।

১১. বুখারী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল। *বুখারী শরীফ*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১

১২. ইবনুল হাজ্জাজ, ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম। *সহীহ মুসলিম*। ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৯।

১৩. আস সিজিস্তানী, ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআস। *আবু দাউদ শরীফ*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০।

১৪. আত তিরমিযী, ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা। *তিরমিযী শরীফ*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. আন নববী, ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া। *রিয়াদুস সালেহীন*। ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮।

১৬. আন নাসায়ী, ইমাম আবু আবদির রাহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব। *সুনানু নাসাঈ শরীফ*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাাদেশ, ২০০০।

১৭. ইবনে মাজাহ, আবু আব্দুল্লাহ। *সুনান ইবনে মাজাহ*। ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২।

১৮. বিন আব্দুল কাওলি আল মুনযিরি, ইমাম হাফেয আবু মুহাম্মদ যাকীউদ্দিন আব্দুল আযীম, *আত্-তারগীব ওয়াত তারহীব*। ঢাকা: হাসনা পাবলিকেশন, ২০১৯।

১৯. ইসহাক, ইবনে। *সীরাতে রাসুলুল্লাহ*। ঢাকা: ই.ফা.বা. প্রকাশনা, ১৩৭৭ বাং.

২০. হিশাম, ইবনে। *সীরাতে ইবনে হিশাম*। ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১২।

২১. মুবারকপুরী, আল্লামা সফিউর রহমান। *আর-রাহীকুল মাখতূম*। ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন, ২০১১।

২২. আওয়াদি, ড. হিশাম আল। *বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মদ*। ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ২০১৭।

২৩. কান্ধলবী, আল্লামা ইদরিস। *সীরাতুল মুস্তফা সা.*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭।

২৪. আওদাহ, ড. সালমান আল। *মাআল মুস্তাফা*। ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন, ২০২০।

২৫. আল-গালিব, মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ। *সীরাতুর রসুল (ছাঃ)*। রাজশাহী, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৫

২৬. সিদ্দিকী, নঈম। *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ*। ঢাকা:শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৮।

২৭. আব্দুল হাই, আবু সলীম মুহাম্মদ। *রসুলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন*। ঢাকা: ফাহিম বুক ডিপো, ২০১৫।

২৮. রহমান, প্রফেসর শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর। *সুদ*। রাজশাহী, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯।

২৯. রমাদান, তারিক। *রাসূলুল্লাহ এর পদাঙ্ক অনুসরণ*। ঢাকা: মাকতাবাতুল ফুরকান, ২০১৬

৩০. রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর। *আল কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*। ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫।

৩১. সিদ্দিকী, ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার। *রাসূল মুহাম্মদ (সা) এর সরকার কাঠামো*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪।

৩২. হাফিজ, মুসা আল। *রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)*। ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০২১।

৩৩. মুবাশ্বেরা, হামিদা। *শিকড়ের সন্ধানে*। ঢাকা: সমকালীন প্রকাশন, ২০২০।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. আলী, ড. আহমদ। *ইসলামের শান্তি আইন*। ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,২০০৯।

৩৫. আবু শুক্কাহ, আবদুল হালীশ। *রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*। ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৯৯৫।

৩৬. আল কারযাভী, ইউসুফ। *ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা তত্ত্ব ও প্রয়োগ*। ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০১৫।

৩৭. আবদুর রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ। *ইসলামের অর্থনীতি*। ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০১২।

৩৮. আল কারজাভী, আল্লামা ইউসুফ। *ইসলামের যাকাত বিধান*। ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮২।

৩৯. ইসলাহী, সদরুদ্দিন। *ইসলামের সমাজ দর্শন।* ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫

৪০. আব্দুর রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ। *ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার*। ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৩

৪১. আহমদ, এ কে এম নাজির। *অপপ্রচারের মুকাবিলায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।* ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৬

৪২. নাসিম,আবদুস শহীদ। *আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ*। ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশন, ২০১১

৪৩. মোহন, ইকবাল কবির। *ছোটদের মহানবী*। ঢাকা: শিশুকানন, ২০১১।

৪৪. নাসিম, আবুদস শহীদ। *নবীদের সংগ্রামী জীবন*। ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

৪৫. তালিব, আব্দুল মান্নান। *প্রিয় নবীর আদর্শ জীবন*। ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ২০১২।

৪৬. নদভী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী। *মহানবী স. ও সভ্য পৃথিবীর ঋণ স্বীকার*। ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০০০।

৪৭. থানবী, মাওলানা আশরাফ আলী। *যে ফুলের খুশবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা*। ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।

৪৮. আযযাম, ড. আবদুল্লাহ। *সীরাত থেকে শিক্ষা*। ঢাকা: মাকতাবাতুল ইসলাম, ২০১৪।

৪৯. নদভী, সাইয়েদ অবুল হাসান আলী। *সীরাতে রাসুলে আকরাম সা*। ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০১২।

৫০. শফি, মাওলানা মুহাম্মদ । *সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া*। ঢাকা: নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, ১৩৩৮ হি.।

৫১. আযযাম, আব্দুর রহমান। *মহানবী (সা.) এর শাশ্বত পয়গাম।* ঢাকা: ই.ফা.বা, ১৯৮০।

৫২. মোস্তফা গোলাম। *বিশ্বনবী*। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. বিন আলী আশ-শিদ্দী, আল্লামা আব্দুল মালেক আল-কাসেম আদেল, *কেমন ছিলেন রাসূলুল্লাহ*। ঢাকা: দারুস সালাম বাংলাদেশ, ২০১৪।

৫৪. আযযাম, আবদুর রহমান। *মহাবনী (সা) এর শাশ্বত পয়গাম।* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০।

৫৫. আলী নদবী (র), সাইয়েদ আবুল হাসান। *নবুয়ত ও আম্বিয়া-ই-কিরাম।* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১।

৫৬. মাযাহেরী (র.), মাওলানা আবদুল জলিল। *তলোয়ারে নয় উদারতায়*। ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৬।

৫৭. আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ। *রসূলুল্লাহ স. এর মক্কা বিজয়।* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।

৫৮. হুদা, মুহাম্মদ নূরুল। *মহাবনী*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৩।

৫৯. রহমান, অধ্যাপক মফিজুর। *কোরআনের আয়নায় বিম্বিত রাসুল (সা)।* চট্টগ্রাম: কামরল প্রকাশনী, ১৯৯১।

৬০. সামাদ, মুহাম্মদ আবদুস। *রহমতে দো আলম*। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭।

৬১. ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ। *সীরাত বিশ্বকোষ।* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

৬২. বদরুজ্জামান। *অমানিশার আলোকমালা*। ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০১১।

৬৩. কাইয়ুম, অধ্যাপক হাসান আবদুল। *অনুপত আদর্শ।* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২।

৬৪. রহমান, আফজালুর। *হযরত মুহাম্মদ সা: জিবনী বিশ্বকোষ।* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯।

৬৫. মুহাদ্দিস দেহলভি (র), শায়খ আব্দুল হক। *মাদারিজুন নুবুওয়াত।* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭।

৬৬. বিন সোহরাব, মাওলানা হুসাইন। *হাদীসের আলোকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।* ঢাকা: হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ২০০০।

৬৭. রাহনুমা, যায়নাব আবেদীন। *বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।* ঢাকা: আল আমিন প্রকাশন, ২০০০।

৬৮. নদভী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী। *নবীয়ে রহমত।* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

৬৯. রহমান, অধাপক মুজিবুর। *মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।* ঢাকা: প্রফেসর'র পাবলিকেশন, ২০০৭।

৭০. বানু, হোমায়রা। *আমাদের প্রিয় নবী*। ঢাকা: সরণী প্রকাশনী, ২০০৫।

৭১. জালালাবাদী, আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ। *রসূলুল্লাহর সা. পত্রাবলী: সন্ধিচুক্তি ও ফরমানসমূহ।* ঢাকা: মহানবী স্মরণীকা পরিষদ, ২০০০।

৭২. আবু জাফর। *মহানবীর (সা:) মহাজীবন*। ঢাকা: পালাবদল পাবলিকেশন, ২০০২